নটগুরু গিরিশচন্দ্র

বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত
১৯৫৭ সালের গিরিশ-বক্তৃতামালা)

অহীন্দ্র চৌধুরী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
১৯৫৭ সালের গিরিশ লেকচারার
এবং
পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য-নাটক-সঙ্গীত
আকাদামীর নাট্যাধ্যক্ষ

১নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীজানকীনাথ বসু, এম.এ.
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা—৬

মূল্য—৫৲

মুদ্রাকর :
শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

যিনি আমার তরুণ মনে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার

প্রথম আবেগ সৃষ্টি করেছিলেন নটগুরুর

সেই শ্রেষ্ঠ জীবনীকার

ও ভাবশিষ্য সুসাহিত্যিক

৺অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশয়ের অমর স্মৃতির

উদ্দেশ্যে

আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সর্বপ্রথম নট-সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ১৯৫৭ সালের জন্য, আমাকে গিরিশ লেকচারার মনোনীত করে—এক বিপ্লবাত্মক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাই আমাদের এই বিপ্লবী বাণী দেউলের বিশাল দ্বারপ্রান্তে আমার ও আমার গোষ্ঠীর সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি।

আমার বক্তৃতামালায় আমি বাংলার স্বকীয় নাট্য-কৌলিন্যের কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছি। সে ইতিহাস অতি প্রাচীন—আপন মহিমায় মহিমান্বিত। ভারতের সুপ্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে আমরা আভাস পাই যে আর্য যুগেও বাংলাদেশে একটা স্বতন্ত্র নাট্যধারা বিদ্যমান ছিল। ঋষি শাস্ত্রকার অবশ্যই তার কোনও বিশদ পরিচিতি রেখে যাননি। প্রাক্ আর্যযুগে দ্রাবিড়দের নৃত্যগীত, মুখোস অভিনয় ও মূকাভিনয়ে বাংলার নাট্য সম্ভাবনার প্রথম সূচনা দেখা যায়। দ্রাবিড় কৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে এখনও বাঙালী জাতি তাদেরই মত বৃক্ষ, মূর্তি ও প্রস্তর প্রভৃতির উপাসক। এই সুগভীর বিশ্বাস থেকে চৈতন্য যুগের ভক্তি, প্রেম ও বৈরাগ্যের বিকাশ ঘটেছে। শক্তিযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি প্রাচীন নাট্যানুষ্ঠানের মধ্যেই শুধু নয়, মনোমোহন ও গিরিশের পৌরাণিক নাটক থেকে বর্তমান যুগের অনেক বাংলা নাটকেও বাঙালীর হৃদয়াবেগের এই বিশেষ দিকটা প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলার এই নিজস্ব নাট্যধারা সেই সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত বহু ধারার সম্মিলনে আলোড়িত হয়ে উঠেছে। চৈতন্য যুগে সংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাংলা নাট্য ধারা পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য নাট্য ধারার সংমিশ্রণে এসেছে। কিন্তু তার ফলে তার মূলগত কোনও পরিবর্তন সূচিত হয়নি। যে পরিবর্তন এসেছে আংশিক বিষয়বস্তু বা ভাব চেতনার মধ্যে তা কোনও স্থায়ী প্রভাবের চরণ-চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি।

১৮৩১ সাল থেকে পাশ্চাত্য নাট্যনীতির যে প্রচণ্ড অনুকরণ কিছুকাল

ধরে এখানে চলে এসেছিল, তা অচিরাৎ বিলীন হয়ে যায় বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও অনুভূতির সংস্পর্শে। সুতরাং বাংলায় মৌলিক নাটক রচনার প্রয়াস সার্থক হ'লো। অনুকরণ প্রবল হ'য়ে বাংলার স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যকে বিলয় করতে পারেনি।

এই রকম কিন্তু ঘটেছে, বর্তমান মিশরে, ইসরাইলে, তুরস্কে, জাপানে, এমন কি মহাচীনের পিকিং অপেরার অধ্যুষিত নাট্য কৃষ্টির পাশে, আধুনিক নাটক রচনার মধ্যেও।

এই প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করার জন্য বাঙালী জাতি ও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। তাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াস বললে ভুল করা হবে। এই কারণে কখনও কখনও আমাকে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হ'য়েছে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি সেই দিকে একদিন না একদিন বিশেষভাবে বর্ষিত হবে বলে আমি গভীর আশা পোষণ করি। আন্তরিক গবেষণার ফলে এই সব অজানা বিষয়ে একদিন আলোক সম্পাত হবেই হবে।

আমি নটগুরু গিরিশচন্দ্রকে দেখেছি, আমার নিজস্ব অনুভূতির উদাত্ত আলোকে। আমি সেইভাবে তাঁকে এখানে চিত্রিত করেছি পরিপূর্ণ সমালোচকের দৃষ্টি কোণ দিয়ে। আমি তাঁর বিচার করিনি, আমার কাজ Critic-এর কাজ নয়, আমার কাজ reviewer-এর কাজ।

Oxford University Press হতে প্রকাশিত বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী ভাষার সমালোচনা সাহিত্যের সুবৃহৎ সঙ্কলনের ভূমিকায় শ্রীমতী ফিনিশ জোনস্ লিখেছেন, 'Reviewing may or may not be criticism.'

আমিও সেই ভাবে চিন্তা করেছি। সেই ভাবেই আমি গিরিশের রচনাবলীর পুনর্দর্শন করেছি, তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন দেশবাসী তাঁকে দেবেন।

আমার সে ক্ষমতা নেই। গিরিশের বিশাল নাট্য প্রতিভার আমি একটা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রচনা করেছি মাত্র। পাঠকগণ সেই ভাবেই আমার প্রয়াসের বিচার করবেন আশা করি—। নিজের কথা বিশাল সাহিত্যের

স্রষ্টাদের সম্বন্ধে ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর Prelude কাব্য গ্রন্থে লিখেছেন—

......" We will teach how ;
Instruct them how the mind of man becomes
a thousand times more beautiful than the earth
on which he dwells—above this frame of things—"

শ্রীমতী ফিনিস্‌ জোনস্‌-এর মতে সমালোচকেরও ইহাই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম। যতটুকু সমালোচনা করা হয়েছে আমি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তা করার চেষ্টা করেছি।

কয়েকজন তরুণ বন্ধুর কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করছি। প্রতিদিন আমার গৃহে গিরিশ নাট্যালোচনার জন্য যে পাঠচক্র বসতো, তাঁরা নিয়মিত উপস্থিত থেকে আমায় নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। স্নেহ ভাজন শ্রীঅনন্তলাল মিত্র, শ্রীসুশীল করণ, শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়, শ্রীধীরেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীমতী সুধীরা চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীবিমলেন্দু কয়ালকে সে জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই বক্তৃতামালা অন্যত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের অনুমতির ফলে বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে দ্রুত আত্ম-প্রকাশ করেছে।

বুকল্যাণ্ডের অন্যতম পরিচালক শ্রীজানকীনাথ বসু মহাশয় ও তাঁর প্রতিষ্ঠান সর্বতোভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি তাঁর কাছেও আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৬৫ সাল

৬৯।১।এ, গোপাল নগর রোড,
কলিকাতা-২৭

অহীন্দ্র চৌধুরী

সূচীপত্র

গ্রন্থ-পঞ্জী

আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস

কাশীরাম দাস—মহাভারত

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—শাস্তি কি শান্তি, উৎসর্গপত্র

নাট্যমন্দির—তৃতীয় বর্ষ, ১৯৩৯ খৃঃ

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস

বিনয় ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

বৃন্দাবন দাস—চৈতন্য ভাগবত

বঙ্গদর্শন—অগ্রহায়ণ, ১৩২১

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

ভারতচন্দ্র—অন্নদামঙ্গল

ভারতী—(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত)

ভাবপ্রকাশনম্

মন্মথমোহন ঘোষ—গিরিশ বক্তৃতা

হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত

সমাচার দর্পণ—২৬শে জানুয়ারী, ১৮৮২

সংবাদ কৌমুদী—১৮২১ (নং ৮)

সংবাদ প্রভাকর—২১শে আগষ্ট ১৮৪৮, ১৫ই জানুয়ারী ১৮৫৭

Aristotle on the Art of Poetry (Translated by Ingram Bywater)

B. L. Joshep—Elizabethian Acting (Oxford University Press)

Bengal Hurkara.

Calcutta Gazette—26th Nov., 1795 ; 10th March, 1796 ; 5th Nov., 1795

Calcutta Journal—29th March, 1822

Calcutta Review—Vol. XIII. 1882

Cambridge History of India. Vol. I

Englishman (29th June, 1893)

Etudes Critiques Vol. VII

Ferdinand Brunetiere—Play Making (1913)

Hemendra Nath Das Gupta—Indian Stage

Hindu Pioneer—22nd October, 1935

History of Bengal. Vol. I (Dacca University)

John Bulwar—Chirologia and Chironomia (1644)

Lebedeff—A grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects (Introduction)

Natya-Sastra Vol. I (Baroda Edition)

Pre-Aryan and Pre-Dravidian (Translated by P. C. Bagchi)

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1865

Proceedings of the Royal Irish Academy, Second Series, Vol. I

Shyama Prosad Mukherjee—The Bengali Theatre

Supplement to Govt. Gazette, June 12, 1823.

অহীন্দ্র চৌধুরী

উদ্ভব

প্রাচীন ভারতীয় নাটকের অভিনয় পদ্ধতি, মঞ্চসজ্জা, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, নাট্যকলা, বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলনের রীতি প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রই প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য ব'লে সর্বজনস্বীকৃত। অবশ্য ভরতের পূর্বেও নন্দিকেশ্বর, সদাশিব, ব্রহ্ম প্রভৃতির নাট্যশাস্ত্রের কথা জানা যায়, কিন্তু তাঁদের রচনাদির জীর্ণ খণ্ডাংশ ব্যতীত বর্তমানে আর কিছুই লভ্য নয়।*

ব্রহ্মার শিষ্য ভরত তাঁর সুপ্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তদানিন্তন প্রবৃত্তি অর্থাৎ আঞ্চলিক রীতিসমূহকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন—অবন্তী, দাক্ষিণাত্য, পাঞ্চালী এবং ওড্রমাগধী। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি এই প্রবৃত্তি সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, ওড্রমাগধী প্রবৃত্তি গ্রহণ করেছিল—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বৎস, ওড্র, মগধ, পুণ্ড্র, নেপাল, অন্তগির, বহিগির, প্লবঙ্গম, মলদ, মল্লবর্তক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বিদেহ এবং তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দেশ সমূহ।†

---

* "The school of Nandikesvare seems to be older than Bharata's"—M. Ramkrishna Kavi's Introduction to Natya-Sastra, Baroda edition—Vol. II page vi. "Abhinava, the commentator of the present work, clearly says that it represents three different schools of opinion viz of Brahman, Sadasiva and lastly Bharata's".—Natya-Sastra, Vol. I. Introduction, page No. 6. We have fragments of Brahmabharata and Sadasivabharata".—No. S. Baroda edition. Vol. I, page 6.

† "অঙ্গা বঙ্গা কলিঙ্গাশ্চ বৎসাশ্চৈবোড্রমাগধাঃ।
পৌণ্ড্রনেপালকাশ্চৈব অন্তগির বহির্গিরাঃ॥ ৪৫
তথা প্লবঙ্গমা জ্ঞেয়া মলদা মল্লবর্ত্তকাঃ।
ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতয়ো ভার্গবা মার্গবাস্তথা॥
প্রাগ্‌জোতিষাঃ পুলিন্দাশ্চ বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
প্রাঙ্গা প্রাবৃতয়শ্চৈব যুঞ্জন্তীহোড্রমাগধীম্॥ ৪৭

(ত্রয়োদশ অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্রের টীকা, অভিনবগুপ্ত ; নাট্যশাস্ত্র ২য় খণ্ড)

দাক্ষিণাত্যের বৃত্তি (style) "কৌশিকী" এবং অবন্তীর "শ্বাত্বতি" বলে উল্লেখিত হ'য়েছে, কিন্তু ওড্রমাগধী প্রবৃত্তির বৃত্তি যে কিরূপ ছিল ভরত মুনি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অভিনব গুপ্ত তাঁর টীকায় কেবলমাত্র বলেছেন উত্তরে মগধ ও দক্ষিণে ওড্র এই দুই স্থানের বৃত্তির অনুসারী ছিল এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী স্থান সমূহ।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচনার কালে খৃষ্টীয় ২।৩ শতকে বাংলা দেশে আর্যীকরণ সম্পন্ন হয়নি। আর্যাবর্ত হ'তে বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত পঞ্চাশটি পুত্রের ন্যায় কিছু সংখ্যক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী দুর্গম পথ লঙ্ঘন ক'রে উত্তর রাঢ়ে পদার্পণ করেছিল,—প্রচারের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছিল অন্ধ দীর্ঘতমস মুনির মত কতিপয় প্রচারক এবং পরবর্তীকালে মুষ্টিমেয় আর্যশ্রেষ্ঠীর পদধ্বনিও এই বঙ্গভূমিতে শ্রুত হয়েছিল; ধর্মপ্রচারের অভিপ্রায়ে জৈনপ্রচারক সম্প্রদায়ও এসেছিলেন বঙ্গভূমিতে। কিন্তু তখনও আর্য সংস্কৃতি, আচার, ধর্ম প্রাচীন বঙ্গের উপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়নি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত 'দস্যু' কোম, দ্বারা পূর্বভারত তখন অধ্যুষিত; বৌধায়ন ধর্মসূত্র হ'তে জানা যায় যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং পুণ্ড্র তখন ছিল আর্য সংস্কারবিহীন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত।

মৌর্য আধিপত্যের কালে উন্নতিশীল জনপদ পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ হয়েছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। হিউ এন্ সাঙের বিবরণ, মহাস্থানের ব্রাহ্মীলিপি এবং বিভিন্ন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে এর প্রমাণ বিদ্যমান।* কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, এই সময়ে বাংলা দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছিল এবং এই দেশের ধনৈশ্বর্য আকৃষ্ট করত দূর দূরান্তের বিদেশী বণিককে। যাহোক মৌর্যযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে ৪০০ খৃঃ অব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বাংলা দেশকে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী এবং সক্রিয়ভাবে

* "The Brahmi record at Mahasthan, which is usually assigned to the Mourya period, refers to Pundranagar as a prosperous city."—History of Bengal, Vol. I, Dacca University, page 44.

প্রভাবান্বিত করতে পারেনি; কেননা বণিক, ধর্মপ্রচারক বা ব্যবসায়ীরা তাঁদের কর্মধারা শহর ও বন্দরে সীমাবদ্ধ রাখতেন। বাংলার নিভৃততম গ্রামীণ সভ্যতা এঁদের প্রভাব হ'তে মুক্ত ছিল। বিক্ষিপ্তভাবে আগত আর্য সংস্কার বাঙ্গালী চিত্তের তটভূমিতে যা'কিছু অস্ফুট চিহ্ন অঙ্কিত করেছিল, বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তা' নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছিল। সুতরাং একথা চিন্তা করলে বিস্মিত হ'তে হয় যে, আর্য সংস্কৃতির প্রভাব বাঙ্গালী চিত্তে যখন কিছু ছিলনা বললেও চলে, আর্যভাষা বা সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য যখন বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়নি, তখন বঙ্গদেশে নাট্যশাস্ত্রের রীতি-নীতি মেনে সংস্কৃত নাটকের ধারানুরূপ নাটক ও অভিনয়ের প্রচলনের কথা ভরত মুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে কিরূপে উল্লেখ করলেন?

মৌর্য যুগে মগধ যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল, আর্য সংস্কৃতির-ধারক ও বাহকরূপে এবং সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যানুশীলনের পীঠস্থানরূপেও মগধ তখন বিশেষভাবে পরিচিত। অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর থেকে মগধের সঙ্গে ওড্রদেশের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং কলিঙ্গ আর্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের পথও সুগম হ'য়ে উঠেছিল। এই সকল স্থানে নাট্যশাস্ত্র সম্মত নাট্যাভিনয়ের প্রচলন থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয়। আর্য-সংস্কারবিহীন সমসাময়িক বাংলায় ঐরূপ নাটক অভিনয়ের কোনও সুযোগ ছিল বলে মনে করা খুবই কঠিন। কিন্তু তৎকালে বাংলাদেশে যে বিশেষ কোনও অভিনয়-কলার অস্তিত্ব ছিল একথা অনস্বীকার্য, নতুবা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের এতদঞ্চলে ওড্রমাগধী প্রবৃত্তির প্রচলন ছিল বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হ'তনা। বঙ্গদেশে নাটকাভিনয়ের কোন বৃত্তি (style) নির্ধারণে ভরতের নীরবতার মধ্য হতেই প্রমাণিত হয় যে, অভিনয় ক্ষেত্রে বাংলা দেশের একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বৃত্তি অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। এখানে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, প্রাচীন বাংলার নাটক ও অভিনয় আর্য সংস্কৃতির অনুকৃতি ছিল না, তা'ছিল বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে অভিমণ্ডিত। আর্য সংস্কার হ'তে স্বতন্ত্র বঙ্গীয় কৃষ্টির প্রকৃতি জানতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাঙ্গালী জাতির পরিচয় ও তার উৎপত্তির স্বরূপ নির্ণয় করা।

চলমান বর্তমানের নিকট হ'তে কিছুকালের জন্য বিদায় নিয়ে যদি আমরা ফিরে যাই সুদূর অতীতের রহস্যময় নৈঃশব্দের মধ্যে তা'হ'লে আমরা দেখতে পা'ব দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় ধারার সংমিশ্রণে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি ; তবে উচ্চবর্ণের মধ্যে আর্যশোণিতের ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত বলে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত।*

কিন্তু কেবলমাত্র দ্রাবিড় ও মঙ্গোলয়েডদের সংমিশ্রণে বাঙ্গালী জাতি উৎপত্তি লাভ করেনি। বাঙ্গালী জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদানরূপে পরিচিত অষ্ট্রিক বা কোল জাতির নাম অবশ্যই স্মরণীয়। আর্যীকরণের বহু পূর্ব হ'তেই বাংলা দেশে এবং সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল সমূহে অষ্ট্রোলয়েড জাতির বংশধরগণ যে বসবাস করতেন তা' প্রমাণসিদ্ধ। আর্যজাতির আগমনের বহু যুগ পূর্বেই এরা সমগ্র ভারতবর্ষময় পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছিল। ভাষা-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতানুযায়ী বলা যায় যে, কোল, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় এবং উত্তর ভারত হ'তে সমাগত আর্য ও আর্য ভাষাভাষিগণের (বাংলাদেশে এই উপাদানটি খুবই নগণ্য) সংমিশ্রণেই বর্তমান বাঙ্গালী জাতির বনিয়াদ রচিত।

বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি আলোচনায় সুনীতিকুমার যে Alpine short heads নামে এক উপাদানের উল্লেখ করেছেন তা' এই কোল জাতিরই শাখা বিশেষ ; এদের অবিকৃত রূপ আজও দেখতে পাওয়া যায় ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের জাতিবিশেষের মধ্যে, আসামের চা বাগানের কুলিরাও এদের বংশধর।

* "The Mongolo-Dravidian or Bengali type in Bengal and Orissa—This type is regarded as probably a blend of Dravidian and Mongoloid elements, with a strain of Indo-Aryan blood in the higher groups."—The Cambridge History of India, Vol. I, page 47.

"নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ আধুনিক বঙ্গবাসীগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মগধে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণকে আর্যজাতীয় অথবা আর্য সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু বঙ্গবাসীগণকে জাতি নির্বিশেষে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।" বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগ, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৩।

সুদূর অতীতে এদের ভাষা ও রীতিনীতি দ্রাবিড় ও আর্যজাতির সাথে কিছু পরিমাণে মিশ্রিত হয়েছিল। বর্তমান আর্যভাষা সমূহে এই সকল প্রভাব এখনও বিদ্যমান। পাশিলুস্কি (Przyluski) এবং লেভির (Sylvain Levi) ফরাসী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধগুলি থেকে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

"Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India" (Translated by P. C. Bagchi, Page 124-25) গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে, Sylvain Levi-র মতানুসারে বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভাষা দ্রাবিড় বা মঙ্গোলীয় কিছুই ছিল না, তা' ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। James Hornell প্রভৃতি অনুমান করেন যে, প্রাক দ্রাবিড় যুগে পলিনেশীয় প্রভাব এখানে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।*

পশিলুস্কি দেখিয়েছেন যে, কম্বল, কদলী, ফল, বাণ, লিঙ্গ, লগুড় প্রভৃতি কতিপয় সংস্কৃত শব্দ মুলত প্রাচীনকালের কোলদিগের ভাষাগত প্রভাবেরই ফলশ্রুতি স্বরূপ।

বাংলায় যে প্রাচীনকালে কোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য জাতি বাস করত তা বাংলা দেশের বহু পল্লীর নাম এবং গ্রাম্য অনেক শব্দের অদ্যাবধি প্রচলনের মধ্য হ'তে সহজে অনুমেয়।

এইরূপে দেখা যায় যে, অষ্ট্রিক ভাষী অষ্ট্রোলয়েড জাতির লোকেরা বাঙ্গালীর জাতি ও ভাষাগত পরিচয়ের ক্ষেত্রে অনেকখানি স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। এদের নিকট হ'তে কৃষি-সভ্যতা লাভ করেছে বলেই বাঙ্গালী জাতি তা'দের প্রধান খাদ্যের জন্য ধান্যের উপর নির্ভরশীল।

অষ্ট্রোলয়েডদের মধ্যে বহুল-প্রচলিত খাদ্যবস্তুতে আমাদেরও ভোজন-

* Sylvain Levi draws the conclusion that the primitive peoples of Bengal and some neighbouring provinces spoke a language that was neither Aryan nor Dravidian, but belonged to a separate family of speech. Other scholars suspect a strong Polinesian influence on the Pre-Dravidian population of the southern coast of India."—History of Bengal Vol. I, Dacca University, page 37.

তালিকার অনেকটা অংশ জুড়ে থাকতে দেখা যায়। কলা, লেবু, পান, লাউ, বেগুন, ডালিম, ডুমুর প্রভৃতি ভোজ্য সামগ্রীর বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানের অধিবাসী অষ্ট্রিক ভাষী পলিনেশীয়গণ তাল বৃক্ষের গুঁড়ি দিয়ে ডোঙা প্রস্তুত ক'রে তা'র দ্বারাই জলপথে যাতায়াত ও বাণিজ্যাদি পরিচালনা করত। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ডোঙ্গা, ভেলা ইত্যাদির প্রচলন এখনও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। বাংলার আদি অধিবাসী অষ্ট্রিক ভাষাভাষী কোল, ভীল, সাঁওতাল, শবর, নিষাদ প্রভৃতি অরণ্যচারী ও পর্বত-বাসী অনার্যদের প্রভাব বঙ্গীয় সংস্কৃতির উপর আজও বিশেষভাবে অনুভূত হ'য়ে থাকে। বৃক্ষ, প্রস্তর, ফলমূল, পশুপক্ষী প্রভৃতিকে দেবতারূপে কল্পনা ক'রে পূজা করার রীতি কোলদের নিকট হ'তেই বাঙ্গালী অনেকাংশে গ্রহণ করেছে। এখনও মুণ্ডা, শবর, সাঁওতাল প্রভৃতির মধ্যে এই সকল প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়।

আর্যগণের আগমনের বহু পূর্ব হ'তেই বাংলা দেশে কোল জাতির ন্যায় দ্রাবিড় জাতির অধিষ্ঠান।

অবশ্য পরবর্তী যুগে আর্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত হ'য়ে দ্রাবিড় জাতির একটি শাখা উত্তর ভারত থেকে ক্রমশ পূর্বে বঙ্গদেশ অভিমুখে আগমন করতে থাকে এবং সাঁওতাল পরগণার পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম ক'রে রাঢ়ে এসে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু তা' অনেক পরের কথা; প্রত্ন-প্রস্তর-যুগে (Paleolithic age) আর্যগণ যখন ভারতভূমি থেকে বহু যোজন দূরে, সেই সুপ্রাচীনকালেও যে বাংলাদেশে দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্ব ছিল এবং তখন থেকেই যে দ্রাবিড় সভ্যতা বাঙ্গালীর সংস্কৃতির উপর যথেষ্ট প্রভাবশালী—একথা আজ নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে সংশয়হীনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক যুগ অধ্যায়ে খ্যাতনামা পুরাতাত্ত্বিক ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যা' লিখেছেন এখানে তা'র অংশ বিশেষ উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হ'ল। তিনি লিখেছেন—"সুবিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ভিন্সেণ্ট বল্ মান্দ্রাজে আবিষ্কৃত প্রত্নপ্রস্তর-যুগের অস্ত্রসমূহের সহিত বঙ্গদেশের ও উড়িষ্যার এই যুগের নিদর্শনসমূহের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই উভয় প্রদেশের প্রাচীন শিলা-নির্মিত

প্রহরণের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে দক্ষিণাপথবাসী আদিম মানবগণের সহিত উত্তরাপথবাসী প্রাচীন মানব জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মাদ্রাজে ও বাংলায় আবিষ্কৃত প্রত্নপ্রস্তর-যুগের অস্ত্রসমূহের সাদৃশ্য কেবল আকারগত নহে, অনেক সময় উভয় দেশে আবিষ্কৃত অস্ত্রের পাষাণ একই জাতীয়। যে স্থানে এই জাতীয় প্রস্তর পাওয়া যায়, সে স্থান বাংলা দেশ হইতে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ভিন্সেণ্ট বল্ অনুমান করেন যে, আদিম মানবগণ প্রত্নপ্রস্তর-যুগে এই সকল প্রাচীন অস্ত্র দক্ষিণাপথ হইতে উত্তরাপথের পূর্বখণ্ডে আনয়ন করিয়াছিলেন।"* আর্য উপনিবেশ স্থাপনের বহু পূর্ব হতেই যে বাংলা দেশ দ্রাবিড়জাতি-অধ্যুষিত, এ সত্য প্রমাণের জন্য পুরাতাত্ত্বিকগণ বহুবিধ তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। "বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্তসার" গ্রন্থের লেখককে একস্থানে লিখতে দেখি—

"কিন্তু আর্যজাতি কর্তৃক উপেক্ষিত হইলেও এবং প্রাচীন আর্যগ্রন্থে বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকিলেও চীন দেশীয় বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খৃঃ পূঃ ৭ম শতকে এই দেশ হইতে Luck-lom নামধারী এক জাতি সুদূর বর্মা সীমান্তে ও আসাম প্রদেশে তাহাদের প্রাধান্য বিস্তার ও রাজ্য স্থাপন করে। বলা বাহুল্য, এই Luck-lom জাতি দাক্ষিণাত্যের তামিল ও তেলেগুভাষী দ্রাবিড় জাতির শাখা বিশেষ। তখন এদেশের নাম ছিল Bong-long; অর্থাৎ জাতির নাম ছিল Bong, এবং Bong জাতির বাসস্থান বলিয়া দেশের নাম ছিল Bong-La, কারণ long শব্দ অনার্য Suffix 'লা' এর আনাম দেশীয় বিকৃতি মাত্র।

চীনদেশীয় বিবরণ

Luck-lom নামধারী দ্রাবিড় জাতির শাখা বিশেষের বাংলায় অবস্থিতি

এই সব কারণে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন যে, খৃঃ

* V. Ball—Stone implements found in Bengal, Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1865. Pp. 127-28 and (Proceedings of the Royal Irish Academy, 2nd series. Vol. I., page 394).

পূঃ ৭ম শতক হইতে অর্থাৎ আর্যদের আগমনের পূর্ব হইতেই এই দেশ বাঙ্গালা আখ্যালাভ করিয়াছিল।”*

দ্রাবিড় সংস্কৃতি প্রাচীন বাংলার অধিবাসী অষ্ট্রো মঙ্গোলয়েড জাতির উপর সেই সুদূর অতীতেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং কালক্রমে এদের সাঙ্গীভূত হ'য়ে যায়। জীবজগতের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস অনুধাবনে যেমন জীবাশ্ম বা fossil record বিশেষ সাহায্যকারী, তদনুরূপ বাংলাদেশে দ্রাবিড় সভ্যতার লুপ্তাবশেষ চিহ্নসমূহ বাংলার বুকে আজও প্রবহমান, সেদিনের ক্ষীণ ধারার মধ্য হ'তে অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয় বাংলায় দ্রাবিড় সংস্কৃতির অস্তিত্বের কথা। গোবর্ধন আচার্যের মতানুসারে একাদশ শতাব্দীর পূর্বেও বাংলায় প্রচলিত ময়ূরধ্বজ, ইন্দ্রধ্বজ প্রভৃতি ধ্বজপূজা দ্রাবিড়দের নিকট হ'তেই বাঙ্গালী গ্রহণ করেছে। দ্রাবিড়জাতি অশ্বত্থ বৃক্ষকে কল্পনা করেছিল জীবন বৃক্ষের প্রতীকস্বরূপ। অতি প্রাচীনকালেই দ্রাবিড়দের শিবোৎসবে জীবন বৃক্ষের প্রতীকরূপে একটি কাষ্ঠদণ্ড প্রতিষ্ঠা করার রীতি প্রচলিত ছিল।

বাঙ্গালীর ধ্বজপূজা দ্রাবিড় সংস্কৃতির দান

ইন্দ্রধ্বজ পূজা বা উৎসব বা ইঁদপূজা যে আদিম অধিবাসীদের নিজস্ব অবদান এবং তাদেরই কল্পনাপ্রসূত একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কালো পাথরে খোদাই করা প্রস্তর মূর্তির ন্যায় সাঁওতালদের এই জাতীয় উৎসবগুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত E. C. Man এর “Sonthalia and the Sonthals” গ্রন্থ থেকে “ছত্তা বঙ্গা” নামক একটি সাঁওতালী উৎসবের বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। এই উৎসবের বিবরণে Man সাহেব যে কথা বলেছেন, তা বাংলাদেশে প্রচলিত ইন্দ্রধ্বজ পূজার আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছু উপকরণ ও উৎসবাদির

ইন্দ্রধ্বজ উৎসব আদিম অধিবাসীদের একান্ত নিজস্ব বস্তু

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্তসার, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬।

সম্পূর্ণ অনুরূপ।* আদিম জাতির বিজয়োৎসব এই ধ্বজ উৎসব ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। প্রাক্ আর্যযুগে অনার্য জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী বা কৌমের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধ্‌ত এবং বিজয়ী কৌমপতি বিজয়লাভের স্মারক হিসাবে সমবেতভাবে উৎসবপালন করত। এই জন্যই যুদ্ধসংক্রান্ত নৃত্যগীতাদি এই সকল উৎসবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অনার্যগণের একান্ত নিজস্ব বৃক্ষপূজা এবং সুফসলাকাঙ্ক্ষার উৎসবও এই ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের মধ্যে সম্মিলিতভাবে মিশে গিয়েছে।

বিজয়োৎসবের স্মারক এই ইন্দ্রধ্বজ উৎসব

অনার্যদের বিজয়োৎসবই পরবর্তীকালে আর্যগণের বিজয়সূচক ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের নাম গ্রহণ করেছিল।

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্যগণ দ্রাবিড়দের দেবতা শিবকে করে রেখেছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু নটনাথরূপে আখ্যাত শিবের নিকটেই আর্যগণের দেবতা ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এবং তা'র ফলেই রচিত হ'য়েছিল নাট্যবেদ নামক পঞ্চম বেদ। ব্রহ্মা পরে তদীয় শিষ্য, ভরত মুনিকে উক্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করেন এবং ভরতের লেখনী হ'তে জন্মলাভ করে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যশাস্ত্র। এই নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী ভরত এক অভিনয়ের আয়োজন করেন। ব্রহ্মা সমাগত ইন্দ্রধ্বজ পূজার তিথিতে এই অভিনয় অনুষ্ঠান করতে বলেন। তদনুসারে ইন্দ্রের অসুর ও দানব বিজয়ের স্মারক হিসাবে ভরত প্রথমে নান্দীর পর অসুর বিজয়ের কাহিনীটিই রূপায়িত করলেন। দৈত্য-দানবদের নিধন করার বিষয়টি যখন অভিনীত হচ্ছিল তখন অনাহূত দৈত্যরা বিঘ্নপতি বিরূপাক্ষ সহ অনুষ্ঠান পণ্ড করবার জন্য আক্রমণ করল।

আর্যগণ কর্তৃক অপাঙ্‌ক্তেয় দ্রাবিড় দেবতা শিবের নিকট ব্রহ্মার নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন

ভরত কর্তৃক ইন্দ্রের দানব বিজয়ের কাহিনী রূপায়ণ

ইন্দ্র তখন রত্নখচিত ধ্বজ দণ্ডটির দ্বারা দৈত্য ও বিঘ্নদের প্রহার করতে লাগলেন। বিঘ্নদের এই দণ্ডের দ্বারা প্রহারে জর্জরিত করার জন্য এই ধ্বজ দণ্ডটির নাম হ'ল "জর্জর দণ্ড"।

জর্জর দণ্ড

* "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি"—শ্রীবিনয় ঘোষ।

দানব বিজয়ের সাফল্যস্বরূপ ইন্দ্রধ্বজ উৎসব বিজয়লাভের মহোৎসবরূপে রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রচলিত। আর্যগণের এই ইন্দ্রধ্বজ দ্রাবিড় জাতির বৃক্ষ পূজা হ'তেই গৃহীত হয়েছে। দ্রাবিড়-গণের শিবোৎসবের পূর্বে জীবন বৃক্ষের প্রতীক স্বরূপ দণ্ড রোপণই পরবর্তী কালে আর্যগণ গ্রহণ করেছিলেন। দ্রাবিড়দের মত আর্যরাও নৃত্যগীত সহকারে এই পূজা সম্পন্ন করতেন।

আর্যদের ইন্দ্রধ্বজ উৎসব দ্রাবিড়দের বৃক্ষ পূজা থেকে গৃহীত।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে ঝাড়গ্রাম, মানভূম, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীনকালে ইন্দ্রধ্বজ পূজাকে কেন্দ্র ক'রে খুবই আড়ম্বর ও উৎসাহ উদ্দীপনাময় উৎসব অনুষ্ঠিত হত। এই উৎসব ঐ দ্রাবিড় সভ্যতার চিহ্নস্বরূপ। বর্তমানেও সেই অবলুপ্তপ্রায় উৎসবের ম্লান প্রতিফলন এই সকল অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। এই ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের তাৎপর্য এবং এর প্রচলনের পশ্চাতে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা বর্তমান, তার পরিচয়লাভ করলে একথা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারা যাবে যে, আর্য সংস্কৃতির প্রভাবের বহু পূর্ব হতেই দ্রাবিড় সংস্কৃতির অস্তিত্ব বাঙ্গালীর মধ্যে কিরূপ জাজ্বল্যমান ছিল এবং বর্তমানেও কিভাবে বিরাজ করছে।

বিষ্ণুপুরের রাজারা এখনও এই ইন্দ্রধ্বজের উৎসব পালন ক'রে থাকেন কিন্তু সে উৎসবে প্রাচীন কালের আড়ম্বর ও প্রাণ-চাঞ্চল্যের একান্ত অভাব তবু এই কঙ্কাল দেখেও চিনতে ভুল হয় না এর আসল স্বরূপ। ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে নবীন বেশভূষায় সুসজ্জিত রাজা স্বয়ং শোভাযাত্রা সহকারে বনভূমিতে গমন করতেন এবং তাঁর তরবারির রেখাঙ্কিত দুটি বৃহৎ শালবৃক্ষকে ছেদন ক'রে তদ্দ্বারা ইন্দ্রধ্বজ বা ইঁদ নির্মাণ করা হ'ত। উৎসব ক্ষেত্রে অরণ্য প্রকৃতির স্নেহের দুলাল সাঁওতালগণ দলে দলে এসে সমবেত হ'ত; নৃত্যগীত ও আনন্দ কলরবে উদ্দাম হ'য়ে উঠত সমগ্র বিষ্ণুপুরের স্নায়ুতন্ত্র।

মেদিনীপুরের ধারেন্দা পরগণায় আজও ইঁদ পূজার প্রচলন রয়েছে। মাঠের মধ্যে শালবৃক্ষ প্রোথিত ক'রে তার শীর্ষ দেশে একটি বংশ নির্মিত ছত্র নববস্ত্রে আবৃত ক'রে স্থাপন করা হয়।

রাত্রিকালে নৃত্যগীত বাদ্যের সুরছন্দে স্থানটি হ'য়ে উঠত পুলক-চঞ্চল। বর্তমানের পরিবর্তিত পটভূমিকায় সেদিনের সেই উৎসবের দীপাবলী আজ নির্বাণোন্মুখ।

দ্রাবিড়দের শিবের উৎসব উপলক্ষ্যে যে নৃত্যগীত অভিনয়াদি অনুষ্ঠিত হ'ত তা'তেই নাটকের অঙ্কুরোদ্গম, আর্যগণের প্রথম নাট্যাভিনয়েও দ্রাবিড় প্রভাবান্বিত ইন্দ্রধ্বজ ব্যবহৃত হ'য়েছিল এবং সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি-ক্ষেত্রে এর প্রভাব কম নয়। বঙ্গদেশের পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন স্থানে যে ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রচলন রয়েছে তা'তেও নৃত্যগীত, মূক অভিনয়, বিভিন্ন প্রকারের ভাবভঙ্গী প্রভৃতির সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় সংস্কৃতির উপর দ্রাবিড় প্রভাব নানা বিষয়েই প্রতীয়মান। বর্তমানে বাংলার চড়কগাছ প্রতিষ্ঠা এবং বৈশাখের প্রথম দিনে ধ্বজা রোপণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান আজও দ্রাবিড় সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বাংলা দেশে অদ্যাবধি প্রচলিত বৃক্ষ-পূজা, শক্তির আধার নানাপ্রকার দেবীর পূজা, কৃষি সংক্রান্ত পূজা, শিবের গাজন প্রভৃতি এদেশে দ্রাবিড়ীয় কৃষ্টির জলন্ত প্রমাণ স্বরূপ নিঃসংশয়ে উল্লেখযোগ্য।

ব্রতোৎসবের মধ্যে এখনও বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির যে ধারা প্রবাহিত তার মধ্যেও উক্ত প্রভাব অন্তঃশীলা। শিবপূজা ব্রত, প্রাচীন দ্রাবিড়দের প্রজাবর্ধক দেবতার প্রতীকস্বরূপ লিঙ্গমূর্তির পূজার বর্তমান রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রতোৎসব ব্যতীত ধর্মঠাকুরের পূজা, মালদহ অঞ্চলের গম্ভীরার পূজা, গণেশ, ভৈরব, কার্তিকেয়, মাতৃকাতন্ত্রের বিভিন্ন দেবীর আরাধনা প্রাক্ আর্য সংস্কৃতির নিদর্শন এবং দ্রাবিড় সমাজের ধ্যানধারণা ও কল্পনা থেকে উদ্ভূত। এ সকল ছাড়া বাঙ্গালীর মৎস্যাহার, মৃৎশিল্প, চারু ও কারুশিল্পের প্রতি প্রীতি এবং সহজাত নৈপুণ্য, শিল্পমণ্ডিত বিলাস উপকরণ প্রভৃতির মধ্যে মহেঞ্জদারোর দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক মিশ্রণের অভিপ্রকাশ। এইরূপে বিচিত্র সংস্কৃতির আবর্তে বিঘূর্ণিত বাংলার মানস প্রকৃতি ও সংস্কৃতি এক অপূর্ব আকার ধারণ করেছে এবং আর্যগণের থেকে পৃথক ক'রে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছে।

বাংলা দেশে জৈনতীর্থঙ্করগণ আগমন করেছিলেন, কিন্তু তাঁ'রা কোন প্রভাব রেখে যেতে পারেন নি। এঁদের পর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছিল মৌর্য রাজাদের রাজত্বকালে, এবং পাল রাজাদের সময়ে বাংলার প্রাচীন ধর্মকে নবরূপে মণ্ডিত করেছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের শূন্যবাদ প্রাচীন দেবতা শিবকে ধর্ম ঠাকুররূপে গ্রহণ করল এবং শিবোৎসব পরিণত হ'ল ধর্মোৎসব বা ধর্মের গাজন উৎসবে। এইভাবে প্রাগৈতিহাসিক লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান কালক্রমে 'গাজন' নামে পরিচিত হয়। শৈব প্রভাববহুল ক্ষেত্রে যা' শিবের গাজন, ধর্ম ঠাকুরের প্রতিপত্তি স্থলে তা' ধর্মের গাজন এবং বৌদ্ধ প্রভাবিত ক্ষেত্রবিশেষে আবার তাই আদ্যের গাজন নামে অভিহিত।*

শিবের গাজন উপলক্ষ্যে গ্রাম্য শিবতলা থেকে বড় তামাসার যে মিছিল বার হয় তা'তে 'গাজুনে শিব' নামে একখণ্ড কাষ্ঠকে বাদ্যসহকারে গ্রামান্তরের শিবতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই মিছিলের মধ্যে নৃত্যগীত সহকারে শিব সম্পর্কিত বিবিধ লৌকিক কাহিনী গীত হ'য়ে থাকে। কোনও কোনও বিষয় অভিনীত হ'তেও দেখা যায়। শিবকে কৃষির দেবতারূপে কল্পনা ক'রে কৃষক দেবতার চিত্রটি এই অভিনয়ের মধ্যে রূপায়িত করা হয়। মুখোস পরে, সং সেজে শিব মহিমা-জ্ঞাপক কাহিনী রূপায়ণের প্রচেষ্টা এই গাজনের একটি বিশেষ অঙ্গস্বরূপ। তখনকার দিনে মাটির বা কাঠের মুখোসও তৈরি হ'ত; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে, প্রাচীন বাংলার মুখোস আজও যা' সংগৃহীত হ'য়েছে তাতে রাক্ষস, পিশাচ, ভৈরব প্রভৃতির মুখোসের সঙ্গে তিব্বতী ভৈরব মূর্তির খুবই সাদৃশ্য বিরাজমান। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার বাংলার সংস্কৃতিতে আগমন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত এই সকল জিনিসের ধারাও তিব্বত থেকে এখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। বলা বাহুল্য, বঙ্গ ও কামরূপ কিছুদিন তিব্বতের অধিকারভুক্ত ছিল। বঙ্গোপসাগরকে চীনদেশীয়রা তিব্বত সাগর বলে অভিহিত করত।

প্রাচীনকালে সামাজিক কোনও নৃত্যগীত অনুষ্ঠানে সমষ্টিগত গীত রচনার মধ্যে সমাজ মানসের প্রতিফলন ঘটত। ক্রমে এই সকল লোকগীতি থেকে

* 'গিরিশ বক্তৃতা'—অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু।

আখ্যায়িকা গীতি (Ballad) প্রভৃতি জন্মলাভ করে। মঙ্গল কাব্য সমূহের মধ্যেই সর্বপ্রথম পাওয়া গেল একটি সম্পূর্ণাঙ্গ পরিণত কাহিনী। ইতিপূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে নানাপ্রকার ছড়া, গান প্রভৃতিতেই দেশ পরিব্যাপ্ত ছিল। এই সকল মঙ্গল কাব্য লৌকিক দেবতাকে পুরাণোক্ত দেবতার মর্যাদা দান করে জনগণচিত্তে তার সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই রচিত হ'ত। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় যে, দেবতার স্তুতিবাচক নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই মানস অভিব্যক্তির সর্বপ্রথম প্রতিফলন ঘটে। বাংলাদেশেও দেবতার লীলাবর্ণনমূলক পালাগান, গীতি কবিতা, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির মধ্যেই শোনা গিয়েছিল নাট্য প্রচেষ্টার দূরাগত পদধ্বনি।

দশম শতকের শেষ পাদে ২য় ধর্মপালের রাজত্বকালে রচিত 'শূন্য পুরাণ' গ্রন্থখানিই, প্রাচীনতম গীতি কাব্যরূপে বিশেষজ্ঞগণের নিকট পরিচিত। গীতিময় মঙ্গলকাব্যে একটা পূর্ণ কাহিনী গড়ে ওঠার মধ্য দিয়েই যাত্রার উদ্ভবের পথ প্রস্তুত হয়েছিল।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে 'যাত্রা' একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বাংলাদেশে গাজনের সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রারও বহুল প্রচলন দেখা যায়। এই যাত্রা বাঙ্গালীর নাট্যরস পিপাসা অনেকাংশে মেটাতে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু 'যাত্রা'র উৎপত্তির ইতিহাস অতি প্রাচীন। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকোষে 'যাত্রার' সংজ্ঞা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

যাত্রা

বিশ্বকোষের লেখক বলেছেন—"অতি প্রাচীনকাল হ'তে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই প্রকাশ্য রঙ্গভূমে বেশভূষায় ভূষিত ও নানা সাজে সুসজ্জিত নরনারী নিয়ে গীতবাদ্যাদি সহকারে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ অভিনয় করবার রীতি প্রচলিত। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত ভগবদ্ অবতারের লীলা ও চরিত্র ব্যাখ্যান করা এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য।......গীতবাদ্যাদি যোগে ঐ সকল লীলোৎসব প্রসঙ্গে যে অভিনয়ক্রম প্রদর্শিত হ'য়ে থাকে, তাই প্রকৃত যাত্রা বলে অভিহিত।"

বুদ্ধযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রভৃতিতে দেবতাকে নায়করূপে কল্পনা করে আপনাদিগকে তাঁর সখারূপে

জ্ঞান ক'রে তাঁর লীলার অংশভাগী হ'বার নিমিত্ত উৎসবে যোগদান করাই প্রাচীনকালে যাত্রা নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত ছিল, কিন্তু কালক্রমে ঐ দেবলীলায় গমন বা যোগদানরূপ ব্যাপার (going in a procession) সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং একই স্থানে বসে নৃত্যগীতের মাধ্যমে দেবলীলা, অভিনয়ের রীতিতে পরিণত হয়। আমাদের অনুমান মন্দির-পরিক্রমার পর এইভাবে বৃত্তাকারে ব'সে নাটমন্দিরে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন সূচক অভিনয় রূপে, যাত্রা অনুষ্ঠিত হত। সারদাতনয় (দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে) তাঁর "ভাব প্রকাশনম্" নামক অলঙ্কার গ্রন্থে নাটমণ্ডপ বর্ণনা করার সময় ত্রিবিধ মণ্ডপের বিষয় উল্লেখ করেছেন।*

অবশ্য ইতিপূর্বেই ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ত্রিবিধ মণ্ডপের কথা বর্ণিত হয়েছে যথা, বিকৃষ্ট, চতুরস্র, ত্র্যস্র অর্থাৎ আয়ত, বর্গ এবং ত্রিভুজাকার। এর মধ্যেও আবার জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, অধম প্রভৃতি বহু ভেদের বিষয় তিনি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'ভাব প্রকাশনমে'ই আমরা সর্বপ্রথম পেলাম নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত বিকৃষ্টের পরিবর্তে বৃত্তাকার মণ্ডপের বিবরণ। চতুরস্র ও ত্র্যস্র মণ্ডপের বিষয় উভয়ের মধ্যে কোন মতভেদ দেখা যায় না। তৎকালে সাধারণত এই রকম বৃত্তাকার মঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয় হত ব'লে মনে হয় না। কিন্তু দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে সারদাতনয়ের সমসাময়িক কালের ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় মন্দির নির্মিত হয়েছে। তখন নাটমন্দিরের মণ্ডপগুলির গঠন সাধারণত বৃত্তাকার হ'ত। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারা যায়, খাজুরাহোর 'লক্ষ্মণ মন্দির' নির্মিত হয়েছে ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে। এই মন্দিরের নাটমণ্ডপটি চারদিকে চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও এই মণ্ডপের গঠন ছিল সম্পূর্ণ বৃত্তাকার। St. Kramrisch রচিত 'The Hindu Temple' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম ভাগে সপ্তম অধ্যায়ে 'Proportions of the Maṇḍapa' শিরোনামাঙ্কিত অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে বহু তথ্য জ্ঞাত হওয়া যাবে। এই

* চতুরস্র ত্র্যস্র বৃত্তভেদাৎ সোঽপি ত্রিধাভবেৎ।
পরমণ্টপিকৈঃ সস্তিঃ পৌরজানপদৈঃ সহ॥
(ভাব প্রকাশনম্ ২৭৪ পৃঃ ১০ম শ্লোক)।

অধ্যায়ে ২৫৫ পৃষ্ঠায় খাজুরাহোর 'লক্ষ্মণ মন্দিরের' একটি নকসা দেওয়া আছে। বৃত্তাকার নাটমণ্ডপ সম্পর্কে জানবার জন্য যাঁরা আগ্রহশীল তাঁদের ঐ চিত্রটি দেখবার জন্য অনুরোধ করি।

সারদাতনয় 'বিকৃষ্ট' নাটমণ্ডপের পরিবর্তে কেন যে বৃত্তাকার নাটমণ্ডপের কথা উল্লেখ করেছিলেন সে প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বৃত্তাকার নাটমণ্ডপই তিনি তখন দেখেছিলেন, বিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটমণ্ডপ হয়ত তিনি দেখেন নি। সেই সময়ে রাজ প্রাসাদে চতুরশ্র এবং কোন কোন স্থানে নৃত্যগীতাদির জন্য হয়ত বা ত্র্যশ্র মণ্ডপও বাঁধা হ'ত, সারদাতনয় তা' প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই এই দুই শ্রেণীর নাটমণ্ডপের উল্লেখ তিনি করেছেন। সেই যুগে 'বিকৃষ্টের' ন্যায় শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ নির্মাণ ক'রে অভিনয় নৃত্য, গীতানুষ্ঠান করার মত আড়ম্বর লক্ষ্য করা যেত না। তখনকার সমস্ত নাট্যকলা চর্চার আড়ম্বর এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল মন্দিরের সীমানার মধ্যে;—তাই ক্রমশঃ মন্দিরে 'দেবদাসী' রাখা হ'ত, উচ্চাঙ্গের সংগীত সমৃদ্ধ পালাগান, নৃত্যানুষ্ঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হ'ত।

বাংলা দেশেও তখন পৌণ্ড্রবর্ধনে কার্তিকেয় মন্দির প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে। এই কার্তিকেয় মন্দিরের বৃত্তাকার নাটমণ্ডপে (ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী) নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হ'ত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ জয়ন্ত এই সকল নৃত্য-গীতাদির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মন্দির থেকে দেবমূর্তিকে নিয়ে নৃত্যগীতাদি সহকারে শোভাযাত্রা ক'রে নগর প্রদক্ষিণ করা হ'ত; আজও ভারতের বহু স্থানে এই দেবতাকে নিয়ে যাত্রা করার রীতি প্রচলিত আছে। এই দেবতাসহ প্রদক্ষিণকেই যাত্রা বলা হত, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

শোভাযাত্রাকারীরা প্রদক্ষিণ শেষে অতঃপর মন্দিরে ফিরে এসে দেবতাকে গর্ভগৃহে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর সম্মুখে নাটমণ্ডপে বৃত্তাকারে দর্শক বেষ্টিত হ'য়ে সেই দেবতার মহিমাজ্ঞাপন পালাগানের অনুষ্ঠান করত। ক্রমে যখন এই নাটমণ্ডপে পালাগান সুসংস্কৃতরূপ ধারণ করল এবং তা'র মধ্যে ছড়া, পয়ার, বক্তৃতা, উচ্চাঙ্গসংগীত প্রভৃতি

এসে দেখা দিয়ে পঞ্চ অঙ্গ বিশিষ্ট পাঁচালির রূপ ধারণ করল; তখন যাত্রাকারীদের মধ্যে দুটি ভাগ হ'য়ে গেল। কিন্তু তাহ'লেও নাটমণ্ডপে অভিনয়ানুষ্ঠানও যাত্রা নামেই অভিহিত হ'ত। পূর্বে দেবমূর্তিসহ শোভা-যাত্রায় যারা যোগ দিত তারাই আবার নগর প্রদক্ষিণান্তে দেবতার সম্মুখে গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করত। কিন্তু এই সময় থেকে একদল কেবলমাত্র সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিতে লাগল এবং অপর দল সাজসজ্জা করে নাটমণ্ডপে দেবলীলা বর্ণনমূলক উচ্চাঙ্গ সংগীতময় পালাগানে অংশ-গ্রহণে ব্রতী হ'ল। এইরূপে বৃত্তাকার নাটমণ্ডপে অভিনয় অনুষ্ঠানের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হ'ল পরবর্তীকালের যাত্রাভিনয়।

বৃত্তাকার নাটমণ্ডপের চারপাশে শ্রোতৃমণ্ডলী উপবিষ্ট হ'ত এবং অভিনয় পালাগান প্রভৃতির অনুষ্ঠান হ'ত মধ্যস্থলে। সেই থেকে এরূপ একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, পাঁচালি, পালাগান প্রভৃতি অনুষ্ঠান নগরে, গ্রামে, হাটে, চণ্ডীমণ্ডপে, রাজগৃহে, জমিদার বাটীতে যেখানেই হোক না কেন এইভাবে দর্শকবৃন্দ কর্তৃক বৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত আসরের কেন্দ্রই তার উপযুক্ত স্থানরূপে বিবেচিত হ'ত। যাত্রাভিনয়ের অনুষ্ঠানেও ক্রমশঃ এই ধারাই প্রবর্তিত হয়েছিল।

এই 'যাত্রা' শব্দটি যে মূলতঃ দ্রাবিড় শব্দ এবং তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাবের অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ আজও বঙ্গদেশে বিদ্যমান একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী ছোটনাগপুরের দ্রাবিড়-ভাষাভাষী ওঁরাওদের মধ্যে 'যাত্রা' নামে এক উৎসব এখনও প্রচলিত। এই উৎসবে এই জাতীয় অবিবাহিত যুবকযুবতীরা এসে মিলিত হয় এবং যাত্রাক্ষেত্রে প্রোথিত একটি কাষ্ঠখণ্ডের চতুর্দিকে নৃত্যগীতানুষ্ঠান ক'রে থাকে।

এই 'যাত্রা' শব্দটি আজও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎসব অর্থে ব্যবহৃত হয়। দাক্ষিণাত্যের গ্রামাঞ্চলে 'মারীযাত্রা' ও সমুদ্রোপকূলে মৎস্যজীবীদের 'যাত্রে' নামক উৎসবগুলি অদ্যাবধি সেই সাক্ষ্যদান করছে।*

---

* বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য

অনেকের মতে সূর্যের দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ কৃষিজীবি জনসাধারণের চিত্তে নানারূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ জন্মলাভ করে সূর্যোৎসব। পাশ্চাত্যবাসীদের বড়দিনের উৎসব, উড়িষ্যার রথযাত্রা, বাংলার চড়কপূজা প্রভৃতি কক্ষপথে সূর্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতির স্মরণোৎসব ব্যতীত আর কিছুই নয়। পরবর্তীকালে এই সূর্যযাত্রাই শিবযাত্রা বা গাজন, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতিতে পরিণত হয়েছে।

প্রাচীন যাত্রার মধ্যে অনুরণিত হ'য়ে উঠত মঙ্গল কাব্য; পাঁচালী প্রভৃতির গীতিসুর। যাত্রাভিনয়ের সুরতরঙ্গে পরিপ্লাবিত হ'ত বাঙ্গালীর ভাবচিত্ত। কিন্তু এই সকল তদানীন্তন যাত্রার মধ্যে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের কোন অবকাশ ছিল না, কারণ যাত্রার মাধ্যমে তখন বর্ণিত হ'ত দেবতার অলৌকিক মহিমা; মানুষের সুখ দুঃখময় জীবনের সংঘাতের চিত্র এর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। সংলাপের পরিবর্তে সংগীতের আতিশয্য সুর-বিহ্বল ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করত। কিন্তু এই প্রাচীন যাত্রার মধ্যে ক্রমশঃ নাটকীয় আবেদন, সংলাপ প্রভৃতির অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপরিণত সংলাপের কিছু আভাস পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও বড়াই এই তিনটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে গীতিসুরে হলেও প্রথম উত্তর-প্রত্যুত্তর করতে দেখতে পাওয়া গেল। মঙ্গল কাব্যের পালাগান প্রভৃতির মধ্যে অবশ্য ইতিপূর্বেই নাটকীয়-গীতিময় সংলাপের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। সূর্য মঙ্গলের মধ্যে গৌরী ও সূর্যাই-এর বাদানুবাদ এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। দেবতাদের মহিমা-কীর্তনের উদ্দেশ্যেই গ্রাম্য কবিগণ এই সকল মঙ্গল কাব্য রচনা করলেও তা'তে তৎকালীন, সমাজ-চিত্র এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ইতিহাস প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্বময় জীবনের মধ্যেই নাটকীয় উপাদান বিরাজমান। তাই মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে যথেষ্ট নাট্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়।

শিবায়ন, ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতির মধ্যে নাটকীয় চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। 'শিবায়নে' শিব দেবতা ন'ন,—সামান্য গ্রাম্যকৃষক, ময়না-মতীর মধ্যে ঘোষিত হয়েছে মানবের জয়গান।

যাত্রার উদ্ভবের প্রাক্কালে মঙ্গল কাব্য, পালাগান প্রভৃতি গীত হ'ত এবং এই সকল গীতিময় প্রকাশের পাঁচটি অঙ্গ থাকায় এগুলিকে বলা হ'ত পাঁচালি গান। কালে পাঁচালির পাঁচটি অঙ্গ অর্থাৎ পা-চালী, ভাব কালি, নাচাড়ি, বৈঠকী এবং দাঁড়াকবি—এক ব্যক্তির পক্ষে উপস্থাপিত করা অসুবিধাজনক বলে বোধ হ'তে লাগল এবং তা'র ফলে একাধিক ব্যক্তির উপর পাঁচালি গান পরিবেশনের ভার দেওয়া হ'ল। এইরূপে একজন মূল গায়কের পরিবর্তে কয়েকজন গায়কের সমাবেশে পালাগান সমূহ হ'তে একটি শাখা বহির্গত হ'ল। তা'ই মানুষের সুখ-দুঃখ, হাস্য-কৌতুক সংলাপ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হ'য়ে পরবর্তী কালে 'যাত্রা'র রূপ ধারণ করল। পবিত্র যাত্রার মধ্যে ক্রমশঃ জনসাধারণের রুচি ও কামনা অনুযায়ী রঙ্, তামাসা, ভাঁড়ের নাচ প্রভৃতি সন্নিবেশিত ক'রে এর মধ্যে বৈচিত্র্য ও জনপ্রিয়তা আনয়নের চেষ্টা চলতে থাকে। উৎসারিত বাংলার নাট্যধারা এইভাবে আদি যাত্রার মধ্য দিয়ে সম্প্রসারণের পথে ধাবিত হ'ল।

সম্প্রসারণ

আদি যাত্রার ইতিহাসে কোন দেবলীলা প্রকাশক কাহিনীর সাংগীতিক উপস্থাপন মাত্রই পরিদৃষ্ট হয়; চরিত্রানুগ সাজসজ্জা ক'রে কাহিনী মধ্যস্থ প্রতিটি চরিত্রকে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টা এই সকল যাত্রার মধ্যে লক্ষিত হয় না। যথোপযুক্ত সাজসজ্জা করে চরিত্রাভিনয়ের প্রচেষ্টা আমরা সর্বপ্রথম দেখতে পাই বাঙ্গালীর একনিষ্ঠ প্রেম-সাধন তরুর অমৃতময় ফল স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণযাত্রার অকল্পিত পূর্ব প্রয়াসে। মহাপ্রভু ছিলেন সংস্কৃত রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের রীতিনীতি নির্দেশাদির সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তাই নিরবচ্ছিন্ন পালাগান রূপ যাত্রার গতানুগতিকতার মধ্যে তাঁকে আমরা নানারূপ পরিবর্তন সাধন করতে দেখি। রঙ্ মেখে, ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে চরিত্রানুযায়ী সাজপোষাক পরিধান ক'রে কোনও বিষয়বস্তুর বাস্তবানুগ উপস্থাপনের পরিকল্পনা বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে সেই প্রথম। বঙ্গীয় নাট্যকলার ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য-দেবই আদিগুরু। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদবৃন্দই সুশিক্ষিত ও উচ্চবর্ণের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম অভিনয়ের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। ইতিপূর্বে নিম্নশ্রেণী লোকদের দ্বারাই পালাগান, যাত্রা প্রভৃতি অভিনীত হ'ত। চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের নব সংস্কার বিশিষ্ট অভিনব যাত্রাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন সমালোচককে বলতে শোনা যায় যে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তির পূর্বে বাংলাদেশ প্লাবিত হয়েছিল শাক্ত ধর্মের বন্যাস্রোতে এবং সেই শাক্ত প্রভাবের যুগে শক্তি যাত্রার প্রচলন ছিল বলে তাঁরা দাবি করেন।*

প্রাক্-চৈতন্যযুগে শাক্ত ধর্মের, গৌরবের যুগে কানা হরিদত্তের মনসা মঙ্গল, দ্বিজ জনার্দন, মাধবাচার্য প্রভৃতির চণ্ডীমঙ্গল, কৃষ্ণরাম দাস, বলরাম

* Indian Stage—Hemendra Nath Dasgupta.

চক্রবর্তী প্রভৃতির কালিকামঙ্গল ইত্যাদি শক্তির সাহায্যে বর্ণনমূলক মঙ্গলকাব্য সমূহ রচিত হয়েছিল।

সুতরাং এই সকল মঙ্গল কাব্য হ'তে শক্তি যাত্রার উদ্ভব খুব অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া শক্তি যাত্রার অস্তিত্ব থাকলেও তার রূপও যে আদি যাত্রার স্থায় পালাগানের নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এছাড়া রামযাত্রা ছিল বলে চৈতন্যভাগবতে আমরা প্রমাণ পাই। বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমরা মহাপ্রভুর উক্তি থেকে তাঁর অভিনয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি।

বৃন্দাবন দাস বলেছেন :—

"একদিন প্রভু বলিলেন—সভাস্থানে।
আজি নৃত্য করি বাঙ্ অঙ্কের বিধানে॥
সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু, কাচ সজ্জকর গিয়া॥
শঙ্খ, কাঁচুলি, পাট শাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্যযোগ করি সজ্জ কর সভাকার॥
গদাধর কাচিবেন—রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ী—সখী সুপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস—জাগাইতে ভার॥
শ্রীবাস নারদ-কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।"

আবার অন্যত্র তিনি প্রভু হরিদাসের সাজসজ্জার বর্ণনা দেন—

"প্রথমে প্রবিষ্ট হইলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ ধরি বদন-বিলাস॥
মহা পাগ শোভে শিরে, ধটী পরিধান।
দণ্ড হস্তে সভারে করায় সাবধান॥"

নারদবেশী শ্রীবাসকে আবার আমরা দেখতে পাই—

"মহা দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্বগায়।
বীণা কান্ধে, কুশ হস্তে চারিদিকে চায়॥

*   *   *   *   *

অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত—।
সে—ই রূপ, সে—ই বাক্য, সে—ই সে চরিত॥

শ্রীচৈতন্যের গোপিকাবেশে শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্যের গৃহে নৃত্যগীতাভিনয়ের সম্পর্কে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত হয়েছে—

"চন্দ্রশেখরের বাড়ী নাচিয়া গাহিয়া।
ঘরেতে আইলা প্রভু আনন্দিত হইয়া॥" (চৈঃ মধ্যখণ্ড)

কৃষ্ণলীলাভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শ্রীচৈতন্যের পারিষদবর্গ অন্যান্য বৈষ্ণবগণের তৎকালিকভাব ও বেশভূষাদি এবং স্বয়ং মহাপ্রভুর সাজসজ্জার প্রসঙ্গে লোচনদাস অন্যত্র বলেছেন—

"সকল বৈষ্ণব মিলি, প্রেমের পশার ডালি,
পশারিল অপরূপ হাটে॥"

*   *   *   *   *

"এখানে কহিব শুন, সাবধানে সবজন
গোপিকা-আবেশে-বশ প্রভু।
হৃদয়ে কাঁচলি ধরে, শঙ্খ কঙ্কণ কার,
দুটি আঁখি রসে ডুবুডুবু॥
পট্ট সে বসন পরে, নুপুর চরণে ধরে,
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি।
রূপে ত্রিজগৎ মোহে, উপমা দিবার কাঁহে
গোপী বেশে ঠাকুর আপনি॥"

শ্রীচৈতন্যের গোপীবেশ

চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে আদিলীলা অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের রুক্মিণী বেশে কৃষ্ণলীলাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

"তবে আচার্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণী স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলাদেশে যেমন বৈষ্ণব ধর্মের যুগান্তকারী বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, সেরূপ বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি দিকে তাঁর বৈপ্লবিক শঙ্খধ্বনি নিনাদিত হয়েছিল।

রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত-তনু শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবে, বিভিন্ন স্থানে, কৃষ্ণ-লীলাভিনয় দেখে আপামর সাধারণে বিমোহিত হ'ত। চৈতন্যদেবের প্রভাবে প্রাচীন যাত্রার মধ্যে বহুতর পরিবর্তন সংসাধিত হ'ল।

যাত্রাভিনয় কালে পূর্বের ন্যায় কোন প্রকার মুখোস ব্যবহার না ক'রে চরিত্রানুযায়ী সাজসজ্জা (Make-up) করার প্রচলন তাঁর সময় হতেই শুরু হয়, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাক-চৈতন্যযুগের যাত্রায় কোনরূপ অঙ্ক বিভাগ থাকত না। তখন মঙ্গল কাব্যের মধ্য দিয়ে আমরা সম্পূর্ণাঙ্গ কাহিনী পেয়েছি, তাই গীতের মাধ্যমে বর্ণনা ক'রে যাওয়া হত একাদিক্রমে, মধ্যে হয়ত সাময়িক বিরতি থাকত, কিন্তু সুনির্দিষ্ট অঙ্ক বিভাগের কল্পনা তখন অশিক্ষিত গ্রাম্য যাত্রাওয়ালাদের নিকট স্বপ্নেরও অতীত। প্রেমের অবতার মহাপ্রভু অভিনয়ের মধ্যে তাঁর প্রাণের সমস্ত আবেগ,—আকুতি, অন্তর্বেদনা সমস্ত কিছু উজাড় করে দিতেন,—নিঃশেষে ঢেলে দিতেন তাঁর প্রাণের গভীরতম দরদ ও রসময়তা,—তাঁর অভিনীত চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তোলবার জন্য। অভিনেয় চরিত্রটিকে তিনি অভিনয় করতেন না, তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিতেন (identification), তাই তাঁর অভিনয়ের মধ্যে আমরা ভাবরসাশ্রিত অপূর্ব অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করি। তখন হ'তেই রসঘন ভাব অভিনয়ের প্রথম সূত্রপাত বাংলাদেশে পূর্ব প্রচলিত যাত্রার নিম্নস্তরের রঙ্গরস, ভাঁড়ামী, সংএর আধিক্য তাঁর প্রভাবান্বিত যাত্রাকে স্পর্শ করতেও পারল না। এ ছাড়া শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব প্রেমময় অভিনয় যখন সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শিত হত, তখন সেই অভিনয় অবশ্যই বাংলা ভাষার মাধ্যমেই জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হত ; নতুবা অন্তর দিয়ে, গভীর আগ্রহের সঙ্গে অভিনয়ের রস আস্বাদন করা সাধারণের

পক্ষে সম্ভবপর হত না। ঐ সময় হ'তেই বাস্তবিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও ঐশ্বর্যের যুগ এবং বাংলা ভাষায় প্রকৃত নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রথম অরুণোদয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে এবং প্রেরণায় এই সময় কয়েকজন ভক্ত নাট্যকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ-মাধব' ও 'ললিত-মাধব', পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়', রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভ', গোবিন্দ দাস কবিরাজের 'সংগীত-মাধব', কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক সেদিন বাঙ্গালীর অফুরন্ত নাট্যরসের পরিচয় বহন করে এনেছিল। একথা চিন্তা করলে আশ্চর্য লাগে যে. মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ তদানীন্তন রীতি অনুসারে নাটক রচনা করেছিলেন সংস্কৃতে, কিন্তু মহাপ্রভু অভিনয় করেছিলেন বাংলা ভাষায়। তা'সত্ত্বেও সে সময় কেন যে বাংলা ভাষায় নাটক রচনা হ'ল না সেটা ভাববার বিষয়।

চৈতন্য-যুগে ও চৈতন্যোত্তর যুগে কৃষ্ণযাত্রা সমূহ যথেষ্ট জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে এবং রাজপোষকতাবিহীন মুসলমান শাসনকালে নাটকের অভাবকে বহুলাংশে মোচন করে। একদিক দিয়ে যদিও গান ও ভক্তিরসের আধিক্য যাত্রার মধ্যে নাট্যরসকে দানা বাঁধতে দেয় নি, কিন্তু তথাপি এই যাত্রাই পরবর্তী বাংলা নাটকের সৃষ্টি ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় আলোকবর্তিকা স্বরূপ। অনেকের মতে বাংলা নাটকের উৎপত্তি প্রাচীন যাত্রা থেকে হয় নি, হয়েছে সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের প্রভাবে। একথা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়।

সংস্কৃত নাটকের প্রভাব একদা বাংলা নাটকে বিদ্যমান ছিল এবং আধুনিক বাংলা নাটকও যে ইংরেজী প্রভাবান্বিত, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সে প্রভাব ছিল আঙ্গিকে,—উপস্থাপনার পদ্ধতিতে। তার প্রাণসত্তা আলোচ্যকাল পর্যন্ত সেই প্রাচীন যাত্রার গীতিময় ভাবঘন আদর্শে পরিপূর্ণ। প্রাচীনকালে যাত্রার মধ্যেই বাঙ্গালীর মানস প্রকৃতি তৃপ্তির সঙ্গে অবগাহন করত এবং আনন্দ আস্বাদন করে ধন্য হত। আজও তাই পৌরাণিক নাটকাদির গীতি বহুলতার মধ্যে বাঙ্গালীর প্রাণের সামগ্রী যাত্রার-প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

মহাপ্রভুর আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের অনেকে বংশানুক্রমে এবং উচ্চভাব ধারা বিশিষ্ট পেশাদার যাত্রাওয়ালাদের মধ্যেও অধিকাংশই তখন সর্ব সমক্ষে উপস্থাপিত করতেন প্রেম-বিগলিত কৃষ্ণলীলার ভাবাভিনয়; সাধারণের চাহিদানুযায়ী যাত্রায় অনুপ্রবিষ্ট গাজনের সং প্রভৃতি এই সকল যাত্রার একটি বিশেষ অঙ্গ হ'য়ে উঠতে পারেনি। মধ্যযুগের যাত্রার নব সংস্কারের অগ্রদূত রূপে শ্রীচৈতন্য সকল নাট্যরসিকের অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন; তাই চৈতন্য বিষয়ক ভাবঘন যাত্রাও তখন অনুষ্ঠিত হ'ত। এমন কি যে কোন যাত্রার পূর্বেই গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদাবলী বা গৌর-চন্দ্রিকা গীত হত। কিন্তু নিম্নস্তরের প্রতিভাসম্পন্ন যাত্রাদলের অধিকারিগণ এই ভাবাভিনয়ের মহান আদর্শকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি, তাই তাদের অভিনীত যাত্রার মধ্যে নিকৃষ্ট কদর্য রঙ্, তামাসা, শালীনতাহীন অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি অনেকটা স্থান অধিকার করে থাকতো। এই সকল যাত্রার মধ্যে সত্যকার অভিনয়-কলা বলতে কিছুই ছিল না, কারণ যে অভিনয়ের মধ্যে সাত্বিকভাব নেই অভিনয়পদবাচ্য হবার যোগ্যতাও তার থাকে না। এই প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের একস্থানে ভরতের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য।

সত্বাতিরিক্তোঽভিনয়ো জ্যেষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে।
সমসত্বো ভবেন্মধ্যঃ সত্বহীনোঽধমঃ স্মৃতঃ ॥*

এইভাবে তদানীন্তন যাত্রার মধ্যে জোয়ারভাঁটার তরঙ্গ-বৈচিত্র্য,—কখনও উত্থান, কখনও পতন,—কখনও প্রগতি, কখনও বা পশ্চাৎগতি লক্ষিত হ'ত।

বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবন এই সময় এক নবতম পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। কলকাতায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা, এখানে রাজধানী স্থাপন এবং এস্থানের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের মধ্য দিয়ে নবাগত পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের তরঙ্গ-ভঙ্গ এ দেশবাসীর রুচি ও রসবোধের ক্ষেত্রে নিয়ে এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

* Baroda Edition, Page 150, Chap. XXII Sloka—2

বিস্তারিত কোন ইতিহাস বলার খুব প্রয়োজন এখানে নেই। একথা সকলেই জানেন, ইংরেজদের জাহাজ একবার দুর্ভিক্ষের সময়ে আলমগীরের শিবিরে খাদ্য সরবরাহ করায় মোগল সম্রাট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট জব চার্ণকের প্রতি ছিলেন বিশেষ অনুকূল ও সুপ্রসন্ন। তাই তাঁকে কলকাতায় কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। হুগলী ও তার পার্শ্ববর্তী দু'একটি অঞ্চলে কুঠি নির্মাণ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হবার পর, ১৬৯০ সালের ২৮শে আগষ্ট চার্ণক সাহেব ভাগীরথীর তীরে ইংলণ্ডের পতাকা প্রোথিত করে কলকাতা মহানগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্তমানের প্রাসাদময়ী নগরী তখন সমাজ-সংসারহীন গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলকাতার জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমির অস্বাস্থ্যকর, ফরাসী, পর্তুগীজ, মগ-মারাঠা প্রভৃতি দস্যু তস্করের দৌরাত্ম্যে পূর্ণ তিনটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এই উর্বর ভূখণ্ডে চির বসন্ত বিরাজমান থাকলেও এ স্থান তখন অন্ধকারময় কারাগার, প্রেতভূমি ও ব্যাধি নিকেতনরূপে পরিগণিত হত। বর্তমান কলকাতার সূত্রপাত ১৭৫৭ অব্দে। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত হলেন মীরজাফর। ১৭৫৬-৫৭ সালে কলকাতা লুণ্ঠনে বণিকদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার পরিপূরণার্থ সন্ধির নিয়মানুসারে মীরজাফর প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। এই সময় হ'তেই কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি। যে জলাময় স্থানে এক সময় ছিল গহন অরণ্য সেই স্থান বর্তমানে রাজপথ শোভিত, রম্য সৌধমালায় সুসজ্জিত, প্রতিষ্ঠিত সামাজিক পরিবেশে আদর্শ নগরী।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক একটি ঘোষণা-পত্র প্রচার ক'রে জাতিনির্বিশেষে সকলকেই এখানে এসে বসবাস করার জন্য আহ্বান জানান এবং সেজন্য কর অব্যাহতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে সুযোগসুবিধে দান করার জন্য তাঁর হস্ত প্রসারিত হয়। কিন্তু চার্ণক এই মৃত্তিকায় পদার্পণ করার বহু পূর্ব হ'তেই আর্মানীরা এখানে ব্যবসাবাণিজ্য চালাত এবং সে সময়ে সুতানুটি পণ্য দ্রব্যের একটি প্রধান বাজার বলে বিখ্যাত ছিল। যাই হোক অনেকেই চার্ণকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং এই উপনিবেশের উত্তর প্রান্তে এসে সমবেত হয়েছিলেন। জব চার্ণক এবং মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে এবং অন্যান্য জাতীয় লোকেদের কলকাতায় বসাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

১৭৪২ থেকে ১৭৫২ সালের মধ্যে এই নগরীর পথঘাট, বাসগৃহ প্রভৃতি অতি দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করে। মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর, ঠাকুরগণ ও অন্যান্য প্রাচীন বংশ অরণ্য সমতুল বহু স্থানকে ক'রে তোলেন মনুষ্য বাসোপযোগী।

পূর্বে বাণিজ্যোপলক্ষ্যে কলকাতায় বণিকদের সমাগমই অধিক হত। বণিকেরা দস্যু তস্করের ভয়ে দলবদ্ধভাবে আড়ং প্রভৃতিতে অল্প কয়েকদিনের জন্য অবস্থান ক'রে পুনরায় স্ব স্ব আবাস অভিমুখে প্রস্থান করত। স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে এখানে বসবাস করা তখন মোটেই নিরাপদ ছিল না। সেজন্য এখানে সে সময় গড়ে উঠতে পারেনি কোন সুসংবদ্ধ সামাজিক পরিবেশ বা বসতি।

রাঢ়দেশে তখন বর্গীর আক্রমণ, ইংরাজ-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ, আলীবর্দীর পর থেকে ঘন ঘন রাজ-পরিবর্তন, পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৭০ এর মন্বন্তর প্রভৃতির দেশব্যাপী অরাজকতার জন্য বাংলার উৎসব, যাত্রা প্রভৃতির দীপ নির্বাপিত হ'ল। থেমে গেল তার সংস্কৃতির আনন্দলহরী। তারপর ১৭৭৪ সালে যখন কলকাতায় ইংরেজদের রাজধানী স্থাপিত হ'ল, লোকের মনে ভরসা ফিরে এল এবং আবার আনন্দ উৎসবও ফিরে এল সেই নিরাপদ নির্বিঘ্ন পরিস্থিতির মধ্যে। অতঃপর কলকাতায় ক্রমশঃ শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ পরিবারবর্গ নিয়ে এসে এখানে বসতি-স্থাপনে উদ্যোগী হ'ল। মহিলাদের আগমন ঘটায় ক্রমে ক্রমে এখানে সামাজিক নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের প্রচলন হয় এবং একটি প্রকৃত সমাজ গড়ে ওঠার সুযোগ লাভ করে। পূজাপার্বণ, ব্রতকথা, পাঁচালী, পালাগান, কীর্তন প্রভৃতি কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে ক্রমশঃ নূতন ক'রে সাংস্কৃতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। তৎকালীন কলকাতায় এবং পল্লী অঞ্চলে যাত্রাও বেশ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় যাত্রার যথেষ্ট সমাদর। বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বীরভূম, যশোর, নদীয়া জেলার স্থানে স্থানে এই সময় কয়েকজন শক্তিশালী যাত্রাওলার আবির্ভাব ঘটেছে; কোন একটি পালা নিয়ে রচিত

হত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটক। এর অধিকাংশই পয়ারে রচিত। গদ্য খুবই কম। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিনয়কালে অভিনেতাগণকে কথ্য ভাষাতে কিছু কিছু কথাবার্তা বলতে দেখা যেত। কিন্তু সেগুলো অভিনেতাদের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব থেকেই উৎপন্ন হত; সংলাপ আকারে কোনও নাটকে লিখিত থাকত না, কারণ সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলা গদ্য তখনও জন্মলাভ করেনি।

শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা বা কালীয় দমনই এই সময় একাধিপত্য করছিল বাঙ্গালীর মনোজগতে। শ্রীকৃষ্ণযাত্রার প্রাচীন অধিকারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পরমানন্দ অধিকারী যাত্রাভিনয় করেছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। অনেকের মতে শিশুরামই ছিলেন যাত্রার পরিণত রূপসৃষ্টির জন্য গৌরব মুকুটের অধিকারী।*

এই সময়ের খ্যাতিমান যাত্রাওলাদের মধ্যে শ্রীদাম, সুবল অধিকারী, লোচন অধিকারী, বদন অধিকারী, প্রেমচাঁদ অধিকারী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল যাত্রা ক্রমশঃ পরিবর্তিত আকার ধারণ ক'রে নাট্য উপাদানে মণ্ডিত হতে থাকে। কালীয় দমনের ক্রমানুগত অভিনয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ বহন করে আনে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

এদেশীয় শিক্ষিত লোকেরা ক্রিয়াকর্মে তাদের ঠাকুর দালানের উঠানে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করতেন। ধনী জমিদারদের গৃহেও মাঝে মাঝে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর যাত্রার দলকে আমন্ত্রণ জানান হত এবং তাদের হৃদয়গ্রাহী অভিনয় সকলকে তৃপ্তিদান করত। বারোয়ারীতেও কখনও কখনও এই সকল দলের যাত্রা অনুষ্ঠিত হত। দূরবর্তী স্থান থেকেও আগ্রহী বহুলোক এদের অভিনয় দেখবার জন্য অভিনয় স্থলে সমবেত হত।

কিন্তু নিম্নশ্রেণীর রুচিবিশিষ্ট যাত্রায় প্রাচীন রীতিই প্রচলিত ছিল। গঞ্জে গঞ্জে, হাটে বাজারে, মেলায়, বারোয়ারী তলায়, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে এই সকল যাত্রার সমধিক প্রচলন ছিল। ভাল অভিনয়ের দ্বারাও যদি যাত্রা

* "A resident of Kenduli village named Shishuram Adhikery, a Brahmin by cast, secured the glorious perfection of the Jatra."

—The Indian Stage Vol. I, Page—115

না জমে ওঠে তখন সাধারণ দর্শকের কাছে জমাবার জন্য যাত্রাওলারা সং দিত। কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী, অশ্লীল রঙ্গরস, ভাঁড়ের নাচ প্রভৃতি যাত্রার মধ্যে অনেকটা স্থান অধিকার ক'রে থাকত। এটা শালীনতাবিহীন হ'লেও ততটা দূষ্য ছিল না। কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে গোপনে অর্থ গ্রহণ করে যাত্রার দল যখন নিম্নস্তরের রহস্যালাপের মধ্য দিয়ে, কুশ্রী, অশ্লীলতাপূর্ণ নৃত্যভঙ্গীর মাধ্যমে বিপক্ষ ব্যক্তি বা দলকে হেয় করার জন্য কুৎসা রটনায় ব্রতী হত, তখন তা'রা অত্যন্ত ঘৃণ্য হ'য় উঠত। শিক্ষিত লোকেরা এই কুরুচিপূর্ণ, কুৎসিৎ ভাঁড়ামি ও কালুয়া ভুলুয়া সং এর জন্যই এই শ্রেণীর কদর্য যাত্রাভিনয়কে আন্তরিকভাবে বর্জন করেছিলেন।

এই সময় প্রেমচাঁদ অধিকারীর মহীরাবণ পালা, বাঁকুড়ার আনন্দ ও জয়চন্দ্র অধিকারীর রাসযাত্রা, ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভের চণ্ডীযাত্রা প্রভৃতি গতানুগতিক বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করে বহন ক'রে এনেছিল বৈচিত্র্যময় নূতনত্বের আস্বাদ।

সম্পূর্ণ বিপরীত দুই খাতে প্রবাহিত এই দুই শ্রেণীর যাত্রার বহুল প্রচলনের সময়েই বাংলার নাট্য-আন্দোলনে নব যুগের সূচনা হ'ল। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হ'ল "ডিসগাইস্" নামক একটি ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ "ছদ্মবেশ"। লেবেডেফ নামক একজন রুশীয় ভাগ্যান্বেষী, বাঙ্গালী গোলকনাথ দাসের সহায়তায় ২৫নং ডোমটুলিতে এই অভিনয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। এই নব প্রচেষ্টা এদেশে একান্ত অভাবনীয়। মঞ্চ নির্মাণ করে, বাঙ্গালী পদ্ধতিতে তাকে সুসজ্জিত করে নতুন ধরণের সামাজিক লঘু প্রকৃতির বিষয়বস্তুকে বাঙ্গালী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ভাইসরয় স্যার জন শোরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশিষ্ট কর্মচারী-বৃন্দ ও এদেশীয় সম্ভ্রান্ত দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা সে সময়ে কল্পনাতীত এবং দুঃসাহসিক অভিযানের সমতুল্য। অনেকের ধারণা যে (সমালোচককে বলতে শোনা যায়) লেবেডেফের অকস্মাৎ ইংলণ্ড প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই অভিনব নাট্য প্রচেষ্টারও অবসান ঘটল; কারণ এদেশের মানুষের প্রবণতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না,

তাই বাংলা নাট্য জগতে এর কোনরূপ স্থায়ী প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না। বাংলা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসের সূচনার প্রাক্কালে এটিকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত অন্য কিছু বলে স্বীকার করে নিতে তাঁরা রাজী ন'ন্।

কিন্তু প্রথম মঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয়, নটনটীর একত্র সমাবেশ, পৌরাণিক দেবলীলা বিষয়ক যাত্রার যুগে সামাজিক ও হাল্কা ধরণের বিষয়বস্তু গ্রহণ, আঙ্গিকের মধ্যে বৈচিত্র্য, বাঙ্গালী রীতিতে মঞ্চ সজ্জা করা, এবং সর্বোপরি সেই অভিনয়ের দ্বারা সম্ভ্রান্ত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করতে পারার পরও এই অচিন্ত্যনীয় নাট্য-প্রচেষ্টার কোন প্রভাবই পরবর্তী যুগে অনুভূত হ'ল না, একথা চিন্তা করলে বিস্মিত না হ'য়ে পারা যায় না। এমন একটি অভাবনীয়, অকল্পিত পূর্ব চমকপ্রদ ব্যাপার কালের সমুদ্রতীরে প্রভাবের কোন স্বাক্ষরই রেখে যেতে পারেনি, একথা কোন যুক্তিবাদী মন মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। পরবর্তী নাট্যপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে লেবেডেফের প্রভাব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হওয়া এবং এবিষয়ে আলোকসম্পাতের চেষ্টা করা নাট্যামোদী মাত্রেরই অবশ্য কাম্য। তথ্যাভিজ্ঞ মহলে নাকি শোনা যায় লেবেডেফের প্রভাব সম্পর্কে তেমন কোন Record বা সূত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু তা যদি সত্যই হয়, তাহ'লেও সেজন্তে কি এবিষয়ে আমাদের গবেষণা স্তব্ধ হ'য়ে যাবে? তা কখনই হ'তে পারে না? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমান রীতি বা Hypothesis এর সাহায্যে সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং এর দ্বারা অনেক সময় লক্ষ্যে পৌছান যায়। মধ্য এশিয়ার বহু স্থানের Tower-Temple (Juggernant)এর ভগ্নাবশেষ দেখে তার আসল রূপ কি ছিল, স্থপতিগণ আজ তা' অনুমান করবার চেষ্টা করেন এবং তার উপর কল্পিত নতুন স্তম্ভ, খিলান প্রভৃতি চিত্রিত করে তাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করতেও উদ্যোগী হন—সেখানে অনুমানই তাঁদের উদ্যোগের ভিত্তিস্থল। সেই রকম লেবেডেফের পরবর্তী যুগে তাঁর প্রথম বাংলা নাটকাভিনয়ের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল সে বিষয়ে হাতের কাছে খুব বেশি তথ্য বা উপকরণ না পেলেও Hypothesis রচনা করতে দোষ কি? তার

দ্বারা সত্যের সন্ধান পাওয়া হয়ত অসম্ভব হবে না। লেবেডেফের সম্বন্ধে তবু কিছুটা আমরা জানতে পারি, তিনি ছিলেন একজন রুষীয় অভিযাত্রী। তিনি একসময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন, গোলকনাথ দাসের সহায়তায় দু'টি ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এবং মঞ্চে 'ছদ্মবেশ' নামক নাটকটি তাঁর চেষ্টায় দু'বার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অতঃপর তিনি অকস্মাৎ ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন এবং ১৮০১ সালে A Grammar of the pure and mixed East Indian Dialects নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

কিন্তু গোলক দাস লোকটি কে ছিলেন? তাঁর পরিচয় কি? তিনি কোথাকার লোক? লেবেডেফ চলে যাওয়ার পর তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনই বা কোন্ পথে পরিচালিত হল? এসকল প্রশ্নের উত্তর কোথায়?—উত্তর কিছুই নেই। কারণ তাঁর সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেবলমাত্র লেবেডেফের Grammarএর Introduction থেকে আমরা জানতে পারি গোলক দাস ছিলেন লেবেডেফের ভাষা শিক্ষক এবং তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির তিনি যথেষ্ট প্রশংসাও করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, এরূপ একজন উচ্চস্তরের শিক্ষক ব্যতীত তিনি কখনই তাঁর অনুবাদকে এত মনোজ্ঞ করে তুলতে পারতেন না। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"I presume I do not much flatter myself, when I affirm that by this translation the spirit of both the comic and serious scenes were much hightened and which would in vain be imitated by any European, who did not possess the advantage of such an instructor as I had the extraordinary good fortune to procure."

'Disguise'এর অনুবাদ শেষ হলে আমন্ত্রিত কতিপয় পণ্ডিতের সম্মুখে পঠিত হল এবং তাঁদের সম্বর্ধনাও লাভ করল এই অনুবাদটি। নাটকটি তর্জমা করার সময়ই গোলক দাস এই নাটকের অন্তর্নিহিত অভিনব নাট্যরস আস্বাদন করেছিলেন এবং নাটকটির ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্র সমাবেশ, সংলাপ, আঙ্গিক প্রভৃতি তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট

করেছিল। তাই তিনি লেবেডেফকে বলেছিলেন যে, লেবেডেফ যদি এই নাটকটিকে অভিনয় করতে চান তাহলে তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহের ভার গ্রহণ করবেন। লেবেডেফের কথা থেকেও জানা যায় "Golaknath Dash, my linguist made me a proposal, that if I choose to present this play publicly, he would engage to supply me with actors of both sexes from among the natives." এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, লেবেডেফ শুধু নাটকটির তর্জমা করেছিলেন, কিন্তু নাটকটি মঞ্চস্থ করার উপযোগী এবং একে যে মঞ্চস্থ করা যেতে পারে এই পরিকল্পনা সর্বপ্রথম দেখা দেয় গোলকনাথের মনে, নতুবা এই নাটকটির অভিনয় হয়ত হ'ত না। অতএব লেবেডেফের অপেক্ষা গোলকনাথের কৃতিত্ব কম ছিল না। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, তিনি নাট্যরসিক ছিলেন। নতুবা এই নাটকের অভিনয়ের সম্ভাব্যতার কথা তাঁর মনেই বা প্রথম উদয় হল কিরূপে? তিনিই অতঃপর লেবেডেফের সঙ্গে আলোচনানুযায়ী অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করেন।

উক্ত অভিনয়ানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রে গোলক দাসের অবদানও বড় কম নয়। এ থেকে এরূপ অনুমান করাও খুব অসঙ্গত হবে না যে, গোলক দাস একজন ভাল অভিনেতা, অভিনয় পরিচালক অথবা যাত্রাদলের সহিত সংশ্লিষ্ট অভিনয় বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, নতুবা তাঁর পক্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হত না এবং তিনি সাহস করে কখনও বলতে পারতেন না যে, "অভিনেতা-অভিনেত্রী এনে দেব যদি লেবেডেফ অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে ইচ্ছা করেন"। অভিনেতা ও অভিনেত্রিগণের অধিকাংশই যে ইংরাজী জানতেন না একথা ধরে নেওয়া যায়। সুতরাং অভিনয় শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারেও অবশ্যই গোলকনাথ দাসকে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। বাংলা দেশে প্রথম বাংলা নাটকের মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে যিনি প্রথম পরিকল্পনা রচয়িতা—আদিগুরু, যাঁর অন্তরে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল এই নবতম প্রচেষ্টার বীজমন্ত্র—সেই গোলকনাথ দাস আজ বাংলার নাট্যরস-

পিপাসুদের কাছে অবহেলিত, অবজ্ঞাত—একথা চিন্তা করলেও সত্যই দুঃখ হয়।

যাঁর প্রস্তরমূর্তি আজ উল্লেখযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যাঁকে যথোচিত মর্যাদায় ভূষিত করা নাট্যমোদীমাত্রেরই কর্তব্য—তাঁর সম্বন্ধে কোনও বিস্তৃত ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস আমাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র দেখা যায় নি এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। ভাষা-শিক্ষক হিসাবে যাঁর সাহায্য না পেলে লেবেডেফের পক্ষে অনুবাদ-কার্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হত না, যাঁর চেষ্টায় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাট্যশিক্ষা সুন্দর হয়েছিল, যাঁর নাট্যানুরাগ লেবেডেফকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং যাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতায় উক্ত নাট্যাভিনয় প্রশংসাজনকরূপে সাফল্যলাভে সমর্থ হয়েছিল,—লেবেডেফের ইংলণ্ড প্রস্থানের পর তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও নাট্যক্ষুধার পরিসমাপ্তি ঘটল বলে বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই সায় দেয় না। গোলক দাসের ন্যায় বিস্ময়কর প্রতিভার পরিণতি কি হ'ল এ বিষয়ে তাঁর জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায়ের ইতিহাস সংগ্রহ করার জন্য নাট্যসমালোচকদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। গোলক দাস কর্তৃক সংগৃহীত এবং উক্ত অভিনয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভাগ্যও লেবেডেফের প্রস্থানের পর কোন্ পথ গ্রহণ করল এবিষয়ে চিন্তা করারও যথেষ্ট অবকাশ আছে। তা'রা কি সকলে ক্ষণিক বুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত হ'য়ে পুনরায় বিলীয়মান হয়ে গেল জনসমুদ্রের অন্তরালে,—না সেই নব নাট্যমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে অধিকতর উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ভবিষ্যৎ নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেছিল? লেবেডেফের নাট্যাভিনয়ের অংশগ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সকলেই যে নাট্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ, একেবারে নতুন অভিনয়াকাঙ্ক্ষী মাত্র ছিল—একথা মনে করার পক্ষেও তেমন যুক্তি নেই। পক্ষান্তরে, অভিনয় সংক্রান্ত বিষয়ে অন্ততঃ কিছুটা জ্ঞানসম্পন্ন ছিল বলে তাদেরকে মনে করা খুব অসঙ্গত হবে না। কারণ তিন মাসের মধ্যে ঐরূপ অভিজাত দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে উচ্চাঙ্গের অভিনয় প্রদর্শন করা অভিনয়-অনভিজ্ঞ সম্পূর্ণ নূতন অভিনেতাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। প্রথমে নটনটী নির্বাচন, অভিনয়াংশ বিতরণ, প্রভৃতিতেই-তো বেশ

কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, তিন মাসের মধ্যে মহলা দেবার মত সময় খুব বেশি পাওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ এর মধ্যেই আবার মঞ্চ, দৃশ্যপট, সাজসজ্জা প্রভৃতি নির্মাণ বিষয়েও নাট্যশিক্ষক Lebedeff ও গোলক দাসকে সময় দিতে হয়েছিল, তখনকার দিনে অভিনয় করতে গেলে গান, বক্তৃতা এবং প্রয়োজন হ'লে নৃত্য প্রভৃতিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যথেষ্ট পারদর্শী হতে হ'ত। সুতরাং লেবেডেফের নাটক অভিনয় করার পূর্বে যদি এই সকল নটনটীর কোন-না-কোন যাত্রার দলে অংশ গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা না থাকত তা হ'লে এত অল্পকালের মধ্যে গান, সংলাপ প্রভৃতিতে নিজেদের উপযুক্তরূপে প্রস্তুত ক'রে তুলতে পারত না। পূর্ব হতেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের বহুল প্রচারিত গানগুলি তাদের ভাল করে জানা ছিল এবং মহলার সময় সংক্ষেপের জন্যই যে লেবেডেফ ঐ গানগুলিকে উক্ত নাটকে সন্নিবেশিত করেছিলেন একথা যুক্তিসংগত।

১৭৯৫-এর ৫ই নভেম্বর Calcutta Gazette-এ প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে আমরা দেখতে পাই—"The words of the much admired, Poet Shree Bharat Chandra Roy are set to music." এই বিজ্ঞাপন দেখে অনেকে অনুমান করেন যে, জনসাধারণের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী তাদের মনোরঞ্জনের জন্যই Lebedeff ভারতচন্দ্রের জনপ্রিয় কয়েকটি গান তাঁর 'ছদ্মবেশ' নাটকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ ধারণা নিতান্ত অমূলক। Lebedeff-এর Bengali Theatre-এর প্রবেশ মূল্যের উচ্চহারের বিষয় লক্ষ্য করলে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় যে, উক্ত নাটকাভিনয়ে দর্শকদের মধ্যে সাধারণ স্তরের লোকসংখ্যা কিরূপ ছিল। Calcutta Gezette*-এর অপর একটি বিজ্ঞাপনে পাওয়া যায়—"Tickets to be had at this theatre," Boxes and Pit···S.a. Rs. 8
Gallery, ·········· " " 4

এবং ১৭৯৬-এর ২১শে মার্চ দ্বিতীয় অভিনয়ের প্রাক্কালে Lebedeff একটি ঘোষণা জানিয়েছিলেন—"For the better accomodation of the

* Calcutta Gazette, 26th Nov. 1795

audience, the number of subscribers is limited to two hundred, which is nearly completed, the proposals for the subscription may be had on application to Mr. Lebedeff, by whom subscription at one Gold Mohur—a ticket will be received till the subscription is full."*

এই সকল তথ্য থেকে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্যই তৎকালে অত্যন্ত আদরণীয় ভারতচন্দ্রের সংগীত এই 'ছদ্মবেশ' নামক নাটকে সন্নিবিষ্ট হয় নি, এগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল কিছুটা সুবিধা লাভের জন্য। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এই সকল গানের প্রায় অনেকগুলিই তৈরি করা ছিল, তা'তে ঐগুলো নাটকের জন্য নির্ধারিত করায় সমস্ত নূতন গান তৈরি করা বা শেখানোর দিক দিয়ে অনেকটা সময় সংক্ষেপ করা গিয়েছিল। সুতরাং এই বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে একথা প্রতীয়মান হয় যে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সংগীত অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে অন্ততঃ কিছুটা পূর্ব-অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিল।

তবে যদি এই সকল নটনটীদের একেবারে নবাগত বলেই ধরে নিতে হয় তাহলেও বলা যায় অভিনয়ের নেশা এমনই জিনিস—একবার যদি তা জমে উঠে, তাহ'লে সহজে আর যেতে চায় না। এ-যেন অপদেবতার স্কন্ধারোহণের মত ব্যাপার আর কি, একবার কাঁধে চড়লে আর নামতে চায় না। অনেকেরই এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। Lebedeff বাংলার নাট্য-গগনে ক্ষণকালের জন্য উদিত হয়ে অন্তর্হিত হলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাট্যপ্রীতি চলতি ভাষায় যাকে বলে নাটুকে বাইও শূন্যে মিলিয়ে গেল, একথা তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না।

লেবেডেফ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। Cello বাজাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই কারণে ইংরেজ মহলে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল, তিনি ইংরেজ শাসকের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন, গভর্ণর জেনারেল স্যার জন সোরের কাছ থেকে

* *Calcutta Gazette, March 10, 1796*

অনুমতি পেয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে ঐরূপ আড়ম্বরপূর্ণ, সুসজ্জিত মঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয় পরিবেশন করা সম্ভব হয়েছিল একথা সত্য।

গোলক দাসের ও অন্যান্যের সে সুযোগ বা সংগতি ছিল না, তাই তাঁদের পক্ষে ঐরূপ রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয় করা কল্পনাতীত ছিল, কিন্তু তাঁরা নূতন অভিনয় আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত এ-দেশীয় এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের নিকট থেকে প্রশংসায় ধন্য হয়েছিলেন। এর পরও কি তাঁরা নীরব, নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতে পারেন? তাঁরা অন্ততঃ নূতন কোন যাত্রার দল গঠন করে বা নিজ দলে ফিরে গিয়ে তাকে এই নবীন ভাবধারায় প্রভাবিত করার চেষ্টা কি করেন নি? কিন্তু তাঁদের কোন অভিনয়ের ঘোষণা বা বিবরণ তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায় না। এটা খুবই সম্ভব, কারণ পূর্বেই বলেছি যে, এদের পক্ষে সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করার মত সংগতি ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না।

গোলক দাস বহু পরিশ্রমে যে সকল বাঙ্গালী অভিনেত্রী সংগ্রহ করেছিলেন —তারাই-বা কোথা থেকে এল, পরে কোথায় আবার অদৃশ্য হ'ল তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধানেরও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

তখনকার দিনে অভিনেত্রী বা নটী বলতেই নিম্নস্তরের নারী বা বারবণিতাদেরই বোঝাত। খিদিরপুরের ডক অঞ্চলে এদের অধিকাংশের আবাস ছিল। তা'রা সমাজে ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু গোলক দাস এদের মধ্যে থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ করেন নি। তিনি অভিনেত্রী নির্বাচন করেছিলেন তাদের মধ্য থেকে—যারা তখন আসরে ঝুমুর গান গাইত, নৌকায় সারিগান, জারিগান গাইত এবং কীর্তনাদি নামগানের জীবিকা গ্রহণ করেছিল।

Lebedeff-এর নাটকীয় প্রস্থানের ফলে এদের নব জাগ্রত প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হল, কি পরবর্তী যুগে কোন নূতন পথে বিকশিত হয়ে উঠেছিল—এ প্রশ্ন আজ আমাদের কাছে প্রহেলিকার মতই রহস্যময়।

Lebedeff তাঁর রঙ্গমঞ্চকে বাঙ্গালী রীতিতে সুসজ্জিত করেছিলেন বলে আমরা তাঁর প্রথম বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারি—"Mr.

Lebedeff's New Theatre in the Doomtullah, decorated in the Bengali Style."*

এই বঙ্গীয় পদ্ধতিতে মঞ্চসজ্জা করা হয়েছিল কথাটির অর্থ কি? বিজ্ঞপ্তিটির এই অংশের সম্বন্ধে চিন্তা করার যথেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশে Lebedeff-এর পূর্বে কোন বাংলা রঙ্গমঞ্চ ছিল না, সুতরাং ঐ কথার মধ্যে Lebedeff কি বলতে চেয়েছেন—সেটা আবিষ্কার করাও দুরূহ ব্যাপার। তবে মনে হয়, মঞ্চের বহির্দেশ বঙ্গীয় সংস্কৃতির দ্যোতক আলপনা, মঙ্গল কলস, কলাগাছ প্রভৃতির দ্বারাই সজ্জিত হয়েছিল এবং দৃশ্যপট-সমূহও বাংলাদেশের পরিবেশ অনুযায়ী অঙ্কিত হয়েছিল।

লেবেডেফের প্রথম বাংলা নাটকাভিনয়ের প্রভাব অনেক বিষয়ে আপাত প্রতীয়মান না হলেও কয়েকটি বিষয়ে সমসাময়িক ও পরবর্তী যাত্রার উপর এর প্রভাব বেশ প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করা যায়। প্রাচীন যাত্রায় প্রবেশ বা প্রস্থান বলে কিছু ছিল না। অভিনেতারা দর্শকদের সঙ্গে আসরেই আসন গ্রহণ করত এবং আপন আপন অভিনয় শেষে আসর ত্যাগ না করে পূর্বের স্থানেই পুনরায় উপবিষ্ট হত। লেবেডেফের বেঙ্গলী থিয়েটারে বাংলা নাটক অভিনয় দর্শনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, যে দৃশ্যে যে ক'জন অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় থাকে, তাঁরাই কেবল রঙ্গমঞ্চের উপর উপস্থিত থেকে স্ব স্ব ভূমিকাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন এবং অন্যান্য পাত্রপাত্রীরা তখন থাকেন নেপথ্যে,—লোকচক্ষুর অন্তরালে; যথাকালে তাঁরা মঞ্চে আবির্ভূত হন। মাত্র দু'চার জন অভিনেতার মঞ্চোপরি উপস্থিতিতে অভিনয় যেরূপ জমে উঠত এবং দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তরে যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে দেখা গেল, আসরে এক সাথে সকল অভিনেতার উপস্থিতিতে নাট্যরস তেমনভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারতো না।

বেঙ্গলী থিয়েটারে প্রথম বাংলা নাট্যাভিনয়ের প্রভাব প্রাচীন যাত্রার এই ত্রুটিকে অনেকাংশে মোচন করতে সক্ষম হ'ল; প্রবেশ-প্রস্থানের

* Calcutta Gazette, 5th Nov. 1795

অভিনব রীতি প্রচলিত হল বাংলা যাত্রার মধ্যে। সাজঘর যদি বেশ কিছুটা দূরে থাকত আসর থেকে, তাহ'লে অবশ্য আসরের সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত অভিনেতাদের।

প্রাচীন যাত্রায় কোন অঙ্ক বিভাগ ছিল না। মহাপ্রভুর সময় থেকেই সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ যাত্রায় এই অঙ্ক-বিভাগের সূত্রপাত—একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

লেবেডেফের যুগান্তকারী নাট্য-প্রচেষ্টার পর থেকেই যাত্রার মধ্যে দেখা গেল দৃশ্য-বিভাগ বা গর্ভাঙ্ক সৃষ্টির নবতম প্রয়াস। যাত্রার অভিনেতারা কোন দৃশ্যপটের সহায়তা লাভ করল না বটে, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের ন্যায় তা'রাও তা'দের বিভিন্ন উক্তির মধ্য দিয়ে সংযোগস্থলকে ইঙ্গিতে বর্ণনা করার প্রয়াসী হ'ল।

তৎকালে অভিনয়ের বিষয়বস্তু ছিল ভক্তিমূলক উপাখ্যান—দেবলীলা-বিষয়ক কাহিনী। সেই বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হ'ল। লেবেডেফই প্রথম গতানুগতিক আবহাওয়ার মধ্যে সামাজিক এবং ব্যঙ্গ-মূলক নাটক অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করতে সাহসী হয়েছিলেন। লেবেডেফের নব প্রচেষ্টার প্রভাব পরবর্তী যাত্রা ও নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিস্তারিত হল। তাই ভক্তিরসাত্মক বিষয় ব্যতীত সামাজিক, ব্যঙ্গ বা শ্লেষাত্মক হাল্‌কা বিষয়সমূহও যাত্রা বা নাট্যসৃষ্টির উপাদানরূপে গৃহীত হতে দেখা গেল। Lebedeff-এর 'Disguise'এর প্রভাব 'কলিরাজার যাত্রা' নামক পরবর্তী একটি নাটকের উপর ছায়াপাত করেছিল একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না।

১৮২১ সালে রচিত ও প্রকাশিত এই গ্রন্থটিকে অনেকে প্রথম বাংলা নাটকরূপে উল্লেখ করে থাকেন। এখানে 'যাত্রা' কথাটি প্রচলিত গীতাভিনয় অর্থে ব্যবহৃত হয়নি,—ব্যবহৃত হয়েছে 'গমন' অর্থে, কারণ এই গ্রন্থে কলিরাজাকে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় গমন করতে দেখা যায়। এই কলিরাজার যাত্রাকে শ্লেষাত্মক নাটকরূপে অভিহিত করা যায়। এই নাটকে—বৈষ্ণব, কলিরাজা, রাজার পাত্র, দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ

উপদেশকারী এক ব্যক্তি, চট্টগ্রাম থেকে আগত এক সাহেব ও বিবি এবং তাদের দাসদাসীরাই পাত্রপাত্রী। রঙ্গরস, হাস্যপরিহাস, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন, অঙ্গভঙ্গী-সহ নৃত্য, সংগীত, পারস্পরিক কথোপকথন প্রভৃতি ছিল এই নাটকের অঙ্গীভূত। ১৮২২ সালের ২৬শে জানুয়ারীর 'সমাচার দর্পণে' নূতন যাত্রা প্রসঙ্গে এই নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় সম্পাদিত 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকার ১৮২১ সালের অষ্টম সংখ্যায় 'কলিরাজার যাত্রাটিকে' কমেডী বলে অভিহিত করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি একটি satire. এই নাটকটি মঞ্চে যে অভিনীত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়,—

"A new drama Kalirājār Jātrā is being performed."*

"The following is the order of their appearance on the stage.........."†

যাই হোক, এ সব থেকে অনায়াসে বলা যায় লেবেডেফের অনুসৃত আঙ্গিক ভবিষ্যৎ যাত্রায় ও বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। লেবেডেফের এই প্রভাবের বিবরণ তৎকালীন সংবাদপত্রে কিছুই প্রায় পাওয়া যায় না এ কথা ঠিক, কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, লেবেডেফের নাটকে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেতৃবর্গ এবং গোলক-দাস যদি কোন যাত্রার দল গঠন করে, অথবা কোন যাত্রার দলে গিয়ে অভিনয় করেও থাকেন (অভিনয় করা খুবই সম্ভব) কিংবা সে সময়কার যাত্রাগুলির মধ্যে লেবেডেফ-প্রদর্শিত আঙ্গিক গ্রহণ করে যদি কোন যাত্রাওয়ালা অভিনয়ের ব্যবস্থাও করে থাকেন, তা'হলেও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারে ঢক্কানিনাদ করার ন্যায় অর্থানুকূল্য তাঁদের কারোরই ছিল না, আর তখন বাংলা সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয় নি। তাছাড়া লেবেডেফের 'Disguise' অভিনয়ের সমালোচনাই বা কোন্ সংবাদপত্রে প্রকাশিত

* Calcutta Review, Volume XIII, 1850, page 160

† সংবাদ কৌমুদীতে প্রকাশিত সমালোচনার ইংরাজী অনুবাদ, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের The Indian Stage Vol II এর অষ্টম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

হয়েছিল? স্বীয় অর্থব্যয়ে অভিনয় সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়েছিল লেবেডেফের মত অর্থানুকূল্য এবং রাজানুগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে। Lebedeff-এর নাট্যাভিনয় কিরূপ জনপ্রিয়তা ও জনসম্বর্ধনা লাভ করেছিল তা আমরা জানতে পারি তাঁর বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণাগুলির প্রকৃতি দেখে এবং Lebedeff-এর স্বরচিত grammar-এর ভূমিকা থেকে, সে সময়কার লেখক ও পত্রপত্রিকার সমালোচকদের কাছে নাট্যলোকও বাঙ্গালায় বোধ হয় খুব উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। তাই প্রাচীন কলকাতার প্রায় সমস্ত ইতিহাসের মধ্যেই তৎকালীন নাট্যপ্রয়াস এমন কি বাংলা নাট্য আন্দোলনের যুগস্রষ্টা লেবেডেফের নামেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এছাড়া সমালোচনা প্রকাশ করার মত বাংলা সংবাদপত্রও উনিশ শতকের প্রথম পাদের শেষভাগের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করে নি।

বাংলার নাট্য-অভিযানে পথপ্রদর্শক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ লেবেডেফ এবং গোলক দাসের বিষয় ও লেবেডেফ-উত্তর যুগে রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রথম বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রভাব সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করার জন্য সমালোচকগণ ও তত্ত্বানুসন্ধানী ছাত্রগণের কাছে একান্ত অনুরোধ রইল,—তাঁদের সার্থক পরিশ্রমের দ্বারা এ বিষয়ে বহু অজ্ঞাত সত্যের যবনিকা উত্তোলিত হ'বে এবং বাংলা নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসও ধারাবাহিকতা লাভ ক'রে সম্পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে উঠবে।

নবস্ফীতি

১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজ; বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে বিভিন্ন দিক দিয়ে বহন করে নিয়ে এল নবপ্রভাতের অশ্রুত বার্তা। সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ। প্রফেসর রিচার্ডসনের অপূর্ব অধ্যাপনায় ছাত্রগণের পক্ষে সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের নাট্যরস আস্বাদন করা হয়ে উঠল অনেকাংশে সহজ,—অনায়াস-সাধ্য। প্রচলিত যাত্রার প্রাণবস্তু ছিল ভাবের অভিনয়; সেই ভাব-অভিনয়-প্রীতি বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় আজও মিশে আছে,—তাই এখনও পর্যন্ত যাত্রা-থিয়েটার দেখে প্রাণ ভরে না কাঁদতে পারলে বাঙ্গালী হৃদয় তৃপ্তি পায় না। কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার এবং সেক্‌স্‌পীয়ার চর্চার প্রভাবস্বরূপ তৎকালীন নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট যাত্রার এই ভাবাতিশয্য ক্রমশঃ হয়ে উঠল অপ্রীতিকর,—সহনাতীত। যাত্রা প্রভৃতি এ দেশীয় গতানুগতিক প্রমোদ উপকরণ তাঁদের কাছে তখন রুচিবিগর্হিত, নিকৃষ্ট, ঘৃণ্য বস্তু। এর অন্য কারণ স্বরূপ বলা যায়, যাত্রার অধঃপতিত রূপও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। তখন যাত্রার অভিনেতারা অধিকাংশই ছিল গ্রাম্য অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ। তাদের অশুদ্ধ ও বিকৃত উচ্চারণ, উচ্চশ্রেণীর ভাবাভিনয়ের মাধ্যমে রসানুভূতি সৃষ্টিবিষয়ে ব্যর্থতা, অপকৃষ্ট রঙ্গরস পরিবেশনের জন্য কালুয়া-ভুলুয়ার অকারণ দৌরাত্ম্য প্রভৃতি যাত্রাকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিরাগভাজন করে তুলতে সহায়তা করেছিল। এইভাবে যাত্রাভিনয়ের জনপ্রিয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত হল এবং ক্রমশঃ শ্রীহীন হয়ে পড়ল যাত্রার পূর্ব গৌরবের স্বর্ণ-মুকুট। পাশ্চাত্য আঙ্গিক বিশিষ্ট সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক সমূহের অসাধারণ চরিত্রগুলি অনায়াসে স্থান লাভ করল নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী নাট্যামোদীর বিস্ময়মুগ্ধ রসচিত্তে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাট্যাদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন; ও দেশ বাস্তববাদী, লোকধর্মী,—এ দেশ ভাববাদী, দেবধর্মী। যাত্রায় ঘটনা-পরম্পরা ভেসে আসে ভাবের জোয়ারে—তাতে বাস্তব সম্ভাব্যতার স্পর্শ তেমন অনুভূত হয় না।

সেক্‌স্‌পীয়ারের Macbeth, Richard III বা Antony Cleopatra প্রভৃতি নাটকের ন্যায় ঘটনা-সংস্থাপনা, বা চরিত্র-বিন্যাস এদেশীয় যাত্রা বা নাটকের ক্ষেত্রে সে সময় ধারণাতীত ছিল। অবশ্য আমাদের নাটকের ঘটনা সংস্থাপনাকেও নিন্দনীয় বলা যায় না। অক্রূর-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ, সীতার বনবাস, দশরথ, রাম প্রভৃতির ঘটনা ও চরিত্র-সৃষ্টিকেও কিছুতেই হেয় জ্ঞান করা যায় না; কিন্তু সে সময় এ সকলের চেয়েও মনোরম বলে মনে হয়েছিল পাশ্চাত্য নাটকের অসাধারণ চরিত্র এবং দৃশ্য-সংস্থাপনার অভিনবত্ব। এদেশীয় নাটকে শান্ত, করুণ, আদি এবং বাৎসল্য রসেরই আধিক্য এবং সর্বত্র কোমলতার প্রলেপন। এমন কি Villainy বলতে পাশ্চাত্য নাট্যে যা দেখা যায় সেই ভাব আমাদের যাত্রায় দেখা যায় না। এদেশের নাটকাদির সব কিছুর মধ্যেই কোমল পেলব আর্দ্রতা। এখানে বীর রসের মধ্যেও দেখা যায় আবেগপ্রবণ কোমল হৃদয়ের অভিব্যক্তি। Antonyর বীরত্বের মধ্যে সে জিনিস কোথায়? আবার Antonyর 'আদি' রস দুষ্মন্ত বা পুরূরবার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় না। পাশ্চাত্য নাটকের মধ্যে এদেশীয় প্রমোদের অলভ্য, ভয়ানক বীভৎস রস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকায় ইয়ং বেঙ্গলের কাছে সেগুলি খুব উৎকৃষ্ট বলে মনে হল এবং তাদের হৃদয়ে আনন্দ-লহরী জাগাতে সমর্থ হল। নবতম রসাস্বাদই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে নব পরিচিত ছাত্রগণের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হল ইংরেজী নাটকের সমৃদ্ধ কাব্য সম্পদে। সংস্কৃতের প্রচলন তখন মন্দীভূত। তাই ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, মেকলে, রিচার্ডসন প্রভৃতির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পূর্ব গগনে ইংরাজী শিক্ষার যে রক্তিমচ্ছটা দেখা গেল, তার মাধ্যমে নূতন বস্তুর পরিচয় লাভ করে তৎকালীন বাঙ্গালী চিত্ত উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠারও পূর্ব থেকে কলকতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইংরাজ-পরিচালিত কয়েকটি রঙ্গালয় ইংরাজী নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে উচ্চ শ্রেণীর নাট্যরস পরিবেশনে সমর্থ হয়েছিল। এ বিষয়ে ১৮১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত চৌরঙ্গী থিয়েটারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে বিভিন্ন ইংরাজী নাটকের উচ্চাঙ্গের অভিনয় দেখে শিক্ষিত বাঙ্গালী খুবই

মেতে উঠেছিল। হিন্দু কলেজের সেক্স্‌পীয়ারের নাটকের অধ্যাপক রিচার্ডসন ছাত্রদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এখানে প্রায়ই অভিনয় দর্শনে নিয়ে আসতেন।

উনবিংশ শতকের সৌখীন, শিক্ষিত, ধনীগৃহের নাট্যশালায় যে অভিনয়-রীতি প্রচলিত ছিল,—তার আদিগুরু রিচার্ডসন। এঁর সম্বন্ধে আমরা উপযুক্ত স্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

এই চৌরঙ্গী থিয়েটার দীর্ঘকাল স্থায়ী (১৮১৩-১৮৩৯) হয়েছিল এবং শিক্ষিত ও অভিজাত বাঙ্গালী সমাজকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। এই থিয়েটার ব্যতীত কলকাতার আশেপাশে খিদিরপুর থিয়েটার (১৮১৫), দমদম থিয়েটার (১৮১৭), বৈঠকখানা থিয়েটার, চন্দননগর থিয়েটার প্রভৃতিতেও ইংরাজী নাটকের অভিনয় হত। এই সকল থিয়েটারে ইংরাজী শিক্ষিত বহু বাঙ্গালী দর্শকেরও সমাগম হত। আলোক সম্পাতের চমৎকারিত্ব, দৃশ্যপটের নূতনত্ব সেদিন মুগ্ধ করেছিল বাঙ্গালী দর্শক সমাজকে। তৎকালীন যাত্রার মধ্যেও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সেই নব প্রভাবে অনুপ্রাণিত যাত্রাকে অনেকে 'নূতন যাত্রা' নামে আখ্যাত করেছেন।

১৮২২ সনের ১৩ই জুলাইএর 'সমাচার দর্পণে' আমরা 'নলদময়ন্তী' -নামক একটি যাত্রার সমালোচনা দেখতে পাই।

সমালোচনায় বলা হয়েছে—

"নূতন যাত্রা—কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া নলদময়ন্তী যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখিলে বাহুল্য হয় এ প্রযুক্ত সংক্ষেপে সর্বত্র জ্ঞাত করিতেছি ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতির সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগরাগিনী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্যনৃত্য এবং গ্রন্থমত পরস্পর কথোপকথন এ অতি চমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন ; ঐ যাত্রা প্রথমে ঐ ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দং বাটীতে গত ২৩শে

আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে।"* অন্যান্য আরও কয়েকটি নূতন ধরণের যাত্রা এই সময় অভিনীত হয়। ভবানীপুরে শ্যামসুন্দর সরকারের বাটীতে ভবানীপুর নিবাসী জগমোহন বসুর 'কামরূপ যাত্রা' অভিনীত হয়েছিল ১৮২২ সালের ৯ই মার্চ শনিবার রাত্রে। পুস্তকটি মৌলিক নয়, উইলিয়ম ফ্রাঙ্কালিনের 'Comroopa' গ্রন্থের অনুবাদ বিশেষ।† ১৮২৩ এর ৩১শে মে শনিবার ভূকৈলাস-এ আর একটি সৌখীন যাত্রার দল এদেশীয় এবং বিদেশীয় বহু অভিজাত দর্শকের সম্মুখে 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নামক একটি যাত্রাভিনয় করেছিল।‡

এইভাবে বাংলাদেশে যে নব আলোকপ্রাপ্ত অনেকাংশে ভিন্ন প্রকৃতির নূতন যাত্রার প্রচলন হয় তার ধারা বহুদিন পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল।

ইংরাজ পরিচালিত বিভিন্ন রঙ্গালয়ে ইংরাজী নাটকাভিনয়ের প্রভাব এবং হিন্দু কলেজের মাধ্যমে ইংরাজী শিক্ষা ও সেক্স্‌পীয়ার চর্চার ফলশ্রুতিস্বরূপ নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী কর্তৃক প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৩১ সালে।—সেই নাট্যশালা হল প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার।' কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চে কোনও বাংলা নাটক অভিনীত হয় নি। Prof. Wilson কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির 'উত্তরাম চরিত' এবং Shakespeare-এর জুলিয়াস সীজার-এর কিয়দংশের অভিনয় এই রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৩২ এর ২৯শে মার্চ "Nothing Superfluous" নামে একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। ইংরেজ শিক্ষক রেখে নাট্যশিক্ষাদান করা হ'ত এই 'হিন্দু থিয়েটারে'—Wilson ছিলেন এই থিয়েটারের একজন নাট্যশিক্ষা-দাতা। পাত্রপাত্রীগণের বেশভূষা, দৃশ্যপট প্রভৃতি খুবই চিত্তাকর্ষক এবং রুচিসম্মত হয়েছিল এবং তৎকালীন সংবাদপত্রসমূহ এই থিয়েটারের সমুদয় বিষয়ের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল। প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে অভিনীত হত ইংরাজী নাটক অথবা ইংরাজীতে

* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ১৭৯৫-১৮৭৮, পৃষ্ঠা ৯

† The Calcutta Journal, 29th March, 1822, Page 309

‡ Supplement to Government Gazette for June 12, 1823

অনূদিত ভারতীয় নাটক। তাই সাধারণ মানুষের রসচিত্তকে পরিতৃপ্ত করতে সমর্থ হয় নি।

এরপর বাঙ্গালীর চেষ্টায় বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য শ্যামবাজারে বাবু নবীন চন্দ্র বসুর বাড়িতে একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বাংলার নাট্যশালার ইতিবৃত্তে এই রঙ্গালয়টি বাঙ্গালী নাট্যামোদী কর্তৃক বাংলা নাটকাভিনয়ের প্রথম প্রচেষ্টা স্বরূপ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ১৮৩৫ সালের অক্টোবর মাসে এখানে ভারতচন্দ্রের জনপ্রিয় আখ্যায়িকা বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হয়। 'হিন্দু পাইওনীয়ার' নামক ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকায় এই অভিনয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করে একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু উক্ত পত্রিকার ১৮৩৫-এর ২২শে অক্টোবর যে বিবরণ* প্রকাশিত হয় তা' থেকে জানতে পারা যায়, নবীন বসুর নাট্যশালা প্রায় ১৮৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানে বৎসরে কয়েকটি নাটকের অভিনয় হ'ত। বিদ্যাসুন্দরের পূর্বে এখানে যে কোন্ কোন্ নাটক অভিনীত হয়েছিল তা' অবশ্য জানা যায় না।

এই থিয়েটারে স্ত্রীভূমিকায় স্ত্রীলোকগণই অবতীর্ণ হতেন এবং সেজন্য মহিলাগণ অভিনয় দর্শনের জন্য অধিক সংখ্যায় উপস্থিত থাকতেন।

এই থিয়েটারে অভিনয় কালে দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয়েছিল অথবা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দৃশ্যের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটা ঠিক স্পষ্টরূপে জানা যায় না। তবে Hindu Pioneer-এর পূর্বোক্ত তারিখের বিবরণে দেখতে পাই বিভিন্ন স্থানে দৃশ্যাবলী অভিনয় করার সম্বন্ধে কোন কিছুই উল্লেখ নেই। বরং অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর বিষয়ই বলা হয়েছে—

* "Native Theatre—This Private theatre got up about two years ago is supported by Babu Nabin Chandra Bose. It is situated in the residence of the proprietor at Shambazar where four or five plays were acted during the year. These are native performances by the people entirely Hindus, after the English fashion, in the vernacular language of their country."—Hindu Pioneer of October 1835, Quoted in AsiaticJournal of 1836 (April).

"The scenery was generally imperfect, the perspective of the pictures, the clouds, the water, were all failures, they denoted both want of taste and sacrifice of judicious principles and the latter were scarcely distinguished except by the one being placed above the other. Though framed by native painters they would have been much superior had they been executed by careful hands."*

কিন্তু ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখেছেন—

"To display thunder and lightning to the audience, Nabin Babu had apparatuses and mechanical contrivances procured at a heavy cost from England. Yet Nabin Babu had no stage in his house like the one of the present day and the audience had therefore to move several times to different places to witness different scenes. The scene of Sundara was seated on the banks of tank within the garden of Nabin Babu. The stately Council Chamber of Beersingh, the Raja of Burdwan, was shown in his drawing room and the thatched cottage of Malini in another part of the house. Earth was dug to show the underground tunnel leading from Malini's house to the interior of the Raja's palace."†

এক একটি স্থানে এক একটি দৃশ্য অভিনীত হয়েছিল বলে যে ডক্টর দাসগুপ্ত বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ে কোথা থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার কোনও উল্লেখ নেই। যাই হোক, নবীন বসুর থিয়েটারে অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল প্রচুর, জাঁকজমক, আড়ম্বরের কোন অভাব ছিল না।

নবীন বসুর নাট্যশালার বিলুপ্তি ঘটার পর কিছু কাল বাঙ্গালীগণ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য রঙ্গালয় স্থাপন অথবা অভিনয় আদির অনুষ্ঠানের কথা শ্রুত হয়নি। নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ তখন প্রায় স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের পুরস্কার বিতরণী প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ইংরাজী কবিতা আবৃত্তি এবং সেক্স্‌পীয়ারের

* Hindu Pioneer, October, 1835.

† Indian Stage, Vol. I, page 286

নাটকের খণ্ডাংশ অভিনয়ের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছিল। এখনকার ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে প্রায়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করে থাকে, তখনকার শিক্ষার্থীগণও তেমনি যে কোন উপলক্ষ্য উপস্থিত হ'লে Shakespeare থেকে আবৃত্তি করে শোনাত। কলকাতার গভর্ণমেণ্ট হাউসে হিন্দু কলেজের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৭ সালের ২৯শে মার্চ। এই অনুষ্ঠানে সেক্‌স্‌পীয়ারের কয়েকটি নাটকের দৃশ্যাবলী আবৃত্তির পদ্ধতিতে অভিনয় করেছিল ঐ কলেজের ছাত্রগণ। ১৮৩৭ এর ১লা এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বিবরণ থেকে এবিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

স্কুল-কলেজের ইংরাজী নাটকের খণ্ডাংশের অভিনয়, ইংরাজী কবিতার আবৃত্তি প্রভৃতির অনুষ্ঠান ব্যতীত ইংরেজ-পরিচালিত রঙ্গালয়ের দিকেও শিক্ষিত বাঙ্গালী দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং দর্শক হিসাবেই সেখানে শুধু উপস্থিত থাকতেন না, তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার অভিনয়েও অংশ গ্রহণ ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৩৯ সালে আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল চৌরঙ্গী থিয়েটার এবং তার ফলেই তার গৌরবময় জীবনের অবসান হ'ল। এর অব্যবহিত পরেই রূপ পরিগ্রহ করল অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা—সাঁশুচি। এই নাট্যশালায়, পরে বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য নামক একজন বাঙ্গালী অভিনেতার উচ্চস্তরের অভিনয়ের বিষয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বিবরণ থেকে জানতে পারা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে সমসাময়িক একটি পত্রিকা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হ'ল।

"……এতদ্দেশীয় নর্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গী ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, তিনি কোনরূপে ভীত অথবা কোন ভঙ্গি অবহেলন করেন নাই, তিনি চতুর্দ্দিক হইতে ধন্য ধন্য শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন, ……।"*

পুনরায় 'ওথেলো' নাটক অভিনীত হয়েছিল এবং সেই অনুষ্ঠানেও নাম ভূমিকায় বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্যই অভিনয় করেছিলেন।

* সংবাদ প্রভাকর, ২১শে আগষ্ট ১৮৪৮

সে সময় একজন বাঙ্গালী অভিনেতা এইভাবে সেক্স্পীয়ারের নাটকে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন এটা অবশ্যই গৌরবের বিষয়।

এই পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রভাবের যুগে বাংলায় যাত্রাও এই নবভাব ধারাকে অনেকাংশে গ্রহণ করেছিল, তাই এই গতানুগতিকতাও মুক্ত হ'য়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। এই রকম নবীন আঙ্গিক বিশিষ্ট 'নূতন যাত্রার' কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ১৮৪৯ সালে 'নন্দ-বিদায়' নামক যে অভিনব যাত্রাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, নূতন যাত্রার ইতিহাসে তার আসন গৌরবমণ্ডিত স্থানে অধিষ্ঠিত। ১৮৪৯ সালের ৩০শে মার্চের 'সম্পদ ভাস্কর' পত্রে জনৈক দর্শক এই নূতন ধরণের যাত্রাটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"সমস্ত রাত্রি এবং বেলা চারি দণ্ড পর্যন্ত যাত্রা হইয়াছিল, যাত্রা যে অতি উত্তম তাহার কোন সন্দেহ নাই, ··· যে সকল ব্যক্তিরা সাজিয়াছিলেন তাহাদের বস্ত্রালঙ্কারাদি অতি উত্তম হইয়াছে, বেহালা, তবলা এবং ঢোলক বাদকেরা অতিশয় গুণান্বিত এবং গীত সকলের মধ্যে প্রচুর কবিতাশক্তি প্রকাশ আছে, বোধ করি বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে মহাকবি নিধুবাবুর টপ্পার সমান হইবে, প্রায় তাবৎগীত হাফ্ আখড়াইর, খেয়াল, কীর্তনের এবং টপ্পার সুরেতে গাহনা হইবামাত্র অতিশয় মিষ্ট এবং সুশ্রাব্য হইয়াছিল,······কিন্তু সর্বোপরি ছিদাম নাম্নী এক বালিকার গানে তাবৎকে মোহিত এবং চমৎকৃত করিয়াছে, ছিদামের বয়স উর্দ্ধ তের বৎসর,······ তাহার সুরের ন্যায় মিষ্ট আমি আর কখনও শ্রবণ করি নাই, অন্যান্য বালকেরা এবং আর একটি বালিকাও অতি উত্তম গান করিয়াছিল।"

এই 'নন্দবিদায় যাত্রা'টি যাত্রার প্রচলিত সনাতন পদ্ধতির ক্ষেত্রে নবযুগের বার্তা বহনকারী ভোরের পাখী। এর মধ্যেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল নব-জাগরণের সুরছন্দ। বঙ্গীয় নাট্যশালায় যেমন ইতিমধ্যেই লেবেডেফ এবং নবীন মাধব বসু কর্তৃক মহিলাদের নিয়ে অভিনয় করার রীতি প্রচলিত হয়েছিল, এই যাত্রাটির মধ্যেও তেমনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সমবেত অভিনয় প্রয়াসের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে

আমরা জানতে পারি যে, কোন এক স্থানে একটি দিনের অভিনয়ের মধ্যেই 'নন্দবিদায়' বিদায় গ্রহণ করেনি,—আরও কয়েকস্থানেই দর্শকদের অভিবাদন করে খ্যাতি অর্জন করার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। ইতিপূর্বে আমরা স্কুল কলেজে সেক্স্পীয়ারের নাটকের অংশ বিশেষ অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু স্কুল কলেজের মাধ্যমে ইংরাজী নাটকের সম্পূর্ণাঙ্গ অভিনয় দেখা গেল ১৮৫১ সালের ৭ই আগস্ট ডেভিড হেয়ার একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হবার পর। ১৮৫৩-র ১৫ই ফেব্রুয়ারী ছাত্রগণ কতিপয় প্রতিভা-সম্পন্ন ইংরাজ শিল্পী কর্তৃক নির্মিত সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত রঙ্গমঞ্চে 'Merchant of Venice' অভিনয় করেছিল। ছাত্রগণের উচ্চাঙ্গের অভিনয় সে সময়ে নাট্যামোদী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছিল। 'সংবাদ প্রভাকরের' বিবরণ থেকে এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

'বেঙ্গল হরকরা'র আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি—কলকাতা মাদ্রাসার ইংরাজী বিভাগের প্রধান শিক্ষক ক্লিঙ্গার সাহেব ডেভিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্রগণকে সেক্স্পীয়ারের নাটকাভিনয় সম্পর্কে শিক্ষাদান করেছিলেন; ছাত্রগণের অভিনয়-সাফল্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বড় কম নয়। Merchant of Venice-এর দ্বিতীয় অভিনয় সম্পর্কে ১৮৫৩-র ২৬শে ফেব্রুয়ারীর 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রশংসা-সূচক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৫৩ সালে বাবু প্রিয়নাথ দত্ত, তাঁর উপযুক্ত সহ-কর্মী বাবু দীননাথ ঘোষ ও সীতারাম ঘোষ এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র উক্ত বিদ্যালয় গৃহেই ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। মাইকেল মধুসূদন যাঁকে বাংলা রঙ্গালয়ের Garrick নামে অভিহিত করেছিলেন সেই বিখ্যাত নাট্য-প্রতিভাধর কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীও এই ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের সংস্পর্শে আসেন। এই নাট্যশালা ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করেছিল এবং এখানকার অভিনয়-শিক্ষক ছিলেন ক্লিঙ্গার সাহেব। তাঁর শিক্ষাগুণে এই নাট্যশালায় সেক্স্পীয়ারের কয়েকটি নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Herman Jeffroy-এর নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন Oriental Seminary-র প্রধান শিক্ষক, সেই সময়ই তিনি ছাত্রগণের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের যে বীজ বপন করেছিলেন

তার পরিণতি লাভ হয়েছিল ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এই ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে প্রশংসনীয়ভাবে 'ওথেলো', 'মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস', 'হেন্‌রী দি ফোর্থ,' এর প্রথম অংশ এবং হেন্‌রী মেরিডিথ পার্কারের 'আমাটোর' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

'এলিস' নাম্নী একজন ইংরাজ মহিলা পরে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে নাট্য-শিক্ষাদানে নিযুক্ত হ'ন।

একটি অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে The Bengal Hurkara পত্রিকাকে বলতে দেখা যায় "যে সকল চরিত্রের অভিনয় ভাল হবে না বলে মনে হয়েছিল, সেই সকল ভূমিকা সুঅভিনীত হয়েছিল, বিশেষ করে ইয়াগোর ভূমিকায় বাবু প্রিয়নাথ দত্ত অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন।"

এই প্রিয়নাথ দত্ত ও কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী ইংরাজ নাট্য-শিক্ষকদের নিকট শিক্ষালাভ করেছিলেন। Richardson প্রমুখ খ্যাতনামা নাট্য-শিক্ষক-গণের ঐতিহ্য বহন করেছিলেন এই সকল সুশিক্ষিত অভিনেতৃগণ।

যাই হোক, অভিনেতা এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের নাট্য-প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু তবু এই সকল রঙ্গালয় বাংলা নাটক অভিনয়ের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছিল বাঙ্গালী নাট্যামোদী তৃষাদীর্ণ অন্তরে। বাংলা নাটকের জন্য প্রায় সকলের মনেই তখন আকুলিবিকুলি, ব্যাকুল কামনা—বাংলা নাটকের অভিনয়োপযোগী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য।

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের পর স্কুল কলেজের সংস্পর্শহীনভাবে একটি নূতন নাট্যশালার আবির্ভাব ঘটল। নবীন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকোর বাসস্থানে এই জোড়াসাঁকো থিয়েটারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এখানেও কোন বাংলা নাটকের অভিনয় হয়নি। এই নাট্যশালায় সেক্‌স্‌পীয়ারের জুলিয়াস সীজার অভিনীত হয়েছিল প্রশংসনীয়-ভাবে। ১৮৫৪র ৩রা মে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় এবং ৫ই তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এবিষয়ে একটি বিস্তৃত এবং প্রশংসাজনক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলা নাটকাভিনয়ের আকাঙ্ক্ষা এই সকল

ইংরাজী নাট্যাভিনয়ের মধ্যে পরিতৃপ্ত হয়নি, বরং সাধারণ বাঙ্গালী নাট্যামোদিগণের বাংলা নাট্যরস-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল।

বাংলা নাটকের অভিনয়ের জন্য আন্তরিক কামনা এই সময় বিভিন্ন মহলে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু অভিনয়োপযোগী বাংলা নাটক তখনও রচিত হয়নি। ১৮৫৫র আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয় নন্দকুমার রায় রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক। এই নাটকটিই বাংলা নাট্যশালার প্রথম অভিনীত নাটক—তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। সিমলার আশুতোষ দেব (সাতুবাবু)র বাড়ীতে এই নাটকটি অভিনীত হয় ১৮৫৭ সালের ৩০শে জানুয়ারী। পাদরী লং সাহেবের বাংলা পুস্তকের তালিকায় পূর্বোক্ত নাটকটির পূর্বেও কয়েকটি নাটক রচিত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সেগুলির কোনটিই অভিনীত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেনি—কারণ পূর্ণাঙ্গ এবং প্রকৃত নাটকরূপে সেগুলিকে কিছুতেই আখ্যা দেওয়া যায় না।

ঐ সকল নাটক পয়ার বা ত্রিপদীতে রচিত এবং কথাংশ দীর্ঘসমাস বাহুল্যে কণ্টকিত। তা হলেও বাংলা নাটক সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক প্রয়াস বলে নাট্য সাহিত্যের ইতিবৃত্তে এ গুলির স্থান সর্বপ্রথম। ১৮২২ সালে কৃষ্ণ মিশ্রের সংস্কৃত ষড়ঙ্ক নাটক 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' অনূদিত হয়ে 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' নামক বাংলা নাটকরূপে প্রকাশলাভ করে। বাংলা নাটকের আদিযুগের প্রথম নাটকরূপে অনেকেই একে অভিহিত করে থাকেন। ১৮২২ সালে কবি জগদীশ কর্তৃক সংস্কৃত প্রহসন 'হাস্যার্নব' বাংলায় অনূদিত হয়। গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত সংস্কৃত "কৌতুক সর্বস্ব" নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন হরিনাভির রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। এই নাটকের বিষয়বস্তু কলিরাজার উপাখ্যান। নাটকটি সাধুভাষায় এবং পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত। এরপর আরও কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ-এর নাম করা যায়, ১৮৪৮ সালে শকুন্তলার অনুবাদ করেন রামতারক ভট্টাচার্য, ১৮৪৯এ নীলমণি পাল কর্তৃক অনূদিত হয় রত্নাবলী নাটক—মহানাটকের বঙ্গানুবাদ করেন ১৮৫১ সালে রামগতি ন্যায়রত্ন। এই সমুদয় নাটকের ভাষা জটিল ও দুর্বোধ্য এবং অভিনয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

'প্রেম নাটক' বা 'রমণী নাটক' নামে একটি নাটক নামধেয় কাব্যগ্রন্থের উল্লেখও কোনও কোনও স্থানে দেখা যায়।

যাই হোক, এই সকল অপরিণত অনুবাদ নাটকের রচনার পর উল্লেখ-যোগ্য কয়েকটি নাটক প্রকাশিত হয়ে বাংলা নাটকের আদিযুগের সমাপ্তি ঘোষণা করল।

অনূদিত বাংলা নাটকে গীতাধিক্য এবং ভাঁড়ামীর প্রাবল্য ও উপযুক্ত নাট্যধর্মের অভাবের জন্য শিক্ষিত নাট্যরসিকের রসচিত্ত তৃপ্ত হয় নি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট বাংলা নাটকের অভাব সকলেই অনুভব করতে লাগল। এই যুগসন্ধির সময় বাংলা নাট্যাকাশে পথের দিশারী ধ্রুবতারার ন্যায় আবির্ভূত হল—যোগেন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' নাটক ১৮৫১ সালে।*

এইটিই প্রথম বাংলা নাটকরূপে অভিহিত হয়ে থাকে। পঞ্চাঙ্ক নাটকটিতে সংস্কৃত নাটকের নাট্যবিধির প্রভাব বিদ্যমান। নান্দী, সূত্রধার, নটী সব কিছুর অস্তিত্বই এই নাটকে বিরাজিত। বিয়োগান্ত দৃশ্যে এই নাটকের সমাপ্তি। সুতরাং এই জাতীয় বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও কীর্তিবিলাস পথ প্রদর্শক। নাটকটি পূর্বোক্ত অশ্লীলতা, কদর্যতা বা নিকৃষ্ট কোন কিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। লং সাহেব এই নাটকের বিষয়ে বলেছিলেন—

"The drama shows considerable talent."

কীর্তিবিলাসের পরই 'ভদ্রার্জুনের' পদক্ষেপ। ১৮৫২ সালে রচিত তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকই সর্বপ্রথম সংস্কৃত নাট্যধারার প্রভাব অস্বীকার করে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে নূতন ধরণের আঙ্গিকের সূচনা করল।

তারাচরণ তাঁর নাটকের ভূমিকায় নাট্যরচনা-প্রণালীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে

* ডাঃ হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্তের বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত পৃ-৯।

ইউরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে; কিন্তু গদ্য-পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা প্রথমে নান্দী তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইউরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় (Act) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট সেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল।.........নাটক নির্ণীত সংযোগ স্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইউরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইউরোপীয়দিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবদের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থে ইউরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

'ভদ্রার্জুন' নাটকের বিষয়বস্তু পৌরাণিক কাহিনী সুভদ্রা ও অর্জুনের প্রণয় বৃত্তান্ত। কিন্তু কাহিনীটি প্রায় অবিকৃত রাখা হলেও এই নাটকে ইংরাজী নাটকের আঙ্গিক ও ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় ভদ্রার্জুন ঠিক পুরোপুরি একটি পৌরাণিক নাটকে পরিণত হয়ে উঠতে পারে নি।

নাটকটি বরং অনেকাংশে লোকধর্মী হয়ে উঠেছিল। Dr. Sushil Deyও বলেছেন—"সরস হয়েছে, পৌরাণিক হয় নি।" ভদ্রার্জুন নাটকটি প্রকৃত পক্ষে প্রাণময় বাস্তবধর্মী। কাহিনীর মধ্যে পৌরাণিকত্ব থাকলেও নাট্যকার এই নাটকটিতে বাংলার চিরন্তন স্বভাবধর্ম আরোপ করে একে বাস্তবতামণ্ডিত করে তুলেছেন। অর্জুন চরিত্র গড়ে উঠেছে রক্ত মাংসের মানুষের সজীবতা নিয়ে। কন্যাদায় প্রপীড়িত পরিবারের উৎকণ্ঠা, বিবাহ-বিধি, স্ত্রী-আচার, মহিলাগণের কথোপকথন প্রভৃতির মধ্যে বাঙ্গালী সমাজের একটি প্রাণোজ্জ্বল চিত্ররূপের আভাস পাওয়া যায়। এই বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টিই ক্ষুণ্ণ করেছে নাটকটির উপজীব্য পৌরাণিক ধর্মকে। পৌরাণিক নাটকে বাস্তব বুদ্ধির স্থান থাকে না, তাই সাংসারিক মানদণ্ডে এর মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এ নাটকে থাকে বাস্তব জগতের ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক ভাবময়তার

অপার্থিব পরিবেশ,—ধর্মপথে,—শান্তিময় স্বর্গলোক অভিমুখে যাত্রার মধ্যে সাংসারিক দুঃখগ্লানির মুক্তির অলৌকিক আনন্দঘন সংকেত। পৌরাণিক ভাবচেতনা যে নাটকে থাকে না—সে নাটক নিছক কাহিনীর জোরে পৌরাণিকত্ব দাবি করতে পারে না। পৌরাণিক নাটকে থাকবে না নাট্যকারের কোন সচেতন অস্তিত্ব; লৌকিক জগতকে অতিক্রম করে সেখানে বিরাজ করবে অলৌকিক অমর্ত্যলোকের ভাবমায়া। এই সকল নাটকে সংগীতের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী—কারণ সংগীতের স্বরমূর্চ্ছনাতেই অনায়াসে রচনা করা যায় অধ্যাত্ম কুহেলীমণ্ডিত ভাব-জগৎ; সংলাপের আধিক্য মায়াজাল ছিন্ন করে বাস্তবের সৌরকিরণকে বিকীর্ণ করে, তাই পৌরাণিক নাটকে সংলাপের স্বল্পতা আবশ্যক। ভদ্রার্জুন নাটকের মধ্যে বাস্তবতার ছায়াপাত ঘটায় অধ্যাত্ম আদর্শ নিষ্ঠার অভাব দেখা যায়। পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ গ্রহণ করার ফলেই এই নাটকটি পুরোপুরি পৌরাণিক ভাব-চেতনায় অভিমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও ভদ্রার্জুন নাটকটি অনুবাদের পরবশ্যতা কাটিয়ে বিদেশী রীতিতে মৌলিক নাটক রচনার সাহসিক প্রচেষ্টারূপে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস পথিকৃত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কীর্তিবিলাস, ভদ্রার্জুন প্রভৃতির পর উল্লেখযোগ্য নাট্যসৃষ্টি হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্ত বিলাস'। এই নাটকটি সেক্‌স্‌পীয়ারের Merchant of Venice অবলম্বনে রচিত।

গল্পের বিষয়বস্তু পাশ্চাত্য হলেও এর মধ্যে ভারতীয় রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রকাশ ১৮৫৩। এরপর হরচন্দ্র 'কৌরব বিজয় নাটক', 'চারুমুখ চিত্তহরা' (রোমিও জুলিয়েটের অনুবাদ) ''রজত গিরি নন্দিনী' প্রভৃতি কোনও প্রচলিত আখ্যান বস্তু অবলম্বনে অথবা অনুবাদমূলক নাটক রচনা করেন। পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ গ্রহণ করার চেষ্টা থাকায় তখনও ইংরাজী নাটকের তর্জমা করার প্রয়াস এই সমস্ত নাট্য সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী করার জন্য তিনি কথ্যভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করে-ছিলেন তাঁর নাটকে। কিন্তু কোন রঙ্গমঞ্চে এই সমুদয় নাটকের অভিনয়ের কোন প্রমাণ নেই। মঞ্চের সঙ্গে কোন সংযোগ না থাকায় এই সকল নাটকের কোনরূপ প্রভাব পরবর্ত্তী নাট্য প্রচেষ্টায় ক্ষেত্রে অনুভূত হয় নি।

১৯শ শতকের মধ্যভাগে বাংলার বুকে বয়ে যায় নব চেতনার চঞ্চল প্রবাহ; সমাজের পুঞ্জীভূত গ্লানি মোচন করার জন্য সুধীজন তখন এগিয়ে এসেছেন। পত্রপত্রিকার বিভিন্ন সমালোচনায় এবং প্রবন্ধের কষাঘাতে দেশবাসী ধীরে ধীরে আত্মস্থ হয়ে উঠেছে; বেজে উঠেছে সংস্কার যুগের শঙ্খধ্বনি। এমন সময় নবযুগের বার্তাবহরূপে দেখা দিল বিপ্লবী নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটক। রামনারায়ণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তাই তাঁর নাটকে সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রভাব,—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেখানে নেই সংস্কৃতের অন্ধ অনুবর্তন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে তিনি যে কিভাবে সমাজদেহের গলিত কুষ্ঠ কৌলিন্য প্রথা এবং বহু বিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে পেরেছিলেন নির্ভীকভাবে, একথা চিন্তা করলেও বিস্মিত হতে হয়। রামনারায়ণের নাটকই প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক এবং 'শকুন্তলা'র অভিনয়কে প্রথম ধরলে বাংলা দেশের বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় দ্বিতীয় অভিনীত নাটকরূপে অভিহিত করা যায়। অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। এই নাটক যদিও রচিত হয়েছিল ১৮৫৪ সালে, কিন্তু রামজয় বসাকের বাড়িতে প্রথম অভিনীত হয় ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে। নাটকটির মধ্যে সামাজিক সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে। সমাজের কলঙ্কিত অভিশাপের বিরুদ্ধে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বিষোদ্গার করতে রামনারায়ণ ভীত হন নি। এই নাটকে তিনি সংস্কৃত ধারা অনুযায়ী উচ্চশ্রেণীর মুখে সাধুভাষা, নিম্নশ্রেণীর মুখে গ্রাম্যভাষা এবং মহিলাদের কথা বার্তায় কথ্য ভাষা প্রয়োগ করেছেন। সাধুভাষায় কথোপকথনকারী পুরুষ চরিত্রগুলি আড়ষ্ট এবং কৃত্রিম হয়ে পড়েছে, কিন্তু চলিত ভাষা ব্যবহারকারিণী নারী চরিত্রগুলি অনেক সহজ, স্বচ্ছন্দ ও জীবন্ত। সাধুভাষা ব্যবহৃত হলেও বাংলার প্রবাদ ও প্রবচনের প্রয়োগের দ্বারা বাংলার মর্মবাণীর সন্ধান দেবার চেষ্টা করেছেন রামনারায়ণ। তিনিই প্রথম চরিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন বাংলা নাটকের মধ্যে। যদিও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারেনি, তথাপি এই নব প্রচেষ্টার তিনিই অগ্রদূত। নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলির নাম থেকে বোঝা যায় যে, এগুলি প্রতিনিধিমূলক (representative বা type) চরিত্র, রামনারায়ণের চরিত্রের নামগুলি

খুবই কৌতুকপ্রদ। যথা, কুলপালক, শুভাচার্য, বিরহি পঞ্চানন, অধর্মরুচি ও বিবাহ বণিক ইত্যাদি। এই প্রকারের নামকরণ ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যে দেখা যায়। Ben Jonsonএর Every Man in His Humour, Massinger-র A New way to Pay Old Debts, Sheridon-এর, The Rivals এবং School for Scandals, প্রভৃতি নাটকে Type বা শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে অনুরূপ নামকরণ হয়েছে।

এখানে Massinger-এর উপরোক্ত নাটকটি হতে কতকগুলি নামের তালিকা দেওয়া হল—Lord Lovell, Sir Giles Overrich, Wellborn, Allworth, Greedy Marall, Furnace, Watchall, Tapwell, Froth প্রভৃতি এই নামকরণ থেকে অনায়াসে বোঝা যায় চরিত্রগুলি কোন্ শ্রেণীর। গম্ভীর প্রসঙ্গ অপেক্ষা হাস্যরসের ক্ষেত্রে রামনারায়ণের কৃতিত্ব অধিক। প্রত্যেক ভাগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চরিত্র রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে রসসৃষ্টি করেছে। যাই হোক, পুরোপুরি নাটকত্ব কুলীন কুল সর্বস্বের মধ্যে না থাকলেও এবং একে সমাজচিত্র বা সামাজিক নকসা যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন—নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে রামনারায়ণের এই নাটকটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে চিরদিন। যখন নাট্যিক ভাষার সৃষ্টি হয়নি, তখনই রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর নাটকে যে কথ্যভাষা ব্যবহার করেছিলেন পরবর্তী নাট্যকার-গণকে তা' যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছে।—তাঁর নাটকের সমাজ সংস্কারের বৈপ্লবিক আদর্শ অন্যান্য নাটক লেখক কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে ভাবী কালে। এই নাটকটির অভিনয় দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এই নাটকটির ও শকুন্তলার অভিনয় বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও একথা কেহই অস্বীকার করবেন না যে, বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক নাটক হিসাবে এই নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার গৌরবের অধিকারী। এ সম্মান থেকে কেউ একে বিচ্যুত করতে পারবেন না।

১৮৫৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখের সংবাদ প্রভাকরে শকুন্তলা অভিনয়ের আয়োজন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ৩০শে জানুয়ারী নাটকটির প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠান হয়। অভিনয় খুবই ভাল হয়েছিল, কিন্তু সে

অভিনয়ানুষ্ঠানে বিশ হাজার টাকা দামের অলঙ্কারের চোখ ঝল্‌সান দীপ্তিটাই হয়ে উঠেছিল অধিকতর প্রকটিত। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে রামজয় বসাকের বাড়িতে খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে মঞ্চস্থ হল কুলীন কুল সর্বস্ব নাটক; অপরিচিত পথিকের মত সলজ্জভাবে এসে ক্ষণকালের মধ্যেই দিগ্বিজয় শুরু করল এই অভিনব এবং অভাবিতপূর্ব নাটকখানি। এই নাটকটি যেমন সাধারণ মানুষের অন্তর্বেদনাকে রূপদান করে সাধারণের প্রীতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিল, সেইরূপ বাংলাদেশের কুলীনগণের কাছ থেকেও কুড়িয়েছিল অজস্র অভিসম্পাত এবং কটূক্তি।

সখের নাট্যশালার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে যশস্বী লেখক বাবু কালী প্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৩ সালে কালী প্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভানামে একটি সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৫৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় 'বেণী সংহারে'র রামনারায়ণ তর্করত্ন কৃত বঙ্গানুবাদ ১৮৫৭-র ১১ই এপ্রিল। উক্ত অভিনয় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার আর্থার বুলার, সিসিল বিডন প্রমুখ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং দেশীয় অভিজাত দর্শকবৃন্দ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। কালী প্রসন্ন স্বয়ং ঐ নাটকে একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যশ অর্জন করেন এবং এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত কালীপ্রসন্নের লেখনী থেকে জন্ম নিল 'বিক্রমোর্বশীর' অনুবাদ। এই নাটকও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হ'ল ১৮৫৭-র ২৪শে নভেম্বর। এতেও কালীপ্রসন্ন নায়কের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের আর একটি মৌলিক নাটক 'সাবিত্রী সত্যবান' পরবৎসর প্রকাশিত হয়, কিন্তু অভিনয় হয়েছিল বলে জানা যায় না, তবে Dress Rehearsal বা প্রাক্ অভিনয় অনুষ্ঠান রূপ কোন কিছু হয়েছিল বলে সমসাময়িক পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকরে' উল্লেখ আছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের এই সমুদয় প্রচেষ্টা সৌখীন নাট্যাভিনয়ের আন্দোলনকে কিছুটা সতেজ ও শক্তিশালী করে তুলেছিল।

১৮৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বেলগাছিয়া নাট্যশালা—বাংলাদেশে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ। বাংলার উদীয়মান নাট্য প্রচেষ্টার ইতিহাসে

ঐদিনটির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্রের ঐকান্তিক নাট্যপ্রিয়তার ফলস্বরূপ তাঁদের বেলগাছিয়া-স্থিত প্রাসাদতুল্য বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই রঙ্গালয়। পূর্ববর্তী বিভিন্ন নাট্যপ্রচেষ্টার ক্ষীণ নক্ষত্র দীপ্তিপূর্ণ বাংলার নাট্যাকাশে সেদিন উদিত হল পূর্ণচন্দ্র, তার স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটায় সমস্ত গগন হল পরিপ্লাবিত,—আলোকস্নাত।

এই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত বাংলা অনুবাদ।

এই অভিনয়ানুষ্ঠান কলকাতার অভিজাত নাট্যামোদীদের অন্তরে যেমন পুলক-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, সেইরূপ নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও জাগিয়েছিল অপূর্ব উন্মাদনা ও অনুপ্রেরণার শঙ্খনিনাদ। গীতবাদ্যের সুরধ্বনি, সাজসজ্জার নয়নবিমোহন চরিত্রানুগতা, অভিনয়ের উচ্চমান এবং সর্বোপরি দৃশ্যপটের অনুপম সৌন্দর্য ও অসামান্যতা এবং আলোকসজ্জার অভিনবত্ব-মণ্ডিত বেলগাছিয়া নাট্যশালার অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের সৌরভ আমোদিত করে তুলেছিল সেদিনের বঙ্গীয় নাট্য-অঙ্গনকে। এই রঙ্গালয়েতেই প্রথম প্রচলিত হয় ঐক্যতান বাদন। ইংরেজ শিল্পীদের দ্বারা আঁকান হয়েছিল দৃশ্যপট, অভিজ্ঞ ইংরেজ তত্ত্বাবধায়কগণের ওপরই ভার দেওয়া হয়েছিল মঞ্চ-ব্যবস্থাপনার, গ্যাসের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠেছিল পাদপ্রদীপ, মঞ্চের উপর লাইমলাইটপ্রক্ষেপণে সৃষ্টি হয়েছিল স্বপ্নকুহেলীর মোহাবেশ। রত্নাবলীর illusion-দৃশ্য অনবদ্য। উচ্চ শ্রেণীর অভিনয়-শিল্পী বাবু কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীর 'বিদূষক' একটি অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি। ইংরেজ নাট্য শিক্ষকদের কাছেই তাঁর নাট্যশিক্ষার সূচনা, তাই তাঁর আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় অতি সুষ্ঠু, সাবলীল ও চরিত্রোচিত।

অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয়ও প্রশংসনীয় হয়েছিল। রত্নাবলী নাটকটি বেলগাছিয়ায় বেশ কয়েকবার অভিনীত হয়। দর্শকদের মধ্যে গণ্যমান্য ইংরেজ রাজকর্মচারী থাকায় তাঁদের রসাস্বাদের সুবিধার জন্য নাটকটির সারাংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করে প্রকাশিত করার ব্যবস্থা করা হয়। এই ইংরেজী সারমর্মটি লেখার জন্য ভার দেওয়া হয়েছিল মাইকেল

মধুসূদন দত্তের উপর। এই ঘটনাটি বাংলা নাট্যসৃষ্টির ইতিবৃত্তে নবযুগের সূচনাকারীরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরদিন। অভিনয় অনুষ্ঠানের জাঁকজমক, আড়ম্বর তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু নাটকের দুর্বলতা তাঁকে আনন্দ দিতে পারে নি। ইংরেজী, ল্যাটিন ও গ্রীক নাটকে সুপণ্ডিত মাইকেলের কাছে রত্নাবলী নাটকের অনুবাদটি অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হয়েছিল। সেই জন্য তিনি আক্ষেপ করেছিলেন এই রকম একটি তুচ্ছ নাটকের জন্য রাজারা এত অর্থব্যয় করেন; তখন থেকে তাঁর মনে একই চিন্তা—ভাল নাটক তাঁকে লিখতেই হবে; কল্পনা ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে পরিণত হয় দৃঢ়সংকল্পে।

সংস্কৃত নাট্যধারার অনুকৃতি তাঁর কাম্য নয়, পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের অর্ঘ্য দিতে হবে বাংলার নাট্যলক্ষ্মীর পাদপদ্মে। মাইকেলের অন্তরের কামনা-কুসুম ফলপ্রসূ হল,—ভূমিষ্ঠা হল 'শর্মিষ্ঠা'। মাইকেল তাঁর মানস-কন্যাকে কিন্তু পুরোপুরি পশ্চিম দেশীয়া করে তুলতে পারলেন না। সংস্কৃত ধারাকে তার নাট্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে একেবারে বর্জন করা মাইকেলের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। লোকরঞ্জনের জন্য তিনি নির্বাচন করেছিলেন পৌরাণিক বিষয়বস্তু। কিন্তু তার মধ্যে তিনি অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন পাশ্চাত্য ভাবধারার। তাই নাটকটির মধ্যে পৌরাণিক ভাবচেতনার অভাববশত তা' প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু আঙ্গিক বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে যাই হোক না কেন বাংলা নাটক রচনার বিষয়ে তিনি দেশকে এক নবতম ক্ষেত্রে উন্নীত করলেন। শর্মিষ্ঠার মধ্যে মাইকেল একটি সুরুচিসম্পন্ন কাহিনীকে স্বচ্ছন্দগতিতে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। এই নাটকে ত্রুটিবিচ্যুতি যাই থাক্, তবু এর রচয়িতাকে আমরা বিজয়ীরূপে অভিনন্দিত করতে পারি নাট্যজগতে তাঁর নবযুগ সৃষ্টিকারী অবদানের জন্য।

১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মাইকেলের শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় এবং ষষ্ঠ বা শেষ অভিনয় হয় উক্ত ১৮৫৯ এর ২৭শে সেপ্টেম্বর। এর পর থেকে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে আর কোন অভিনয় হয় নি রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অসুস্থতার জন্য। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র

পরলোক গমন করেন ১৮৬১ সালের ২৯শে মার্চ। তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হওয়ার সাথেই চির অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল বেলগাছিয়ার আলোকোজ্জ্বল রঙ্গালয়,—নীরব হল ঐকতানের সুমধুর সংগীত। কিন্তু নাট্যামোদীর অন্তরে তা'র স্মৃতি রইল চির অম্লান—নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ভাস্বরতার অস্তিত্ব।

মহাকবিরূপে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভা স্বীকৃত এবং সম্মানিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর নাট্য প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন আজও আমরা সম্পূর্ণভাবে করে উঠতে পারি নি। তিনি কাব্যরচনার পূর্বেই নাট্যকার, এবং যে নাটক লিখেছেন তা' যুগান্তরের সৃষ্টি করেছে।

আমরা সাধারণতঃ এ কথা চিন্তা করি না। সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের অনুবাদ এবং সংস্কৃত নাট্যাদর্শের জটাজাল থেকে মুক্ত করে তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মৌলিক নাট্যরচনার সুরধুনীকে বাংলার নাট্যক্ষেত্রে প্রবাহিত করেছিলেন। মাইকেলের নাটকগুলির সম্পর্কে বহু সমালোচকই ইতিপূর্বে বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করেছেন, সুতরাং সেজন্য বহু সমালোচিত একই বস্তুর বৈচিত্র্যহীন পুনরুক্তির এখানে কোন প্রয়োজন নেই বলেই মনে করি; আর তা'ছাড়া আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে সমুদয় বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবার অবকাশের একান্ত অভাব। আমরা তাই এখানে সে চেষ্টা না করে একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী হ'ব।—তা হ'ল বাংলার প্রবহমান নাট্যধারার পুষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর দান কতটুকু! তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর নাটকের রসাস্বাদে আকুল বাঙ্গালী নাট্যরসিকদের দেখে মাইকেল অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁকে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ভূমিকায় লিখতে দেখি—

"অলীক কুনাট্যরঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাট্য-আন্দোলনের নবযুগের যাত্রাপথে প্রথম পদক্ষেপ। পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের রীতি অনুসারে মাইকেল তাঁর নাটকটিকে পাঁচ অঙ্কে এবং প্রতি অঙ্ককে আবার কয়েকটি গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যে

ভাগ করেছিলেন। গম্ভীর অভিনয়ের মাঝে মাঝে তিনি হালকা ও সরস বস্তু আমদানি করে দর্শক চিত্তের গুরু মেঘ অপসারিত করে বিমল আনন্দ পরিবেশের চেষ্টা করেছিলেন। 'শর্মিষ্ঠা'র কাহিনী বিন্যাসের মধ্যেই আমরা পেলাম শিথিলতাহীন একটি সুবিন্যস্ত, দৃঢ়সংবদ্ধ কাহিনীর প্রথম সন্ধান।

'শর্মিষ্ঠা'র ত্রুটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই সুদীর্ঘ সংলাপ, কৃত্রিম স্বগতোক্তি, অলঙ্কার উপমা-অনুপ্রাস জর্জরিত ভাষার আড়ষ্টতা, নাট্যগতিকে ব্যাহত করেছে নানাস্থানে. নাট্যরস জমে ওঠার প্রধান অন্তরায় হ'য়ে উঠেছিল এই সকল দুর্বলতা। অনুপ্রাস ও অলঙ্কার-বহুলতা সেদিনের সাহিত্যে রীতি ছিল; কিন্তু তা' নাট্য-সাহিত্যের উপযোগী নয়। সেদিন অনেকেই তা উপলব্ধি করতে পারেননি, পরে পেরেছিলেন। কিন্তু এই নাটকের সৃষ্টিতে মাইকেলের ওপর যে সংস্কৃত প্রভাব এবং রত্নাবলী নাটকের কোনও কোনও চরিত্রের সঙ্গে তাঁর নাটকের চরিত্রের যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তার কারণ মাইকেলকে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের দিকে লক্ষ্য রেখে, বহুল প্রশংসিত রত্নাবলীর মঞ্চসজ্জার এবং অভিনেতাদের কথা স্মরণ রেখে এবং তৎকালীন দর্শক সমাজের রুচি ও চাহিদার দিকেও অনেকটা দৃষ্টি দিয়ে নাটক রচনায় ব্রতী হতে হয়েছিল। তাই অনেকটা ছাঁচে ফেলে নাটক লেখবার চেষ্টা করার মধ্যে মাইকেলের স্বাভাবিক প্রতিভার স্বাধীন বিকাশ সম্ভবপর হয়নি। তাছাড়া বাংলা নাটকে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য ধারার আত্মীকরণের নীতিই তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন; তিনি আশঙ্কা করেছিলেন দ্রুতগতিতে কোন কিছু নূতনের প্রবর্তনে নাট্যামোদীর রসচৈতন্য বিক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে। এই 'শর্মিষ্ঠা' নাটক যাত্রারূপে সে সময় এবং পরবর্তীকালে মঞ্চের অভিনয় প্রণালী প্রভাবিত হয়ে অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের আঙ্গিক কোনও পরিবর্তন না করে কেবলমাত্র যাত্রার উপযোগী করার জন্য এতে অধিক সংখ্যক গান সংযোজিত হ'ত। ১৮৬৭ সালে বাগবাজারে একটি সৌখীন যাত্রা সম্প্রদায় 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয় করেন।

পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠগীত-রচয়িতা বলে প্রসিদ্ধ গিরিশচন্দ্র এই নাটকের গীত-রচনার মধ্য দিয়ে সাধারণের কাছে প্রথম পরিচিত হন। তাঁর গানের কিছু অংশ অনুসন্ধিৎসু চিত্তের জন্য এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—

"সখীর প্রতি শর্মিষ্ঠার উক্তি—

অতুল রূপ হেরিয়ে।
বিমুগ্ধ মন, নিয়ত সে ধন, সাধন করি সই—
সে বিনা দহে হিয়ে" ইত্যাদি।

'শর্মিষ্ঠা' রচনার পর মধুসূদনের লেখনী অঙ্কুশরূপে আঘাত করতে উদ্যত হয় নব্য শিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল ইয়ং বেঙ্গল এবং তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের একশ্রেণীর বকধার্মিককে। তাই রচিত হ'ল দুটি অপূর্ব ব্যঙ্গ রসায়িত প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা', এবং 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এই প্রহসন দু'টির মধ্যে হয়েছে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ। সংস্কৃতের যেটুকু প্রভাব মধুসূদনের পূর্ববর্তী নাটকে দেখা যায় এই প্রহসনে তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। মঞ্চের দিকে না তাকিয়ে স্বাধীনভাবে রচনা করেছিলেন তিনি এই ব্যঙ্গ নাটিকা দু'টি; তাই এগুলির মধ্যে হয়েছে তাঁর নাট্য প্রতিভার স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ স্ফুরণ। সমাজ ও সমাজের মানুষের সম্বন্ধে তাঁর আশ্চর্য বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় নাট্য-সৃষ্টির ছত্রে ছত্রে। চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত ও নিখুঁত, ভাষা অত্যন্ত স্বাভাবিক, সংলাপ স্বল্প ও নাটকীয়, নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য থাকলেও কোথাও তা' প্রতীয়মান হয়ে উঠে নাট্যগতিকে শ্লথ বা মন্থর করে তোলেনি। কোন এক সমাজ বা কালের প্রতীক মাত্র না হয়ে দেশকালের ঊর্ধ্বে চিরকালের নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডারে অক্ষয় সম্পদরূপে সমাদৃত হবে মাইকেলের এই প্রহসন দু'খানি। 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দু'টি কোন কোন মহলে বিক্ষোভের সঞ্চার করায় পাইকপাড়ার রাজারা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ঐ বইগুলির অভিনয় করতে সাহসী হন নি। পরবর্তীকালে অবশ্য এদের অভিনয় হয়েছে এবং দর্শকদের শিক্ষা ও আনন্দ দান করে এই প্রহসন দু'খানি উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে।

এরপর ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হল মাইকেলের 'পদ্মাবতী',—গ্রীক বিষয়-বস্তুর কায়ার উপর মধুসূদন আরোপ করেন ভারতীয় আদর্শের স্বপ্নমায়া।

পদ্মাবতী নাটকে নাটকীয় রস হয়ে উঠেছে পূর্বাপেক্ষা ঘনীভূত, নাট্যিক ভাষার অভাব থাকায় মাইকেল Blank Verse-কে নিয়ে এলেন বাংলা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দরূপে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তাই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধারক হিসাবে 'পদ্মাবতী'র ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নয়।

বাংলার নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপ্লবী মাইকেলের বিদ্রোহ-তূর্য শেষবারের মত নিনাদিত হল তাঁর সর্বশেষ সম্পূর্ণাঙ্গ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'র মধ্যে। ভারতীয় নাট্যাদর্শ পুরোপুরি বর্জন করে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য নাট্যধারার অনুসরণে রচিত হল কৃষ্ণকুমারী নাটক। কৃষ্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম অভিনীত সার্থক বিয়োগান্ত নাটক। প্রথম ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদাও কৃষ্ণকুমারীর প্রাপ্য। মারাঠা প্রভাবের কালে মাইকেল মারাঠাদের বীরত্ব-গাথা থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ না করে টডের রাজস্থান থেকে মারাঠা-বিরোধী রাজপুতদের কাহিনীকে তাঁর নাটকের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করে তাঁর বিদ্রোহী মনের পরিচয় নূতন করে স্থাপন করেছিলেন। ইতিহাসকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করলেও এই নাটকের চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং আবেগ অনুভূতির নিখুঁত চিত্রায়নে নাটকটিকে তিনি করে তুলেছেন সজীব ও প্রাণধর্মী। চরিত্রসৃষ্টির বিষয়েও চিরাচরিত সনাতন ধারার অন্ধ অনুবর্তনের পরিবর্তে মৌলিকতা আভাসিত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণকুমারী নাটকের মধ্যে। পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব মাইকেলের এই নাটকের কয়েকটি চরিত্রের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, একথা স্বয়ং মাইকেলও স্বীকার করে গেছেন। সেক্‌সপীয়ায়ের সময়ে মঞ্চে পুরুষ অভিনেতারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী চরিত্রে অবতীর্ণ হতেন, তাই পুরুষবেশী নারী চরিত্র নাটকের মধ্যে থাকলে অভিনয়ের সময়ে যথেষ্ট সুবিধে হ'ত, সেজন্য পুরুষের ছদ্মবেশধারী স্ত্রীচরিত্র সৃষ্টি তখন সেক্‌স্‌পীয়ার প্রমুখ নাট্যকারগণ প্রায় বহু নাটকেই অন্যতম বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। Merchant of Veniceএর Portia, As you like it-এর Ganymede এবং Twelfth Night-এর Viola বেশধারী নারী চরিত্রেই মাইকেলকে মদনিকার পুরুষ ছদ্মবেশে উদয়পুরে গমন এবং অসমসাহসিক কার্যে ব্রতী হওয়া প্রভৃতি বিষয়ের উপস্থাপনায় অনেকখানি প্রেরণা যুগিয়েছিল বলে মনে করা অসঙ্গত হবে না।

মাইকেলের সমসাময়িক বাংলা রঙ্গালয়েও পুরুষ অভিনেতৃবর্গকে সর্বত্রই প্রায় স্ত্রী ভূমিকায় রূপদান করতে হ'ত, সেই জন্যই বোধ হয় মাইকেল ঐ ধরণের চরিত্র সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এই নাটকের দুর্বলতার বিষয় চিন্তা করলে প্রথমেই মনে হয় কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রতিনায়ক মানসিংহকে পাদপ্রদীপের সম্মুখে আনা হল না কেন? মানসিংহের উপস্থিতিতে নাটকীয় সংঘাত আরও তীব্রতা লাভ করার অবকাশ ছিল। কিন্তু মাইকেল সে সুযোগ গ্রহণ করেন নি,—সেই বিষয়ে কারও কারও মতে মাইকেলের ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাই দায়ী। টডের 'রাজস্থানে' বিস্তৃত বর্ণনাবিহীন মানসিংহের অনুল্লেখ্য চরিত্রকে নাট্যরস সৃষ্টির অন্যতম উপায়রূপে গ্রহণ করা মধুসূদন হয়ত অসঙ্গত বলেই মনে করেছিলেন।

যাই হোক্ মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক এবং বাংলা নাট্যাভিনয়ের দিক দিয়ে প্রথম ঐতিহাসিক ও বিষাদাত্মক নাটক কৃষ্ণকুমারী বঙ্গীয় নাট্যশালায় বিপুল জনসম্বর্ধনার মধ্যে অভিনীত হয়েছিল এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেও এর স্থান সুনির্দিষ্ট এবং গৌরবমণ্ডিত। বহুমুখী প্রতিভাধর মাইকেল অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, একটা সমগ্র যুগেও হয়ত তা সম্ভবপর হয় না।

কবিখ্যাতি অর্জনের পূর্বে তিনি ছিলেন নাট্যকার—সার্থক নাটক-রচয়িতা। নবতম নাটক সৃষ্টির মাধ্যমে মাইকেল তৎকালীন অভিনয়ধারাকে বহুলভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং তার মধ্যে এনে দিয়েছিলেন এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা, সেজন্য বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিবৃত্তে মাইকেলের নাম নবযুগ-প্রবর্তক হিসাবে অক্ষয় হয়ে থাকবে। এবং তাঁর যুগান্তকারী নাট্যপ্রতিভার যশ-সৌরভে সুরভিত হবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ।

মধুসূদনের পর বাংলা নাট্য-জগতে দেখা দিলেন দীনবন্ধু মিত্র। মধুময়ী ঊষার শেষে তিনি বহন করে আনলেন আলোকদৃপ্ত প্রভাতের নবীন বার্তা। বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে গৌরবজনক স্থানে স্থাপন ক'রে সে যুগের শ্রেষ্ঠ

নাট্যকারের বরমাল্য লাভ করেছিলেন দীনবন্ধু। দীনবন্ধুর মধ্যে বাস্তব দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও গভীর। গণ-চেতনার স্পন্দন শোনা যায় দীনবন্ধুর অধিকাংশ নাটকের মধ্যে। সমাজ-সংস্কারমূলক নাটক ইতিপূর্বে অনেক রচিত হয়েছে, কিন্তু ইংরাজ বণিকের অন্যায় নিপীড়ন-নির্যাতনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাদের অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের রুদ্রভাষা প্রথম শোনা গিয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। নীলদর্পণের অগ্নিবর্ষণে নীলকর সাহেবেরা হয়ে উঠেছিল আরও নৃশংস ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ। সদাশয় পাদরী জেম্‌স লঙ্‌ সাহেব মাইকেলকে দিয়ে এর ইংরাজী অনুবাদ করানোয় রাজরোষের উদ্যত খড়্গ নেমে এসেছিল তাঁর মস্তকে। কিন্তু নিপীড়িত, শোষিত জনগণের অন্তরের ধূমায়িত বিক্ষোভ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল নীলদর্পণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শ পেয়ে।

বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষের চিত্তেই সৃষ্টি হল বিপুল আলোড়ন এবং সূচনা হল দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের উন্মাদনা। কবিগানে, ছড়ায়, অভিনয়ে সব কিছুতেই তখন নীলকর অত্যাচার কাহিনী; তার মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এই গান—

"নীল বাঁদরে সোণার বাংলা কল্লে এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল, লং-এর হ'ল কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।"

অবশেষে নীলকরদের অন্যায় অত্যাচারের অবসান হয়েছিল বাংলা দেশ থেকে। তাই নীলদর্পণ শুধু বাংলার শোষিত নীল চাষীদেরই দুঃখদুর্দশার কাহিনী মাত্র নয়, সর্বদেশের সর্বকালের লাঞ্ছিত মানবাত্মার শাশ্বত জীবন-বেদ। দীনবন্ধুই বাংলার সর্বপ্রথম গণ-নাট্যকার। তাঁর পরেও বহুদিন পর্যন্ত আর কোন বাঙ্গালী নাট্যকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নি সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনীর প্রতি।

নীলদর্পণের ভিত্তি বাস্তবতা। প্রত্যক্ষ বাস্তব জ্ঞান নিয়ে অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের দুঃখ বেদনার গাথা শুনিয়েছেন দীনবন্ধু তাঁর নীলদর্পণে। সাধারণ মানুষের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি থাকায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে

তোরাপ, রাইচরণ, ক্ষেত্রমণি, আদুরী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলি তুলনায় নিতান্তই নিষ্প্রভ ও নির্জীব। ভাষাগত ব্যবধানের জন্যই এই পার্থক্য। সাধারণ স্তরের পাত্রপাত্রীর কণ্ঠে সহজ, স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, তা'দের নিজেদের প্রাণের ভাষা; আর উচ্চস্তরের মানুষগুলির ভাষা কৃত্রিম, আড়ষ্ট সাধুভাষা—যা সাধারণ কথোপকথনে হাস্যকর। উচ্চভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে যে সংস্কৃতানুগ উপমা-অনুপ্রাস অলঙ্কারযুক্ত দীর্ঘ উক্তি সমন্বিত সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে তা' নিতান্ত অবাস্তব। নাটকে সাধুভাষা ব্যবহার করায় নাটক হয়ে ওঠে আড়ষ্ট; এই ব'লে আমরা দীনবন্ধু ও তার পূর্ববর্তী রামনারায়ণকে সমালোচনা করতে চাই না, কেননা সেইদিন এইভাবে সাহিত্য-রচনার রীতি স্বীকৃত হয়েছিল এবং এইভাবে সাহিত্য-রচনা সেদিন না করলে রচনা সাহিত্য-পদবাচ্য হতে পারত না। বর্তমানের দৃষ্টিতে তাই সে দিনের উচ্চস্তরের পাত্রপাত্রীদের সাধুভাষা হয়ে পড়েছে আড়ষ্ট। অগ্নিগর্ভ ও বিপ্লবাত্মক বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় নাটক হিসাবেও নীলদর্পণের অবদান বাংলা নাট্য সাহিত্যে অবিস্মরণীয়। পরবর্তী বহু নাটকে এই নাটকের আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী'। এই নাটকের প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত এবং নাটকখানি চিত্তরঞ্জক ও সরস। প্রহসন অংশের ভাষা স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও চটুলতাপূর্ণ। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে যেখানে নাটকের পাত্রপাত্রীগণ সাধু ভাষায় সুদীর্ঘ উক্তি করেছে এবং যেখানে যেখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা ব্যবহার করা হয়েছে, সেই সকল অংশগুলি কৃত্রিমতাপূর্ণ, বিরক্তি-উৎপাদক এবং প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। নবীন তপস্বিনীর রমণীমোহন—তপস্বিনী বিজয়-কামিনী উপাখ্যান এবং জলধর-জগদম্বা-মল্লিকা মালতী বিষয়ক আখ্যান দু'টি একে অপরের সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে লগ্ন হতে পারেনি সেজন্য এই নাটকে নাটকীয় ঐক্যেরও অভাব ঘটেছে।

দীনবন্ধুর তৃতীয় নাটক 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। নাটকটি প্রকৃতপক্ষে প্রহসন; বিবাহ-উন্মত্ত এক বৃদ্ধ বিপত্নীকের

হাস্যোপদ্দীপক কাহিনীই এর বিষয়বস্তু। নাটকটি খুব সরস ও কৌতুকপূর্ণ। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র প্রভাব এই নাটকে অনেক ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট। একই বৎসরে প্রকাশলাভ করে দীনবন্ধুর দ্বিতীয় বিখ্যাত নাটক 'সধবার একাদশী'। ইয়ং-বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং রক্ষণশীল দলের হীন সঙ্কীর্ণতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে দীনবন্ধুর এই অতুলনীয় নাটকে। ইংরাজীতে সুশিক্ষিত এবং ভদ্রবংশজাত নিমচাঁদ অতিরিক্ত মদ্যপায়ী হওয়ায় অধোগামী, কিন্তু তা'র অন্তরে শিক্ষার গৌরব নিবাত প্রদীপ শিখার মত ঋজু,—অকম্পিত; ধর্মাধর্মের জ্ঞান তা'র অধঃপতিত অবস্থার মধ্যেও সদা জাগ্রত। নিমে দত্তই এই প্রহসনের কেন্দ্রবিন্দু, তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে প্রহসনটির রস-পরিমণ্ডল। নিমে দত্তের আপাত হাস্যোদ্দীপক প্রলাপ-ভাষণের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে সুগভীর মর্ম-যাতনা। নিমচাঁদের অসংলগ্ন উক্তি সমূহের কোন কোন স্থানে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে বঞ্চিতের মর্মভেদী হাহাকার—সহানুভূতিতে সমবেদনায় বেদনাপ্লুত হয়ে ওঠে দর্শকচিত্ত তা'র ব্যর্থ জীবনের স্পর্শলাভ ক'রে।

দীনবন্ধুর হাস্যরস wit-এর বুদ্ধিদৃপ্ত শাণিত ব্যঙ্গ নয়, তাঁর হাস্যরস humour-এর অন্তর্নিহিত করুণা ও সহানুভূতিতে সিক্ত। তাই অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ হাস্যরস সৃষ্টি করলেও তার মধ্যে প্রবাহিত হয় অশ্রুর অন্তঃশীলা ফল্গুধারা। দীনবন্ধুর হাস্যরসের প্রয়াসে অনেকে অশ্লীলতা দোষ দেখেছেন, কিন্তু স্থানকালের রুচির বিচারে সে সমস্ত কিছুই অশ্লীল নয়, বরং যুগ-মানসেরই অভিব্যক্তি মাত্র; তাই দীনবন্ধুর সমসাময়িক পাঠক একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া তাঁর লেখায় কোনও অশ্লীলতা দোষ দেখেননি, কারণ তখনকার কালে সেই সকল রঙ্গরস রুচিবিগর্হিত ছিল না।

১৮৬৭ সালে প্রকাশিত 'লীলাবতী' নাটকে নাটকীয় উপাদানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। হাস্যরসের আধিক্য নাটকীয় গতিকে মন্থর করেছে। লীলাবতীতে সমাজসংস্কার-আন্দোলনে তাঁর আন্তরিকতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন। পূর্বের মত উচ্চস্তরের চরিত্রগুলি আড়ষ্ট.

কৃত্রিম ও নৈরাশ্যজনক, পক্ষান্তরে নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি অনেকাংশে স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত।

পরবর্তী নাটক 'জামাই বারিক' (১৮৭২) যদিও একটি প্রহসন তবু এর মধ্যেও করুণ রসের উপাদান ছিল। বগী এবং বিন্দি চরিত্র দু'টি রক্ত মাংসের মানবী হয়ে উঠেছে—তাদের স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে। অভয়কুমারও সজীব। নাটকের মধ্যে রয়েছে এক সাবলীল গতিবেগ। বহু বিবাহ, কৌলিন্য প্রথার কুফল প্রভৃতি প্রতিপাদ্য করা এ নাটকের লক্ষ্য হ'লেও তা' প্রচারধর্মী কখনও হয়ে ওঠেনি নাট্যরস সৃষ্টির গুণে।

'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) দীনবন্ধুর শেষ নাট্য সৃষ্টি। রোমাণ্টিকতাপূর্ণ, অন্য বিষয়ে বিশেষত্বহীন। অনেক স্থানে কৌতুক রস উদ্রেক করার প্রচেষ্টায় নাটকীয় গতি ব্যাহত হয়েছে।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের অবদান অসামান্য। রাজ দরবার থেকে নাটক-অভিনয় এসে পৌঁছেছিল সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতি নিকটে,—তাঁরই ব্যয়-বাহুল্যহীন সামাজিক নাটকের গুণে।

তখন বাগবাজার সখের যাত্রা সম্প্রদায় শর্মিষ্ঠা গীতাভিনয় করার পর—নাটক অভিনয় করার চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু দৃশ্যপট ও পোষাক-পরিচ্ছদের প্রচুর ব্যয় সঙ্কুলান করা তাদের সাধ্যাতীত। তাই অবশেষে তারা গিরিশচন্দ্রের পরামর্শক্রমে অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করল দীনবন্ধুর তৎকালে চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী নাটক 'সধবার একাদশী'—যা'র মধ্যে আড়ম্বর-পূর্ণ সাজপোষাকের কোন প্রয়োজন হবে না।

ইতিপূর্বে ধনীগৃহে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে জাঁক-জমকের সঙ্গে নাটকের অভিনয় হ'ত এবং দর্শক হিসাবে সাধারণত উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য লাভ করতেন কেবলমাত্র উচ্চবিত্ত ধনিক শ্রেণী এবং পদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ—জনসাধারণ সেখানে ছিল প্রবেশাধিকার বঞ্চিত, অপাঙ্‌ক্তেয়। সাধারণ মানুষের নাট্যরসপিপাসা পরিতৃপ্ত করার জন্য প্রথম দেখা দিল দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নাট্যাভিনয়। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকেই হ'ল সাধারণ নাট্যশালা-স্থাপনের শুভ সূচনা। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে দীনবন্ধুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ-পত্রে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"………যে সময়ে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত, কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজ-চিত্র 'সধবার একাদশীতে' অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া "ন্যাশন্যাল থিয়েটার" স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

এই 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায় The Baghbazar Amateur Theatre নামে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে ৺শারদীয়া পূজার রাত্রিতে বাগবাজার মুখুজ্যে পাড়ার ৺প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে সধবার একাদশীর প্রথম অভিনয় করেন। নটশ্রেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এই নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হন। তাঁর অপূর্ব অভিনয় দেখে দর্শকবৃন্দ যথেষ্ট আনন্দলাভ করেছিলেন। প্রথম অভিনয়েই তাঁর ভাবী কালের অলৌকিক নাট্য প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল এবং রাতারাতি তিনি সুঅভিনেতার বহু-বাঞ্ছিত সম্মানে ভূষিত হন।

গিরিশচন্দ্রের এই প্রথম অভিনয়-এর সম্পর্কে পরবর্তী কালে প্রশংসামুখর অমৃতলাল বসুর কণ্ঠে শোনা যায় স্তুতি বাচন—

> "মদে মত্ত পদতলে
> নিমে দত্ত রঙ্গ স্থলে,
> প্রথমে দেখিল বঙ্গ
> নব নট গুরু তার।"*

হাইকোর্টের বিচারক স্বনামধন্য সারদাচরণ মিত্র উক্ত অভিনয় দেখে কিরূপ মুগ্ধ হয়েছিলেন তা' ১৩২১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শনে তাঁর 'দীনবন্ধু মিত্র' নামক প্রবন্ধ থেকে জানতে পারা যায়।

* নাট্য মন্দির, ৩য় বর্ষ, ১৯৩৯ খৃঃ অব্দ।

তিনি লিখেছেন—

"১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরস্বতী পূজার রাত্রে কলিকাতায় শ্যামবাজারের রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে আমি 'সধবার একাদশী'র অভিনয় প্রথম দেখি, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা নব্য ধরণের নাটকের সৃষ্টিকর্তা; সেদিন কবিবর 'গিরিশ' স্বয়ং নিমচাঁদ। সধবার একাদশী পূর্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সে দিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষতঃ নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম।........সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধ হয় কখনও ভুলিব না। সেই রাত্রি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইল, অভিনয়ের নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল।"

এই নাটকের চতুর্থ অভিনয় যখন দেওয়ান ৺রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের শ্যামবাজারের বাটীতে অনুষ্ঠিত হয় তখন স্বয়ং নাট্যকার তা'তে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ান্তে দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভা দর্শনে এরূপ মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, গিরিশবাবুকে বলেন, "তুমি না থাকলে এ নাটক অভিনয় হত না। নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যেই লেখা হয়েছিল।" অর্ধেন্দু বাবুকে তিনি বলেন—"জীবনের অটলকে লাথি মেরে যাওয়া (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) improvement on the author." গিরিশবাবুর পরলোকগমনের পরদিনের 'Bengali'তে প্রকাশিত হয়েছিল—"About forty five years ago Girish Chandra appeared in the inimitable role of Nimchand in Dinobondhu's 'Sadhabar Ekadashi' and when he awoke the next morning, he found himself an actor."

নাট্যামোদী জনসাধারণ 'সধবার একাদশী'র অভিনয় দেখে অপরিসীম আনন্দ লাভ করল এবং অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের সঙ্গে অভিনন্দিত করল এই নব প্রচেষ্টাকে। কিন্তু এই অভিনয়ের এত সুখ্যাতি, এত জনপ্রিয়তা লাভের কারণ কি? এই নাট্যাভিনয়ের মধ্যে এমন কি অভিনব বস্তু ছিল যে চারদিক ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল! তাদের না ছিল রাজ-রাজড়াদের অভিনয়ের ন্যায় চোখ-ঝলসান পোষাক-পরিচ্ছদ,—না ছিল কোন আলোর কেরামতি,

দৃশ্যপটের চমৎকারিত্ব প্রভৃতি বিপুল আড়ম্বর। তবে কোন শক্তিতে সে দিনের সহায়-সম্বলহীন যুবকদের অভিনয় এত সাফল্যমণ্ডিত হ'ল ?

রাজাদের নাট্যশালায় সর্বাঙ্গীণ জৌলুস ব্যতীত অভিনয়-পদ্ধতিও ছিল পাশ্চাত্য ধারার অনুসারী। প্রিয়নাথ দত্ত, কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতির ন্যায় সে সময়ের অভিনেতৃগণ ইংরাজ নাট্য শিক্ষকের নিকট অভিনয় শিক্ষালাভ করেছিলেন। সেকস্‌পীয়ার নাটকের অধ্যাপক Richardson ছাত্রদের সেকস্‌পীয়ারের নাটকাভিনয় সম্পর্কেও শিক্ষা দান করতেন। তিনি শিক্ষা দিতেন কিভাবে বাঙ্গালী ছাত্রগণ নিভুর্ল ইংরাজী উচ্চারণ, এবং সেকস্‌পীরীয় ছন্দ বজায় রেখে নিখুঁতভাবে আবৃত্তি করতে পারে ; তিনি লক্ষ্য রাখতেন শিক্ষার্থীগণ যা'তে Modulation বা স্বর-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। Richardson, Wilson থেকে আরম্ভ করে Herman Jeffroy, Mrs. Elis, Clinger প্রভৃতি ইংরাজ নাট্য শিক্ষকগণ pantomimic action, hermonic Poise, poses, gesture প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থী অভিনেতাদের শিক্ষা দিতেন। সে সময় অভিনেতাদের চলাফেরা, দাঁড়ান, বসা সব কিছুই করতে হ'ত ছবির মত নিখুঁত। ইংলণ্ডে তখন Mid-Victorian Periodএর ও Elizabethian যুগের বিভিন্ন ভাব-প্রকাশক মুদ্রার প্রচলন ছিল। Greek প্রতিমূর্তি দেখে Roman Senator দের বক্তৃতা করার ভঙ্গীর বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি দেখে ইংরেজ বক্তারা পার্লামেণ্টে সেই ভঙ্গীতে বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করতেন, অভিনয়ের মধ্যেও সেরূপ একটা বিশিষ্ট শৈলী অনুসৃত হত সে সময়কার ইংলণ্ডে।

যাঁরা সে সময়কার ইংলণ্ডে প্রচলিত gesture, posture এবং বিভিন্ন মুদ্রা সম্বন্ধে জানতে আগ্রহশীল তাঁরা Oxford University Press কর্তৃক প্রকাশিত B. L. Joshep রচিত "Elizabethian Acting" নামক বইটি দেখতে পারেন। এই গ্রন্থের মধ্যে যে সমস্ত হাতের বিভিন্ন মুদ্রার চিত্র দেওয়া হয়েছে সেগুলো John Bulwar-এর 'Chirologia and Chironomia' (1644) গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

এই এলিজাবেথীয় যুগের অভিনয়-রীতিতেই বাংলাদেশের ইংরাজ নাট্য শিক্ষাদাতাগণ শিক্ষিত ছিলেন এবং তারই প্রতিফলন দেখা যায়, উচ্চ ধনীক

শ্রেণীর গৃহসংলগ্ন রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয়ের সময় এদেশীয় অভিনেতাদের অভিনয়ের মধ্যে। সে অভিনয় ছিল সম্পূর্ণ আঙ্গিক এবং বাচিক অভিনয়— ভাবের অভিব্যক্তি তার মধ্যে দেখা যেত বটে, কিন্তু তা' প্রাণময় হয়ে উঠত না। এই সকল নাট্যাভিনয়ের বহিরঙ্গ ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক এবং বিস্ময়কর, কিন্তু অন্তরঙ্গ দিক ছিল অত্যন্ত দুর্বল। অতি সাধারণ স্তরের লোকেদের দ্বারা অভিনীত জাঁকজমকহীন নাট্যাভিনয়েব মধ্যে চটক খুঁজে পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু তা' হয়েছিল প্রাণস্পর্শী-চিত্তজয়ী—কারণ এই অভিনয়ের মধ্যে কোন "Grand Style" ছিল না—এই অভিনয় ছিল রসের অভিনয়— ভাবের অভিনয়। একদিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে অলৌকিক ভাব-অভিনয় প্রদর্শন করেছিলেন এবং কালে তা' নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই রসঘন ভাবের অভিনয়ই পুনরায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল বাগবাজার নাট্য সমাজের 'সধবার একাদশী' অভিনয়ের মধ্যে। তাই তা' অত সহজে, অনায়াসে দর্শকের অন্তরকে দ্রবীভূত করতে পেরেছিল। কিন্তু সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের সকলেই প্রায় ছিলেন অর্ধ শিক্ষিত—গিরিশচন্দ্রের বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষা কিছু ছিল না,—তবে বাড়িতে পড়াশুনো করে তিনি জ্ঞান-আহরণের চেষ্টা করতেন; অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) প্রভৃতিও তেমন কিছু শিক্ষিত ছিলেন না; তবে তাঁদের পক্ষে ঐরূপ আভিনয়িক রূপদান বা অসাধ্য সাধন কি করে সম্ভবপর হল? এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই দেখা যায় 'সধবার একাদশী'র প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি এই রসের অভিনয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন পাথুরিয়াঘাটের রাজবাড়ীতে বিভিন্ন অভিনয়ের মধ্যে। পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর ছোট রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভরতের নাট্য-শাস্ত্রের রস এবং ভাব-বিষয়ক অধ্যায়টির সুন্দর ও সুবিস্তৃত ব্যাখা করে বহু চিত্রে শোভিত ইংরাজীতে একটি মনোরম গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিনীর মধ্যে যে ভাবঘন রসময় দিকটি রয়েছে সে বিষয়ে গবেষণা এবং শিক্ষাদান করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন Hindu College of Music এবং বিভিন্ন স্থানের বিখ্যাত ওস্তাদদের নিয়ে এসে তাঁদের উপর এই কলেজের অধ্যাপনার ভার অর্পণ করেন। ভারতবর্ষে

সংগীত শিক্ষার বিষয়ে এই হ'ল প্রথম কলেজের প্রতিষ্ঠা। এই Collegeএ তাঁর পুস্তকটিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয়েছিল এবং এই বহুমূল্য গ্রন্থটিকে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, উচ্চশ্রেণীর লোকেদের নিকট, পদস্থ ইংরাজ রাজ-কর্মচারীদের নিকট, এমন কি, ইংলণ্ডের বহু স্থানেও উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। ভারতীয় রসতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং তার উপযুক্ত প্রচারের জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াসের কথা আজ অনেকেই জানেন না। তিনি তখন এই বিষয়ে অজস্র অর্থব্যয় করেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটারের মধ্যেও তিনি এই রস ও ভাবকে প্রধানতঃ গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিলেন অভিনয় বিষয়ে।

এই সৌরীন্দ্রমোহনের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন অর্ধেন্দুশেখর। তাই তাঁর পক্ষে রসের অভিনয় আয়ত্ত করা হয়ে উঠেছিল অতি সহজ। এই নাটকের প্রধান চরিত্রাভিনেতা গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনি বাল্যকাল থেকে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতির অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং নিবিড়ভাবে তিনি বহু যাত্রা, কথকতার রসাভিনয় অন্তর দিয়ে আস্বাদ করেছিলেন। বিশেষ করে, সেই কথকতার প্রভাবই গিরিশচন্দ্রের অভিনয় ধারার মধ্যে অজ্ঞাতসারে এনে দিয়েছিলেন রসের অভিনয় বা ভাব অভিনয়ের আদর্শ। কথকতা খুবই কঠিন। একই ব্যক্তিকে একই সময় ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ও রসের অবতারণা করে অভিনয় করতে হয়। গিরিশচন্দ্র নিজেও খুব সুন্দর কথকতা করতে পারতেন। একদিন তিনি সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার কেদারনাথ চৌধুরীর বাড়িতে ধ্রুবচরিত্রের 'কথা' বলেন। বিভিন্ন রসে এবং বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রত্যেক চরিত্রের বিভিন্ন অভিনয়ে সেদিন শ্রোতাদের সকলেই এক অনির্বচনীয় আনন্দানুভব করেছিলেন। এই সকল শ্রোতার অনুরোধে গিরিশবাবু পরে 'ধ্রুবচরিত্র' নাটক রচনা করেন।

সধবার একাদশীতে 'কুমুদিনীর' ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী শক্তিশালী নট অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) ছিলেন স্বভাব-অভিনেতা। অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতারূপে পরবর্তীকালে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব ও যশ অর্জন করেন। ভাব-অভিনয় ছিল তাঁর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত—অত্যন্ত স্বাভাবিক

ভাবেই উৎসারিত। তাঁর অভিনয় সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখে গেছেন—'বেলবাবুর অভিনয়ে লোকে বেলবাবুকে খুঁজে পেত না, দেখতে পেত তাঁর অভিনীত চরিত্রটিকে !'

এই সকল বিভিন্ন কারণে অর্ধশিক্ষিত হলেও ঐ সব অভিনেতাদের ভাবের অভিনয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁদের অভিনয় প্রকৃত রসের অভিনয় হয়ে উঠতে পেরেছিল।

যাই হোক 'সধবার একাদশী'র অসামান্য সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অর্ধেন্দুশেখর প্রমুখ প্রতিভাশালী অভিনেতা ও নাট্যামোদীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় National Theatre, এবং নীলদর্পণকে নিয়েই এখানকার দ্বার-উদ্ঘাটন। এই নাট্যশালাতেই সর্বপ্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করল দেশের বিত্তমর্যাদাহীন নাট্যরসপিপাসু জন-সাধারণ। সাধারণ রঙ্গালয়ে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণের' অভিনয় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিল এবং সৃষ্টি হয়েছিল দেশব্যাপী অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা।

সাধারণ মানুষের সাথে সাথে বহু খ্যাতিমান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দৃষ্টিও তখন এইদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের উপর বহু লোকের সহানুভূতি উদ্রেক হওয়ায় এর ভিত্তিভূমিও হয়ে উঠেছিল দৃঢ় সংঘবদ্ধ—স্থায়িত্বের সম্ভাবনাপূর্ণ। নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দর্শনকালে শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটিজুতো-ছুঁড়ে-মারার কাহিনী আজ কারোরই অবিদিত নেই। সাধারণ রঙ্গালয়ের গৌরববৃদ্ধি এবং ভিত্তিকে দৃঢ় করার বিষয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকের দান তুলনাহীন এবং নিঃসংশয়ে স্বীকৃত।

দীনবন্ধুর পর এক প্রতিভাশালী নাট্যকার বাংলা নাট্যজগতে আবির্ভূত হলেন—তিনি মনোমোহন বসু। বাংলা নাট্যধারাকে এক নূতন খাতে তিনি পরিচালিত করেছিলেন। অনেকে বলেন, মনোমোহন ছিলেন পুরাতন যাত্রা প্রভৃতির রীতির সঙ্গে তদানীন্তন পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে রচিত নাটকের সেতুবন্ধনকারী। তাই তিনি আধুনিক নাটকে অধিক সংখ্যক গান সংযোগ করেছিলেন। এর কারণ তাঁর নাটক-রচনার একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য

আছে। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন গান ছাড়া বাংলা নাটক হতে পারে না,—গানময় এ দেশে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কিছুতে ধ্বনিত হয় গানের সুর। বাঙ্গালীর অন্তর-রাজ্য গীতিময়তায় পূর্ণ। ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রথম বার্ষিক উৎসবে মনোমোহন বাঙ্গালী নাট্যকারগণের নাট্যাদর্শ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছিলেন,—

তিনি বলেছিলেন—"আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয় কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্যেই গান নইলে চলে না,····· সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে?······আমরা চাই, দেশে পূর্বে যাহা ছিল; তাহা ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে সংশোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।"

মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যখন ইংরাজী ধারার প্রচলন সুরু হয়ে গেছে, পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ ব্যতীত ভাল বাংলা নাটক রচিত হতে পারে না ব'লে যখন অনেক নাট্যকারের অভিমত, সেই সময় বাংলা নাটকের ধারার গতিপথকে সম্পূর্ণ অন্যদিকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন মনোমোহন। তিনি বাঙ্গালীর মানসিক গঠন এবং তার সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে এক নূতন ধারার প্রবর্তন করলেন। তা' ঠিক যাত্রাও না, অথচ তৎকালীন নাটকের মতও নয়। সংগীতের আধিক্য থাকায় তাঁর নাটককে 'গীতাভিনয়' বা 'অপেরা' নামে অভিহিত করা হয়।

মনোমোহন বসুর প্রথম নাটক 'রামাভিষেক' (১৮৬৭) তার সংগীতাধিক্যের জন্য জনসমাজে যথেষ্ট প্রিয় হয়ে উঠেছিল। পৌরাণিক নাটক

'রামাভিষেক' করুণ রসে সিক্ত। কিন্তু এই নাটকে প্রাচীনকালের কৃষকদের মুখে বর্তমানকালের পূর্ববঙ্গীয় ভাষা ব্যবহার করায় রসাভাব-দোষ সৃষ্টি হয়েছে। কৌতুক রস সৃষ্টির জন্যই অবশ্য মনোমোহন ঐরূপ কালের স্বীকৃতিকে লঙ্ঘন করতে চেয়েছিলেন।

এর পর রচিত হয় মনোমোহনের 'প্রণয় পরীক্ষা' নামক সামাজিক নাটক (১৮৬৯)। নাটকটি রোমান্টিক ধর্মী, কাহিনীর ঘটনা-বিন্যাসে কল্পনা-শক্তির স্বাক্ষর প্রতীয়মান।

নটবরের পাগলাটে চরিত্র সৃষ্টিকে কেউ কেউ প্রথম এই ধরণের চরিত্র পরিকল্পনারূপে অভিহিত করে থাকেন এবং পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের নাট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই চরিত্রের প্রভাব বহুলভাবে অনুভূত হয় বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে মনোমোহনের বহুপূর্বেই মাইকেল উন্মাদ অপ্রকৃতিস্থ চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে নাটকীয় গুণকে জটিল করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ভীমসিংহের শেষ অবস্থার চিত্রাঙ্কনে। ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং এই চরিত্রটি তাঁর এত ভাল লাগে যে তাঁর নাট্য-রচনার কালে এই চরিত্রের দ্বারা বারবার তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

'সতী' (১৮৭৩) নাটক মনোমোহনের শ্রেষ্ঠ রচনা। দেবলীলা বিষয়ক নাটক হলেও বাস্তব জগতের স্পন্দন এর মধ্যে অনুভূত হয়। শান্তিরাম চরিত্র প্রাণবন্ত। তার সরস ছড়া ও ভাবভঙ্গী হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। 'সতী'র ভাষা অন্যান্য নাটক অপেক্ষা সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ। সতী নাটকটিকে বিয়োগান্ত এবং মিলনান্ত উভয় প্রকারেই অভিনয়ের উপযোগী করে রচনা করেছেন নাট্যকার।

মনোমোহনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাট্যসৃষ্টি 'হরিশচন্দ্র' (১৮৭৫)। এই পৌরাণিক নাটকখানি মৌলিকতাপূর্ণ এবং জাতীয় ভাবোদ্দীপক গানে সমৃদ্ধ। অভিনয়-কালে এই নাটকটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

মনোমোহনের নাটকগুলি যাত্রারূপেও অভিনীত হ'ত, নাট্য সম্পদপূর্ণ, গীতাধিক্য-সমৃদ্ধ মনোমোহনের নাটকগুলি প্রধানতঃ গীতাভিনয় বা অপেরা

নামে বাংলার নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে নবধারার স্রষ্টারূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। মনোমোহনের নাট্যধারার আদর্শ গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে পরবর্তীকালে সার্থক পরিণতি লাভ করেছিল।

'হরিশচন্দ্র' নাটকের ৪র্থ অঙ্কে কাশী মণিকর্ণিকার ঘাটে ভিক্ষুকে পরিণত রাজা হরিশচন্দ্র, শৈব্যা ও নিদ্রিত রোহিতাশ্ব অবস্থিত।

রোহিতাশ্বের নিদ্রাভঙ্গ হ'লে সে কাতরস্বরে বলে উঠল, "ও মা! বড় ক্ষুধা পেয়েছে—কিছু খেতে দেও না মা!" পুত্রের এই কথায় অসহায় পিতার অন্তরে তপ্ত শলাকা এসে বিদ্ধ হ'ল; হরিশ্চন্দ্র উন্মাদের ন্যায় বিলাপ করতে করতে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, এমন সময় নেপথ্য থেকে ভেসে এল গানের সুর।

(নেপথ্যে-গীত)

রাগিনী ভৈঁরো—তাল একতালা।

মিছে আর কেন, মানো অপমানো,
দূরে যারে লোক লাজ্!
প্রাণাধিকো প্রাণো, দয়িতা নন্দনো,
দহে অনশনো দহনে আজ্!
ওরে দর্প! তব, বৃথা উচ্চরবো,
হ'লি পরাভবো, হৃদয়ে মাঝ্!
সম্ভবো গৌরবো, পূর্ব্ব স্মৃতি ভাবো,
পড়ুক সে সবো, মস্তকে বাজ্! ১॥
আয়রে নিয়তি! নীচতা সংহতি;
কাকুতি মিনতি! সাজরে সাজ্!
কোথা, মা ভারতি! রসনারে স্তুতি,
শিখায়ে সম্প্রতি, সাধ মা কাজ্! ২॥

মনোমোহন এই যে নেপথ্য সংগীতের প্রয়োগ করেছিলেন নাটকের মধ্যে, সে পদ্ধতি মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী ছিল না বলে

পরবর্তী নাট্যকারগণ কর্তৃক এই নেপথ্য গীত খুব কমই ব্যবহৃত হয়েছে। যাত্রায় যখন জুড়িগান আরম্ভ হত, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তখন আসরে বসে পড়তেন এবং গান হয়ে গেলে আবার তাঁরা অভিনয় আরম্ভ করতেন। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে এই নেপথ্য-সংগীত সম্পূর্ণ অনুপযোগী ; কারণ নেপথ্যে যখন গান হচ্ছে তখন মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অবস্থিতি কিরূপ হবে? সমগ্র নেপথ্য-গীতের সময় নটনটীরা কি মঞ্চের উপর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবেন, অথবা ঘোরাফেরা ও নানারূপ মূকাভিনয়ের আশ্রয় নেবেন? অতক্ষণ ধরে কোন মূকাভিনয় চলতে পারে না। হরিশ্চন্দ্রের স্বগত উক্তি একমাত্র জুড়িগণের মাধ্যমে ব্যক্ত হতে পারে। কারণ জুড়ীরা অভিনীত চরিত্রের উক্তি হিসেবে গান করতেন। এইরূপ নেপথ্য-সংগীত ও অভিনয় মঞ্চের উপর দর্শকদের কাছেও বিসদৃশ বলে মনে হবে। তাই এই অবৈজ্ঞানিক রীতি নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে গৃহীত হ'ল না এবং পরবর্তী নাট্যকারগণও এই নেপথ্য-সংগীত বর্জন করলেন।

চরিত্রের অভিনয়ে যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁরা অনেকে সুগায়ক ছিলেন না, সুতরাং তাঁদের হয়ে বকলমে জুড়িরা গান করে তাঁদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। এই জন্য জুড়িদের বলা হত মোক্তার এবং তাঁদের মোক্তারের মত সাজপোষাকও পরানো হ'তো।

মনোমোহনের স্বাদেশিকতা তাঁর নাটকের স্থানে স্থানে পরিস্ফুট হয়েছে। হরিশ্চন্দ্র নাটকের অনেক জায়গায় এই জাতীয় ভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। ৫ম অঙ্কে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মন্ত্রীর কথোপকথনের সময় বিশ্বামিত্র যখন প্রশ্ন করলেন—"শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ"? মন্ত্রী উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে তা'তেও আমাদের ভয়ানক দুরবস্থা। প্রভু জানেন, ভারতের তন্তুজাত কৌষেয় আর সূত্রবসনেই সমস্ত সভ্যজাতি সজ্জিত হতো ; কিন্তু হায়! আজকাল ভারতের সেই অসংখ্য তন্তু নিস্তব্ধ—সে সব কেবল ইন্ধন কাষ্ঠ হয়ে পড়ে রয়েছে! প্রভু বলতে লজ্জা করে, এখন তুঙ্গদ্বীপ হতে বস্ত্র এসে ভারতের সজ্জারূপে লজ্জা নিবারণ কর্চ্ছে! আজ যদি সেই বস্ত্র আসা বন্ধ হয় কাল পরিধেয় বসনের জন্য দেশে হাহাকার পড়ে যায়।

"আমাদের কর্মকার শ্রেণী কেবল সামান্য কুদ্দাল, নিড়ান, হাতা, বেড়ী লাঙ্গলের ফাল প্রভৃতি গোটাকতক স্থূল কর্মেই যা কিছু নিযুক্ত আছে, নচেৎ যত সূক্ষ্ম কারু তুঙ্গদ্বীপ হতেই এখানে আনীত হচ্ছে।......বৎসর বৎসর এ দেশের কোটী কোটী মুদ্রা লভ্যস্বরূপ নানা কৌশলে তুঙ্গদ্বীপে চলে যাচ্ছে। তা'তে দেশ ক্রমে নিতান্ত নির্ধন হয়ে পড়ছে!"

এই সময়ে গীত। একটি নেপথ্য সংগীতের মধ্যেও মনোমোহনের স্বাদেশিকতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। গানটি এইরূপ—

দিনের দিন, সবে দীন, হ'য়ে পরাধীন্।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনুক্ষীণ্!
সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভূমে,
পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য-বংশ, সগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা রাহু-মুখে লীন্? ইত্যাদি—

হরিশ্চন্দ্র নাটকে মনোমোহন তাঁর স্বাদেশিকতাবশত যে কালের চিত্র অঙ্কন করেছেন, সেটা তাঁর নিজেরই সমসাময়িক কালের চিত্র। ইংরেজ শাসনে হতমান, লাঞ্ছিত, দৈন্য পীড়িত ভারতীয়গণের অবস্থাই যেন এর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রের কালের সঙ্গে এই বর্ণিত সময়ের কোন মিলই নেই। এইভাবে মনোমোহন জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের উদ্বোধন করতে গিয়ে কাল-ব্যতিক্রম-দোষ ঘটিয়ে ফেলেছেন তাঁর নাটকের মধ্যে।

ইয়ং বেঙ্গলের পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতি মোহান্ধতা ক্রমশঃ কমে এল—উচ্ছৃঙ্খলতা, যথেচ্ছচারিতা হ'ল মন্দীভূত। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষময় ফল, অন্যত্র আবার অমৃতময় হয়ে উঠতে লাগল। আত্মবিস্মৃতির আবরণ ভেদ করে জাতীয়তা-বোধের সূর্যালোকে অন্তরের তমিস্রা ক্রমশঃ অপসারিত হল। পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে এবং হিন্দু মেলা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতা উদ্বোধিত হল এবং সেই জাতীয় নব জাগরণের সময়ে

এলেন একজন জাতীয়তাবাদী ও শক্তিশালী নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর নাটকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ। এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পথিকৃৎ। সংস্কৃত প্রভাব থেকে তাঁর নাটক প্রায় মুক্ত। চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে বহুক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতী এবং প্রহসনের মধ্যে অলাকবাবু, কিঞ্চিৎ জলযোগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মলিয়ারের দুটি নাটকের অনুবাদ 'হঠাৎ নবাব' ও 'দায়ে পড়ে দার পরিগ্রহ' এবং কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের অনবদ্য অনুবাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের আসন দান করেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতাপূর্ণ সংগীত সংযোজিত করেছিলেন এবং তন্মধ্যে "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" প্রভৃতি গান সে সময় খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই আদর্শ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক সমূহকে প্রভাবান্বিত করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকেও তাই আমরা স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক সংগীত ও দৃশ্য-সমাবেশ দেখতে পাই। তাঁর নাটকস্থিত বহু গানও পরে জাতীয় সংগীত রূপে সম্মানিত হয়েছিল।

গীতিমুখর, ভক্তিরসাশ্রিত গীতাভিনয়ের যে উৎসের সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম মনোমোহন বসুর নাট্যপ্রচেষ্টার মধ্যে সেই উৎসমুখ হতে নির্গলিত প্রবাহ ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল বহু নাট্যকারের মিলিত উদ্যোগে। তাঁদের মধ্যে মতিলাল রায়, ব্রজমোহন রায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির প্রচেষ্টা স্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রতিভার আলোকেই এই গীতাভিনয়ের যাত্রা-পথ অনেকটা আলোকিত হয়ে উঠেছিল এবং গিরিশচন্দ্রের মধ্যেই এই অভিযানের পূর্ণ-পরিণতি।

গানের সুরে বিভোর এই বাংলাদেশে এ সমস্ত গীতাভিনয় সাগ্রহপোষকতা লাভ করায় সুযোগ্য এবং অযোগ্য বহু নাট্যকারের রচনায় এই বিভাগ প্রায় ভরে গিয়েছিল ; কিন্তু তার মধ্যে অধিকাংশই অনুল্লেখ্য। রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম এই সমস্ত নাট্যকারদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

'হরধনুভঙ্গ', 'রামের বনবাস', 'অনলে বিজলী', 'তরণী সেন বধ', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'নরমেধ যজ্ঞ', 'বামনভিক্ষা', 'হরিদাস ঠাকুর' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক রাজকৃষ্ণের স্মরণীয় রচনা। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে 'প্রহ্লাদ চরিত্রের' অভিনয় সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছিল, কিন্তু নাটকীয় উৎকর্ষের বিচারে 'অনলে বিজলী'র ভাগ্যেই সমালোচকের দুর্লভ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল। রাজকৃষ্ণ রায়ের নাট্য-প্রতিভা অনস্বীকার্য, কিন্তু মৌলিকতার আলোকে তা' মোটেই উজ্জ্বল ছিল না।

প্রাবন

চন্দ্রের আকর্ষণে যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বারিরাশি, তেমনই গিরিশ-চন্দ্রের অসাধারণ নাট্য-প্রতিভার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বাংলা নাটকের চলমান স্রোতোবেগ। নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব বাংলা নাটকের ইতিবৃত্তে অবিস্মরণীয় ঘটনা। গিরিশচন্দ্রের নাট্যসৃষ্টির অজস্রতায়, শক্তির বিপুলতায় এবং সর্বতোমুখী প্রতিভার বিচিত্র অবদানে বাংলা নাট্য-সাহিত্য কৈশোরের অপরিণত চাপল্যের অবসানে লাভ করল যৌবনের সুগঠিত, সুঠাম, পরিণত সুষমা,—বাংলা নাট্য-প্রবাহের ক্ষীণ সূত্র হয়ে উঠল পরিপুষ্ট, প্রাণ-ধর্মে সতেজ, উদ্বেলিত। বাংলা নাট্য-আন্দোলনের ক্রমবিবর্তিত ইতিহাসেরই অবদান—গিরিশচন্দ্র। দীনবন্ধু, মনোমোহন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর-বহনকারী সামাজিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাট্যধারা গিরিশচন্দ্রের মধ্যে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছিল; তাঁর মৌলিকতার স্পর্শে নাটকের এই সমুদয় বিভাগ হয়েছিল বিশিষ্টতায় অভিমণ্ডিত। নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্রের আগমনের সাথে সাথে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে নাট্যামোদী দর্শক সাধারণের অতৃপ্ত অন্তর-বাসনা—পরিতৃপ্তির মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। রাজবাড়িতে বিচরণশীলা নাট্যলক্ষ্মীকে কিরূপে সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য তাদের সাধ্যের কাছাকাছি আনা যায়, সেই চিন্তাই একদিন অঙ্কুরিত হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের সহানুভূতিশীল, দরদী অন্তরে। সেই নবাঙ্কুরই পরবর্তীকালে পুষ্পিত, পল্লবিত হয়ে পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশে সাধারণ নাট্যশালার ছায়াশীতল মহীরুহে। গিরিশচন্দ্র প্রথমে ছিলেন প্রধানতঃ নট, এবং অভিনয়-শিক্ষক; তারপর তিনি এসেছিলেন রঙ্গালয়ের সংস্কারক এবং পরিচালকরূপে; কিন্তু পরিপূর্ণ নাট্যকাররূপে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল আরও অনেক পরে,—দ্বিধা-সংশয়ের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভীরু

পদক্ষেপে। পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা তাঁর কাছে ছিল কল্পনাতীত এবং ভীতিপ্রদ ব্যাপার। তাই সুহৃদ্‌গণের অনুরোধে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে গান, প্রস্তাবনা, গীতাভিনয়ের উপযোগী ক্ষুদ্র নাটিকা প্রভৃতি রচনা করেছেন, কিন্তু নাটক রচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে তিনি প্রথমে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি।

নিতান্ত নিরুপায় ভাবে তাঁকে নাটক-রচনায় ব্রতী হ'তে হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের নাট্যশালা সংস্কারক ও সংগঠক জীবনের সঙ্গে তাঁর নাট্যকার-জীবন বিশেষভাবে বিজড়িত। নাট্যকার-জীবন আরম্ভের পূর্বে গিরিশচন্দ্র নানাভাবে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষা তাঁর বেশি দূর অগ্রসর না হলেও জ্ঞানপিপাসার তীব্রতা তাঁর মধ্যে ছিল অপরিসীম এবং বিস্ময়কর। নানা বিষয়ক গ্রন্থপাঠ তাঁর কাছে অতি প্রিয় ছিল, এমন কি শারীরবিদ্যা, চিকিৎসা-শাস্ত্রের মধ্য থেকেও তিনি জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। বাল্যকালে খুল্লপিতামহীর নিকট রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনতেন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে, লোকশিক্ষার অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায় যাত্রা, কথকতা, কবিগান, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি ছিল তাঁর কাছে অতি প্রিয় বস্তু। যাত্রা, কথকতা থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ গ্রন্থরাজি থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যে গিরিশচন্দ্র, তাঁকে আমরা দেখেছি মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ারের অমর নাটকাবলীর মধ্যেও সমাধিস্থ হ'তে। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তিনি নাটক-রচনার বহু পূর্বে।

এইভাবে বহু ধৈর্য, অধ্যাবসায়, বহু সাধনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমীক্ষার মধ্য দিয়ে নাটক রচনার প্রাঙ্গণতলে তাঁর মৃদু গতিতে সলজ্জ আগমন। নিজের মধ্যে যে নাট্যকারের অসাধারণ প্রতিভা বিরাজমান—একথা তাঁর কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত যিনি নিজের শক্তির সত্যকার পরিচয় জানতেন না, তিনি তাঁর উপর আস্থাই বা রাখবেন কি করে? তাই তাঁর মধ্যে লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশের চেয়ে আত্মগোপনের চেষ্টাই বেশি—তাই তাঁর প্রাথমিক কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয় 'মুকুটাচরণ' ছদ্মনামে।

বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারের 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করে রাতারাতি বিখ্যাত নটের সম্মান অর্জন করার পর গিরিশচন্দ্রকে আবার দেখা যায় 'লীলাবতী'র ললিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। এবারেও এদের 'লীলাবতী' সুযশ অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্ররা ইতিপূর্বে যে অভিনয় করেছিলেন তার চেয়ে অনেক ভাল অভিনয় হওয়ায় দীনবন্ধু প্রীত হয়ে বলেছিলেন, "এবার চিঠি লিখবো ভুয়ো বঙ্কিম"।

গিরিশচন্দ্রের মুখে তাঁর কবিতার অপূর্ব আবৃত্তি শুনে দীনবন্ধু অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। ১৮৭১ সালে জুলাই মাসে এই অভিনয়কালে বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার প্রথমে ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল এবং পরে ন্যাশন্যাল থিয়েটার নামে পরিবর্তিত হয়।

ন্যাশন্যাল থিয়েটার সম্প্রদায় 'লীলাবতী'র পর যখন 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের জন্য মহলা দিতে আরম্ভ করেন, তখনই তাঁরা টিকিট বিক্রয় ক'রে থিয়েটার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মতান্তর হয়। টিকিট বিক্রয় ক'রে থিয়েটার করা বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের ঘোরতর অমত ছিল। ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম দিয়ে, ন্যাশন্যাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ সরঞ্জাম ব্যতীত দর্শক সাধারণের কাছে টিকিট বিক্রয় ক'রে অভিনয় করা গিরিশচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি। অবাঙ্গালীরা ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম শুনে টিকিট ক্রয় ক'রে অভিনয় দেখতে এসে এর উপকরণের দৈন্য দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করবে বলেই গিরিশচন্দ্র মনে করেছিলেন।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অমত সত্ত্বেও সম্প্রদায়ের অন্যান্য সকলে মিলে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করলেন জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের দিনপঞ্জীতে ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর একটি দুর্লভ দিবস। ঐদিন মহাসমারোহে 'নীলদর্পণ' নাটক প্রথম অভিনীত হয় সাধারণ রঙ্গালয়ে। গিরিশচন্দ্র তখন এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন নি। পরপর কয়েকটি নাটক অভিনীত হ'বার পর নূতন কোন ভাল নাটক না পাওয়ায় 'কৃষ্ণকুমারী' নাটককেই তার উৎকর্ষের জন্য অভিনয় করার সিদ্ধান্ত

করল এই সম্প্রদায়। ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য গিরিশচন্দ্রের চেয়ে ভাল কোন অভিনেতা না পাওয়ায় সকলে পুনরায় এসে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন গিরিশচন্দ্রকে এই ভূমিকাটি গ্রহণ করতে। বাল্যবন্ধুগণের অনুরোধ এড়াতে না পেরে গিরিশচন্দ্রকে আবার তাঁদের মধ্যে আসতে হল। পেশাদারী অভিনয়ে অমত থাকায় তিনি এলেন অবৈতনিক অভিনেতারূপে। সাধারণ রঙ্গালয়ে গিরিশচন্দ্র এসে যোগ দিলেন এর প্রতিষ্ঠার দু'মাস পর।

ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অনবদ্য অভিনয় শোভাবাজার রাজবাড়িতে নাট্যাচার্য বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের মনোজ্ঞ অভিনয় অপেক্ষাও অনেক হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। কৃষ্ণকুমারী নাটকের ৫ম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কন্যা হারানোর ভয়ে শোকে উন্মত্ত ভীমসিংহের উন্মাদ অবস্থার রূপায়ন গিরিশচন্দ্রের অভিনেতৃজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি। ভীমসিংহের উন্মাদ অবস্থার রূপদানে গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রটির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন বলেই অত অপূর্ব অভিনয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কন্যাবিরহ-আশঙ্কায় উন্মাদগ্রস্ত ভীমসিংহের সেই উদ্‌ভ্রান্ত উক্তি—"মানসিংহ—মানসিংহ—মানসিংহ! হুঁ—তা'কে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্লেম।" গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে এমনই হৃদয়ভেদী হয়ে উঠেছিল যে সামনের সারিতে উপবিষ্ট দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন অভিভূত হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, এমন কি একজন তো সজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

আবার ঐ অঙ্কের একই গর্ভাঙ্কে যেখানে ভীমসিংহ কন্যার বিচ্ছেদ-ব্যথায় জর্জরিতা মহিষীকে বলছেন—"মহিষী যে? দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছ! কৈ?"—সেইখানে গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব অভিনয় মর্মস্পর্শী হয়েছিল। এই দৃশ্যে পূর্ববর্তী অভিনেতা বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার নট নাট্যকার নাট্যাচার্য বিহারীলাল অশ্রুবর্ষণের মধ্য দিয়ে অভিনয় করতেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এক উদ্‌ভ্রান্ত চরিত্রের ব্যাকুল অনুসন্ধান—সেখানে সমস্ত অশ্রু যেন বাষ্পীভূত হয়ে

গিয়েছিল। নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায়বাহাদুর এই অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে নিজের হাতে তাঁর রাজপোষাকে ভীমসিংহরূপে সাজিয়ে তাঁর তরবারি উপহার দিয়েছিলেন। ভীমসিংহের ভূমিকা যেন গিরিশচন্দ্রের জন্যই লিখিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রকে এই ভূমিকায় মানাত অতি চমৎকার? তাঁর সুবিশাল দেহ এবং উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভীমসিংহের ভূমিকার সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। বহু ভূমিকায় অভিনয় করেই তিনি সাফল্য ও যশ অর্জন করেছেন, কিন্তু শোকোন্মত্ত ভীমসিংহের চরিত্রের ন্যায় কোনটিই তাঁকে এতদূর প্রভাবিত করতে পারে নি।

'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের চরিত্রে অভিনয় করে গিরিশচন্দ্র তাঁর অভিনয়-জীবনের সূচনায় এবং পরেও প্রভূত সম্মান লাভ করেন। তাঁর অভিনীত সমগ্র চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে নিমচাঁদ চরিত্র রূপায়ন উজ্জ্বল হ'য়ে বিরাজ করেছিল প্রদীপ্ত ভাস্করের মত। কিন্তু তবু সেই অপূর্ব অভিনীত এবং তাঁর অভিনেতৃ-জীবনে অসামান্য গৌরববহনকারী চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রকে কৃষ্ণকুমারীর ভীমসিংহের মত প্রভাবান্বিত করতে পারেনি তাঁর পরবর্তী অভিনয়-সৌকর্যের মধ্যে অথবা তাঁর নাট্যসৃষ্টির মধ্যে। ভীমসিংহ চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের আভিনয়িক সত্তার মধ্যে যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল, যেন তাঁর অভিনেতা-অন্তরের নিভৃত স্থানে লাভ করেছিল চিরস্থায়ী আসন। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই চরিত্রটি বহু ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর বহু লেখার মধ্যেই আমরা কন্যাবিচ্ছেদ-আশঙ্কায় জর্জরিত অপ্রকৃতিস্থ ভীমসিংহকে বারে বারে ফিরে আসতে দেখি—কখনও অস্পষ্ট, কখনও-বা সুস্পষ্টরূপে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীর নাট্যরূপ দান করেছিলেন গিরিশচন্দ্র। তিনি তাতে কোন মৌলিক পরিবর্তনের চেষ্টা না করে উপন্যাসের ভাষা প্রায় ব্যবহার করেছিলেন। তবে নাটকের প্রয়োজনে কয়েকটি নূতন দৃশ্য গিরিশচন্দ্র এর মধ্যে সংযোজিত করেছিলেন। পশুপতি চরিত্রটি তাঁর ভাব-কল্পনা দিয়ে সম্পূর্ণ নিজের মত করেই পুনর্লিখিত হয়েছিল। গিরিশকৃত এই নাটকের পশুপতি চরিত্রে ভীমসিংহের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

৪র্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে পশুপতিকে মুসলমান বেশ পরিয়ে সৈনাধ্যক্ষ মহম্মদ আলি যখন পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই সময় অপ্রকৃতিস্থ, আত্মবিস্মৃত পশুপতি বলছেন—(মুসলমান সৈন্যদের দ্বারা নিহত হিন্দুদের শব দেখে শোক প্রকাশ করছেন তখন)।

মহম্মদ আলী। আপনি পাগলের মত কি বলছেন! যা হবার হয়ে গিয়েছে, দুঃখ করলে আর ফিরবে না।

পশুপতি। মন্ত্রীবর, বল দেখি পা রাখি কোথায়? এই দেখ, ভ্রাতৃবর্গের শোণিতাক্ত চরণের ভার মেদিনী আর বহন করতে পার্চ্ছে না। মেদিনীরই বা অপরাধ কি? চারি যুগ হতে মনুষ্যের বাস—এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, আর বহন করতে অসমর্থ।

১ম সৈন্য। একি পাগল হল নাকি?

পশুপতি। লক্ষ্মণ সেন, তুমি বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য। তোমাকে পদচ্যুত করায় আমার পাপ নাই। তিরস্কার করবে! করো—সহ্য করবো। পশুপতির হৃদয়ে সব সয়—পশুপতির হৃদয়ে অসহ্যও সহ্য হয়।

২য় সৈন্য। হা হতভাগা!

মহম্মদ। মহাশয়, আপনি আমার অবস্থা ভুলে যাচ্ছেন।

পশুপতি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—তুই কে? মুসলমান। রক্ষক, একে বধ করো। (হাঃ হাঃ হাঃ)—ঐ যে আমার সিংহাসন আসছে,—দেখ দেখ —সিংহাসন আমাকে ডাকছে?

মহম্মদ। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) একি! পশুপতির গৃহে কে অগ্নি দিলে? বোধ হয় সৈন্তরা লুট করতে করতে অগ্নি দিয়েছে।

পশুপতি। মন্ত্রীবর, প্রজারা এদিকে আসছে কেন? তা'দের বলো— আজ অভিষেক নয়—অধিবাস। মনোরমা কোথায়? মনোরমা যে আমার সঙ্গে অধিবাস করবে। মনোরমা কোথায় গেল? এঁ্যা, কোথায় গেল? আমার গৃহে আছে।"

এই 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিকৃতমস্তিষ্ক ভীমসিংহ চরিত্রের প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এই ভীমসিংহের অদৃশ্য আকর্ষণ গিরিশচন্দ্রকে বহু সময় প্রলুব্ধ করেছে এই ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করতে এবং হয়ত তাঁর অজ্ঞাতসারেই তিনি এই দুর্নিবার আকর্ষণে ধরা দিয়েছেন,—এই প্রলোভনকে জয় করে উঠতে পারেন নি। তাই গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকেই চলেছে ভীমসিংহের অবারিত আনাগোনা।

'বলিদান' নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে কিছুটা অংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হচ্ছে।

"রূপচাঁদের দপ্তরখানা"

(একদিক দিয়া রূপচাঁদ ও দুলালচাঁদ এবং অন্যদিক দিয়া উকীল ও করুণাময়ের প্রবেশ)

রূপ। আসতে আজ্ঞা হয়, বেই মশায়—আসতে আজ্ঞা হয়।

করুণা। হুঁ—এই এলুম—ওদিকে কে?—না—কেউ নয়!

রূপ। বসুন, ওদিকে কি দেখছেন,—কেউ সঙ্গে আছে নাকি!

করুণা। না,—তবে—হুঁ—বস্‌ছি। (উপবেশন)

রূপ। (দলিল ও হাতচিঠি দেখাইয়া) বে'ই মশায়, এই দেখুন এই বাড়ির দলিল, এই পাওনাদারের হাতচিঠি। কেমন আর তো আপনার দেনার ভয় নাই! দেখুন—দেখুন, হাতচিঠিগুলো দেখুন।

করুণা। হুঁ,—আর ওয়ারিন বেরোবে না তো?

রূপ। কি বল্‌ছেন,—আর এইসব হ্যাণ্ডনোটগুলো দেখুন। আর তো আপনার দেনা নাই?

করুণা। হুঁ,—কে জানে, সব লিষ্টি করিনি।

রূপ। এক আধখানা থাকেতো ভাবনা কি? আমি সব চুকিয়ে দেব লিখে দিচ্ছি তো।

করুণা। হুঁ,—অনেক দেনা—অনেক দেনা!

উকীল। (স্বগত) মানুষটার মাথা খারাপ হয়েছে দেখ্‌ছি।

করুণা। হুঁ,—কেউ নয় তো? উঃ ছাই খেয়ে মরেছে—ছাই খেয়ে মরেছে! কে ও?

উকীল। এতো দেনাপাওনা হচ্ছে না; তবে contract, মেয়েটি আপনি দেবেন—তারই contract। কেমন, আপনি তো স্বীকার পাচ্ছেন?

করুণা। হ্যাঁ—হ্যাঁ। যদি মরে যায়?—তা হ'লে কি হ'বে? একটা মরেছে, ছাই খেয়ে মরেছে, এটা যদি ছাই খেয়ে মরে, তাহ'লে কি হবে? ওগুলো মরে—মরতে চায়,—শুধু আমি মরিনি—গিন্নি মরে না। যদি মরে—কি হবে?"

বলিদান নাটকে ৪র্থ অঙ্ক ৭ম গর্ভাঙ্কে করুণাময় চরিত্রের এই শোক বিস্ফারিত উদ্‌ভ্রান্ত প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

যখন হিরণকে খিড়কির পুকুর থেকে প্রাণহীন অবস্থায় তোলা হয়েছে এমন সময় করুণাময় প্রবেশ করলেন।

"করুণাময়। এই যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে! তাইতো বলি, আমার শান্ত মেয়ে - রাস্তায় যাবে না—লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না। মা,—মা, অন্ন দিতে পারি নাই, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছে! আহা, জল খেয়ে কি শীতল হয়েছে? ওমা, বড় জ্বালা পেয়েছ—বড় জ্বালা পেয়েছ! এখন কি জুড়িয়েছ? ওমা! (বসিয়া পড়িল)

কিশোর। মশায় স্থির হোন।

করুণা। বাবা, কিছু ভয় করো না, স্থির হব বৈকি! বাছা জলে ডুবেছে কেন জান? ঘৃণায় ডুবেছে। পতিহীনা দুটি অন্নের জন্য আমার কাছে এসেছিল, আমি ছাই খেতে বলেছি, আমি বাপ—অন্ন দিতে পারিনি—ছাই খেতে বলেছি! আমি দেখে শুনে বে' দিয়েছিলুম, বিধবা হয়ে বাড়ি এলো, ছাই দিতে গেলুম—সন্তানকে ছাই দিতে গেলুম! সন্তান হত্যা করলুম। শুভক্ষণে আমার জন্ম।"

অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে এই দৃশ্যের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র এবং অর্ধেন্দুশেখরের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

"যে দৃশ্যে হিরণ্ময়ী পুকুরে ডুবিয়া মরে, সেই দৃশ্যে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া অর্ধেন্দুশেখর মমতা-বিগলিত চক্ষের ধারে বক্ষ ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, 'এই যে, খুঁজে পাওয়া গিয়েছে! তাইত বলি আমার শান্ত মেয়ে, রাস্তায় যাবে না' ইত্যাদি। এ ক্রন্দনে দর্শকও কাঁদিতেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র যখন এই কথা বলিতেন, তখন তাঁর চক্ষে জল কোথায়? দেহের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছে, শোণিত প্রবাহস্তব্ধ, নিষ্পলক নেত্রে জমাট-বাঁধা মেঘ, কণ্ঠস্বর শুষ্ক, ভগ্ন, গভীর। এই চিত্র দেখিয়া দর্শকের অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন হাহাকার করিয়া উঠিত, কোন অপরিজ্ঞাত শোক—কোথায় ছিল, কখন আসিল—দমকা ঝড়ের মত অলক্ষ্যে, নিমেষে, সব যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গেল।"

কন্যার বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় শোকার্ত উন্মত্ত ভীমসিংহের চরিত্র রূপায়ণে গিরিশচন্দ্র এবং বিহারীলালের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, এখানেও অর্ধেন্দু-শেখরের সঙ্গে সেই একই মৌলিক পার্থক্য। গিরিশচন্দ্রের সেদিন অভিনীত ভীমসিংহে যে ধারণার উদ্ভব—করুণাময়ের মধ্যেও তারই প্রকাশ। তাই গিরিশচন্দ্রের করুণাময়,—বজ্রাহত তরুর ন্যায়, পত্রপুষ্পহীন, বিদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের মত এই রকম ছায়া সীতারাম, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি আরও অনেক নাটকে পড়েছে।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হ'য়ে আশুতোষ দেব (সাতু বাবুর) মহাশয়ের দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ ১৮৭৩র ১৬ই আগষ্ট (বেঙ্গল থিয়েটার নামে) একটি সাধারণ নাট্যশালার উদ্বোধন করেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের মধ্য দিয়ে। প্রায় এই সময়ই একদিন রাত্রে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর এবং জমিদার পুত্র ভুবনমোহন নিয়োগী অত্যধিক ভিড় বশতঃ বেশি দামের টিকিট পর্যন্ত না পেয়ে ফিরে আসেন বেঙ্গল থিয়েটার থেকে। সদ্য পিতৃহীন এবং বিপুল সম্পত্তির মালিক ভুবনমোহন জেদবশতঃ গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৩র ৩১শে ডিসেম্বর এই থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। বেঙ্গল থিয়েটারেতে 'দুর্গেশ নন্দিনী'র সাফল্যজনক অভিনয়ে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে গ্রেট ন্যাশন্যাল চাইল বঙ্কিমের অন্য উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করে অভিনয় করতে। তাঁরা

বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন গিরিশচন্দ্রকে। গিরিশচন্দ্র 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ দান করলেন এবং ১৮৭৪এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী স্বয়ং পশুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর অনন্যসাধারণ অভিনয়, প্রতিভার পরিচয় পুনরায় নূতন করে দান করলেন। অত:পর গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকীকৃত 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় হয় ১৮৭৪এর ১৪ই এপ্রিল। এইভাবে বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপদানের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্র করছিলেন মৌলিক নাটক রচনার পূর্বাহ্নিক শিক্ষানবিশী।

এরপর গিরিশচন্দ্রের জীবনে দেখা দিল নানারূপ দুর্বিপাক। ১৮৭৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তাঁর পত্নীবিয়োগ হল। এ্যাট্কিনসন কোম্পানী ফেল হওয়ায় কর্মের মধ্যে নিবিষ্ট থেকে শোক সংবরণ করার পথও ছিল না। অতঃপর তিনি ফ্রাইবার্জার এণ্ড কোম্পানীতে যোগদান করেন এবং কর্ম-ব্যপদেশে ভাগলপুরে গমন করেন। বিভিন্ন কাজ ও কবিতা-রচনার মধ্য দিয়ে মানসিক অশান্তির জ্বালাকে এই সময় প্রশমিত করতে চেষ্টা করেন। অতঃপর ফ্রাইবার্জার কোম্পানী ত্যাগ করে গিরিশচন্দ্র মহাত্মা শিশির কুমারের অনুরোধে ইণ্ডিয়ান লীগের হেডক্লার্ক ও কেসিয়ার-পদে কাজ করতে থাকেন এবং প্রায় বছর খানেক পরে পার্কার কোম্পানীর অফিসে বুক-কীপারের চাকুরী সংগ্রহ করেন। এই সময় গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং তাঁর চিত্তের উদ্বেগ ও অস্থিরতা অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। এইভাবে গিরিশচন্দ্র ব্যক্তিগত নানা বাধাবিপত্তির ফলে সাধারণ রঙ্গালয় থেকে কিছুটা দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু নাট্য-প্রতিভা তার মধ্যে অন্তঃশীলা, শত বাধাবিপত্তি উপস্থিত হ'লেও সে কি কখনও নীরব হয়ে থাকতে পারে? তাই নানা জটিলতার মধ্যেও যখন প্রয়োজন হয়েছে, তিনি ফিরে এসেছেন অভিনেতৃগোষ্ঠীর মাঝখানে অভিনয় শিক্ষা দিয়ে, নাট্য পরিচালনা ক'রে, বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে, গান রচনা করে নানাভাবে বন্ধুদের সহায়তা করেছেন। মাউসি, Charitable Dispensary, ধীবর ও দৈত্য, আলিবাবা, Pantomine, দুর্গাপূজার পঞ্চরং, Circus Pantomine, 'সহিস হইল আজি কবি চূড়ামণি' প্রভৃতি কয়েকটি রঙ্গ-নাটিকা রচনা করেছিলেন গিরিশচন্দ্র। কিন্তু সেগুলি তিনি তাঁর

সত্যকার নাট্য-প্রচেষ্টার মধ্যে গণ্য করেন নি। 'আগমনী'কে তিনি তাঁর প্রথম রচনারূপে উল্লেখ করেন।

'আগমনী'র উৎসর্গপত্রে তিনি এবিষয়ে লিখেছেন—"আমার এই প্রথম রচনা-কুসুমটিকে অনাদর-অনল-শিখায় অর্পণ ক'রনা"। এই সময়েই গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের নিদারুণ দুরবস্থা। বেহিসাবী এবং থিয়েটারে পান-ভোজন অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাওয়ায় ভুবনমোহন তখন আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটককে কেন্দ্র করে এই সময় রঙ্গ জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয় ১৮৭৬ সালে।

(নাট্যজগতের প্রতি গিরিশচন্দ্রের ছিল একটা সহজাত আকর্ষণ ও অপরিসীম মমত্ববোধ। তিনি গ্রেট ন্যাশন্যালের এই নিদারুণ সংকটের সময়ে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে অভিনয় দেখতে আসবে দর্শকেরা, এবিষয়ে তিনি এবং আরও অনেকেই প্রথমে সন্দিহান ছিলেন এবং সেজন্য তিনি এই প্রচেষ্টাকে প্রথমে সমর্থন করেন নি, কারণ এদেশে বিভিন্ন ধনী জমিদার রাজা প্রভৃতির বাড়িতে অভিনয় হত এবং কোন মূল্য দিতে হত না প্রবেশপত্রের জন্য। এইভাবে বিনামূল্যে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে অভিনয় দেখাই এদেশের রীতি ছিল।)

কিন্তু পরে পেশাদার রঙ্গালয়ের সাফল্য দেখে তাঁর ধারণা পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তিনি বুঝেছিলেন সুন্দর দৃশ্যপট, ভাল নাটকের সুঅভিনয় এবং রঙ্গালয়ের সুপরিচালনায় এই ব্যবসাতেও লাভ করা যায়। তাই যখন তিনি দেখলেন ভুবনমোহন বাবুর রঙ্গালয় পরিচালনার ত্রুটি ও ব্যর্থতার জন্য গ্রেট ন্যাশন্যালের পাদপ্রদীপ নির্বাপিতপ্রায়, তখন তাঁর মনে উদ্বেগের সঞ্চার হ'ল। একটা প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে বহু সময় লাগে, বহু কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন হয় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে, কিন্তু তার অবলুপ্তি ঘটে অল্প সময়ের মধ্যে; সান্ন্যাল বাড়িতে সামিয়ানা খাটিয়ে, বাঁশের মাচা বেঁধে যে থিয়েটারের একদিন অভিনয় হয়েছে, সেই থিয়েটারের পরে ইংরাজী লুইস থিয়েটারের আদর্শে কাষ্ঠনির্মিত রঙ্গালয় বিশিষ্ট, সুন্দর দৃশ্যপট

ও আলোকমালা সুসজ্জিত নাট্যশালায় পরিণত হয়েছে। এই গ'ড়ে-ওঠা প্রতিষ্ঠানটিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার বাসনা তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল। এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান আর কোন দিন গ'ড়ে উঠবে কিনা সন্দেহ।

তাই গিরিশচন্দ্র তাঁর বন্ধু জমিদার, নাট্যকার, অভিনেতা কেদারনাথ চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। গিরিশচন্দ্র চাকরী করেন। তাঁর সময়াভাব, কেদারবাবু যদি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন তাহ'লে তাঁরা দুজনে মিলে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারকে লীজ নিতে পারেন, কেদারনাথ চৌধুরী সম্মত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র ভুবনবাবুর নিকট এই প্রস্তাব করেন। গিরিশচন্দ্র লীজ নিতে চান শুনে ভুবনবাবু সাগ্রহে তাঁর হাতে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারকে তুলে দিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর শ্যালক দ্বারকানাথ দেবের নামে লীজ গ্রহণ করার পর থেকেই প্রকৃত পক্ষে সাধারণ নাট্যশালার পুরোপুরি সংস্পর্শে আসবার একটা সুযোগ হল। ১৮৭৭ সালের শেষের দিকে কেদারবাবুকে পরিচালকরূপে গ্রহণ করে গিরিশচন্দ্র 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নাম দিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত গ্রেট ন্যাশন্যালকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে উদ্যোগী হলেন।

গিরিশচন্দ্র প্রথমে অমৃতলাল মিত্র, রামতারণ সান্যাল, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, বেল বাবু, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী প্রমুখ সুঅভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গকে সমবেত করলেন সুন্দর পারস্পরিক বোঝাপড়া-সম্পন্ন একটি শক্তিশালী অভিনেতৃ-গোষ্ঠী গঠন করার জন্য।

এরপর গিরিশচন্দ্র প্রথম নাটক-রচনায় হাত দিলেন। আশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র রচনা করলেন 'আগমনী'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানি একটি গীতিনাট্য। চরিত্র মাত্র ৪টি, তন্মধ্যে গিরিরাজ ও মেনকা, শিব ও উমা প্রধান নন্দী ও ভৃঙ্গী অনুল্লেখ্য চরিত্র। এছাড়া প্রমথগণ, যোগিনীগণ প্রভৃতি গায়ক-গায়িকা, অনুচর-অনুচরীবর্গ।

নাটকটির প্রথমে মঙ্গলাচরণ এবং তারপর মাত্র ৩টি দৃশ্যেই এর সমাপ্তি। মঙ্গলাচরণ-সহ তেরখানি সংগীতের সমাবেশ ঘটেছে এই নাটকে। গানগুলি

কখনও একক, কখনও দ্বৈত, কখনও বা সমবেতভাবে পরিবেশিত। গীতি-নাট্যটির মেনকা চরিত্রের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে শ্বশ্রূগৃহে অবস্থিতা কন্যাকে দর্শনের জন্য বাঙ্গালী মায়ের অন্তর-ব্যাকুলতা।

দেবতাকে বাঙ্গালী জেনেছে আপন জন বলে, একান্ত আত্মীয়রূপে। তাই এখানে দেবতাকে শ্রদ্ধা-ভয়-ভক্তিতে পূজ্য অলভ্য দূরস্থিত রূপে কল্পনা না করে বাংলার সামাজিক, সাংসারিক পরিবেশে অত্যন্ত অন্তরঙ্গরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এই গীতি-নাট্যের মধুর মর্মস্পর্শী সংগীতময় দৃশ্যের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর জননীর অন্তরের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা এমনভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল যে, দর্শক সমাজ তা'কে সাগ্রহে এবং সানন্দে অভিনন্দিত করেছিল এর অভিনয়কালে। 'কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী', 'ওমা কেমন ক'রে পরের ঘরে ছিলি উমা বল্‌না তাই', 'তুমি ত মা ছিলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই' প্রভৃতি অমর গান বাংলার বাউল ভিক্ষুকদের মুখে আজও শোনা যায় এবং এখনও আমাদের অন্তরে আবেগের সঞ্চার করতে সমর্থ হয়। 'আগমনী' ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৮৭৭ সালের ৬ই অক্টোবর এবং প্রভূত যশ অর্জন করে।

নাট্য-উৎকর্ষের বিষয়ে এই নাটকের তেমন কোন দান না থাকলেও রঙ্গালয়ের সঙ্গে বাঙ্গালীর কৃষ্টির সংযোগ-স্থাপনের দিক্ দিয়ে এর মূল্য যথেষ্ট আছে। এরপর থেকেই জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, চড়কপূজা, দোলযাত্রা, এমন কি, বড়দিন (X'mas) ইত্যাদি বিভিন্ন পর্ব দিয়ে নাটিকা রচনা করে দর্শকদের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির উন্মেষের প্রয়াস সুরু হয়। অতুল-কৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেকেই এরপর এই ধরণের গীতি-নাট্য রচনা করেন। কোন ঋতু বা কোন পর্বকে অবলম্বন করে নাটিকা-রচনার এই প্রথম সূত্রপাত হ'ল। 'আগমনী' গীতি নাট্যটি যে বিপুল জনসম্বর্ধনা লাভ করেছিল, অন্য কোন নাট্যকার হ'লে নিজেকে একজন প্রকৃত নাট্য-স্রষ্টারূপে গণ্য করে স্ফীত হয়ে উঠতেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র এটিকেও তাঁর নাট্য-রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে মনে করেন নি। তাই তখনও তাঁর মধ্যে দ্বিধা সংশয়। 'মুকুটাচরণ' ছদ্ম নামের অন্তরালে সেদিন আত্মগোপন করেছিলেন নাট্যকার।

'আগমনী' অভিনয়ের চারদিন পরে অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের 'অকাল বোধন' 'অকাল বোধন'ও দর্শক সমাজকে আনন্দ দান করতে সমর্থ হয়েছিল।

ন্যাশন্যাল থিয়েটার ক্রমশঃ জনসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এমন সময় গিরিশচন্দ্রকে এক অভিনব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল। তাঁর ভ্রাতা হাইকোর্টের উকিল অতুলকৃষ্ণ ঘোষের মোটেই ইচ্ছা ছিলনা যে, গিরিশচন্দ্র কোন রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী থাকেন, কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, তাহলে গিরিশচন্দ্রের অবস্থাও একদিন ভুবনমোহনের ন্যায় অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতি লাভ করবে। যাই হোক ভ্রাতার সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা উপস্থিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র লীজ-সত্ব ত্যাগ করলেন এবং সেই থেকে পরিচালক-অভিনেতা রূপেই রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র লীজ ত্যাগ করায় তাঁর শ্যালক দ্বারকাবাবু থিয়েটারটি ভাড়া নিয়ে চালাতে লাগলেন এবং এই সময় মেঘনাদবধের গিরিশকৃত নাট্যরূপ (১৮৭৭ এর ১লা ডিসেম্বর) অভিনীত হয়। এবং 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি নাটক এবং দীনবন্ধুর গল্প 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'কে প্রহসনে পরিণত করে অভিনীত হয় ন্যাশন্যাল থিয়েটারে। এই সকল অভিনয় জনপ্রিয়তা অর্জনেও সমর্থ হয়।

মেঘনাদবধে রাম এবং মেঘনাদ এই দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রে অপূর্ব অভিনয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে গিরিশচন্দ্র সেদিন প্রভূত যশ অর্জন করেন এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সারিতে তাঁর আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর দ্বারকাবাবু থিয়েটার ছেড়ে দেওয়ায় কেদারনাথ চৌধুরী লীজ গ্রহণ করেন।

নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'কে গিরিশচন্দ্র নাটকে রূপান্তরিত করেন এবং ১৮৭৮ এর ৫ই জানুয়ারী ঐ নাটক মহাসমারোহে সাফল্য-জনকভাবে অভিনীত হয়।

১৮৭৮ সালের ২৬শে জানুয়ারী 'আনন্দমিলন' এবং ৪ঠা মার্চ 'দোললীলা' নামক গিরিশচন্দ্র রচিত দু'খানি গীতিনাট্য অভিনীত হয়, কিন্তু দর্শকগণের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়নি।

এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। বঙ্গীয় নাট্যশালাতে তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে নাটকাকারে অভিনয়ের ঢেউ উঠেছিল অনিবার্যভাবে।

গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকীকৃত 'বিষবৃক্ষ' অভিনীত হল ১৮৭৮ এর ২৭শে এপ্রিল। ন্যাশন্যাল থিয়েটার পুনরায় নূতন করে খ্যাতি অর্জন করল দর্শক-সমাজকে এই নাটক উপহার দিয়ে।

নগেন্দ্রের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দর্শকচিত্তে চিরস্থায়ী শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিল। সূর্যমুখীকে হারাণোর পর নগেন্দ্রের বিভিন্ন ভাবভঙ্গী, আচরণের মধ্যে পুনরায় কৃষ্ণকুমারীর ভীমসিংহের উদ্‌ভ্রান্ত চরিত্রসৃষ্টির রীতির ছায়াপাত ঘটতে দেখা যায়।

বেঙ্গল থিয়েটারে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হলেও কেদারবাবুর অনুরোধে গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর নূতন নাট্যরূপ দান করেন। প্রথম অভিনয়ে কেদার চৌধুরী জগৎসিংহ এবং কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওসমানের ভূমিকায় অভিনয় করেন, কিন্তু তুলনামূলক বিচারে বেঙ্গল থিয়েটারই লাভ করে অধিকতর অভিনয়-নৈপুণ্যের বিজয়মাল্য। অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। তিনি গ্রহণ করলেন জগৎসিংহের ভূমিকা এবং ওসমান চরিত্রে রূপদান করলেন মহেন্দ্রলাল বসু। আরও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করে নবভাবে অভিনয় অনুষ্ঠিত হল এবং ব্যক্তিগতভাবে গিরিশচন্দ্রের ও গোষ্ঠিগতভাবে আভিনয়িক উৎকর্ষের বিচারে এবারে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানলাভ করল ন্যাশন্যাল থিয়েটার।

এইভাবে গিরিশচন্দ্র জনগণচিত্তে খ্যাতিমান অভিনেতার দুর্লভ আসন লাভ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-নৈপুণ্য উৎকর্ষ লাভ করলেও বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত শরচ্চন্দ্র ঘোষের দেহসৌষ্ঠব ও অশ্বারোহণ পটুতার জন্য দর্শকগণ চমৎকৃত হতেন। এইজন্য শরৎবাবুর জগৎসিংহ অভিনয়ও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ১ম দৃশ্যে দুর্যোগপূর্ণ রাতে অশ্বারোহণে ঝড়ের মধ্য দিয়ে এসে গাছে ঘোড়ার বল্‌গা বেঁধে যখন মন্দির দ্বারে করাঘাত ক'রে বলতেন 'মন্দিরে কে আছে, দ্বার খোলো' কিংবা অশ্ব হ'তে অবতরণ করে ওসমানকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান

করার দৃশ্য দর্শক হৃদয়ে অপূর্ব রেখাপাত করেছিল, গিরিশবাবুর সুপটু অভিনয়ও তাদের মন থেকে সেই ছবি মুছে ফেলতে পারে নি।

এই সময় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জীবনে নেমে এল আকস্মিক বিপর্যয়। দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়কালে এক রজনীতে গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের উপর পা পিছলে পড়ে যান এবং গুরুতররূপে আহত হন। তাঁর বাঁ হাতের কব্জি ভেঙে যাওয়ায় তাঁকে তিন মাসকাল কষ্টভোগ করতে হয় এবং নাট্যশালার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যোগসূত্র এইভাবে ক্ষীণ হয়ে আসায় থিয়েটার পরিচালনার ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধা এবং অশান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

কেদার চৌধুরী থিয়েটার-পরিচালনায় অক্ষম হয়ে থিয়েটার ত্যাগ করেন।

এরপর অনেকেই ভাড়া নিয়ে থিয়েটারটিকে চালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও পরিচালন-শক্তির অভাবে সকলেই ব্যর্থ হন। এই সময় মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের বহু টাকা বাকী প'ড়ে যাওয়ায় মালিক ভুবনমোহন নিয়োগীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয় এবং পরিশেষে নীলামে মাত্র ২৫০০০৲ টাকায় প্রতাপচাঁদ জহুরী নামক একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ঐ রঙ্গালয়টিকে ক্রয় করেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে।

প্রতাপচাঁদ ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি বুঝেছিলেন এই থিয়েটারই একদিন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হবে, যদি উপযুক্ত পরিচালন-ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় এবং যদি হিসাবপত্র ইত্যাদি যথাযথভাবে রক্ষার বন্দোবস্ত করা যায়। কেবল মাত্র সুঅভিনয়ই অর্থাগমের পক্ষে যথেষ্ট নয়, একটি প্রতিষ্ঠানকে সম্যকরূপে চালিয়ে যেতে হলে তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মকানুনবিধি ব্যবস্থা-পালনের। ইতিপূর্বে এই থিয়েটারে যে অর্থাগম হয়নি তা' নয়, কিন্তু বেহিসেবী এবং অক্ষম পরিচালনার জন্য,—নিয়মশৃঙ্খলাবিহীন খামখেয়ালী ব্যবস্থাপনার জন্য, (সর্বোপরি বেশি অর্থ এলে সেদিন অত্যন্ত উদারহৃদয় হ'য়ে মালিকের অন্যান্য সকলের সঙ্গে পানভোজনে লিপ্ত হওয়া) প্রভৃতি দোষের জন্যই

এই লাভজনক ব্যবসায়েও পূর্ববর্তী মালিকেরা লাভের অঙ্কের পরিবর্তে লোকসানই দেখেছেন। প্রতাপ জহুরী তাঁর অভিজ্ঞতার দরুণ তাই প্রথমেই অনুসন্ধান করতে লাগলেন একজন উপযুক্ত পরিচালকের। তিনি গিরিশ-চন্দ্রের যোগ্যতার প্রমাণ ইতিপূর্বে কিছু কিছু পেয়েছিলেন। তাই তাঁর একান্ত ইচ্ছা হল গিরিশচন্দ্রের হাতে এই থিয়েটারের পরিচালনার ভার অর্পণ করার। গিরিশচন্দ্র কিন্তু কিছুতেই সম্মত হলেন না।

প্রথমতঃ তিনি তখন পার্কার কোম্পানীর অফিসে বুক-কীপার, দ্বিতীয়তঃ অর্থ নিয়ে অভিনয় করা ইত্যাদি ব্যাপারেও তাঁর মন সায় দেয় না। তিনি প্রতাপচাঁদকে সোজাসুজি তাঁর 'অমত আছে' একথা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রতাপ জহুরীর যে গিরিশচন্দ্র না হ'লে চলবে না। তিনি কি এত সহজে ফিরে যেতে পারেন? নাছোড়বান্দার মত তিনি লেগে রইলেন গিরিশচন্দ্রের পিছনে, যে ক'রেই হো'ক তাঁকে রাজী করাতেই হবে। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যে গিরিশচন্দ্র তাঁকে এড়াবার জন্যে একদিন বাড়িতে থেকেও অপরকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে তিনি বাড়িতে নেই। কিন্তু ভবি ভোল্‌বার নয়, ছিনে জোঁকের মত বসে থাকেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যবসায়ী। অবশেষে প্রতাপচাঁদকে লজ্জা দেবার জন্যে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বল্‌লেন, "গিরিশবাবু বাড়ি নেই, আপনি এখন যেতে পারেন।" কিন্তু তবু কি ছাড়বার পাত্র প্রতাপ জহুরী, সে জহর চেনে, এমন জহর সে কখনও ছাড়তে পারে? অবশেষে অসীম ধৈর্য এবং অধ্যাবসায়ের জয় হল; গিরিশচন্দ্রকেই সম্মত হ'তে হল প্রতাপচাঁদের প্রস্তাবে। তিনি ভেবে দেখলেন ইতিপূর্বে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের ব্যবসায়িক অসাফল্যের কারণ সমূহ। তিনি চিন্তা করলেন এর আগে যাঁরা এসেছিলেন থিয়েটারের মালিকরূপে তাঁরা কেউই ব্যবসায়ী ছিলেন না, তাঁরা এসেছিলেন নিতান্ত সখ মেটাবার জন্য, লাভ করবার জন্য নয়। এখন যদি প্রতাপচাঁদের মত একজন পাকা ব্যবসায়ী লোক নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্তন ক'রে, আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসেব রেখে থিয়েটার থেকে লাভ করব বলে এগিয়ে আসেন, সেটা বঙ্গীয় নাট্যশালার পক্ষে লাভজনকই হবে এবং নাট্য-পরিচালনার ব্যাপারে তার সহযোগিতা লাভ করা রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রাখার দিক দিয়ে যথেষ্ট

সহায়ক হবে। পরে, অবশ্য, অনেক কিছু ভেবে চিন্তে তিনি রাজী হলেন মাত্র ১০০৲ টাকা মাইনে নিয়ে বেতনভোগী ম্যানেজাররূপে নাট্যজগতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। তিনি তখন পার্কার কোম্পানীর ১৫০৲ টাকা মাইনের চাকুরী পরিত্যাগ করে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম বেতনভোগী তত্ত্বাবধায়কের কার্য গ্রহণ করলেন।

প্রতাপ জহুরী এবং গিরিশচন্দ্রের এই মিলন বাংলা নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে একটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই অভিনব যোগসূত্রের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত নাট্যকার জীবনের অঙ্কুরোদ্গমের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করল নাট্যকার গিরিশচন্দ্র। থিয়েটার পরিচালনার জন্য প্রতাপ জহুরী ও গিরিশচন্দ্র যে সকল নিয়মকানুন প্রবর্তন করেছিলেন গতযুগ পর্যন্ত বাংলা দেশের রঙ্গালয় পরিচালনায় সেইগুলিই অনুসৃত হ'য়ে এসেছে। রঙ্গালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এইটাই প্রতাপ জহুরীর অবদান।

নবগঠিত ন্যাশন্যাল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হ'ল ১৮৮১র ১লা জানুয়ারী। খ্যাতনামা কবি সুরেন্দ্র মজুমদার গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে 'হামির' নামক একটি নাটক রচনা করে দেন। 'হামির' নাটকের অভিনয় দর্শক চিত্তে রেখাপাত করতে পারে নি।

এরূপ দুর্বল নাটক নিয়ে পূর্ণোদ্যমে চলমান বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। মাত্র তিনটি রাত্রির অভিনয়ের মধ্যেই এই নাটকের অভিনয় শেষ হয়। গিরিশচন্দ্র তখন অত্যন্ত সমস্যার সম্মুখীন হ'লেন—নূতন নাটক কোথায়? মাইকেল, দীনবন্ধুর নাটক তো প্রায় সবই অভিনীত হয়ে গেছে বিভিন্ন নাট্যশালায়। মাইকেল, দীনবন্ধুর পর মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিমান বঙ্কিমের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলিকেও নাট্যরূপ দান করে বঙ্গীয় দর্শকের নাট্যরস পিপাসা মেটাবার চেষ্টাও তখন হয়ে গেছে। বঙ্কিমের নাটকীকৃত উপন্যাসের অভিনয় দেখতে বিপুল জন-সমাগম ঘটত। বঙ্কিমের এই উপন্যাসগুলি ছিল বাংলা রঙ্গালয়ের classic, তাই যখনই যাদের প্রয়োজন হয়েছে তারাই বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে নাটকাকারে পুনরভিনয়ের চেষ্টা করেছেন।

৬০।৭০ বৎসর এমনই চলেছে। গিরিশচন্দ্রের সময়ে মাত্র কিছু দিন পূর্বে পেশাদার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই দর্শক সংখ্যা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। তাই প্রায়ই নূতন নাটক না দিলে নাট্যশালা চালানো অসম্ভব হ'য়ে পড়ত।

(গিরিশচন্দ্র 'হামির' অভিনয়ের পর নূতন নাটকের জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাই তিনি থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে ভাল নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন। কিন্তু পুরস্কারের প্রত্যাশায় রামনারায়ণ তর্করত্নের মত কোন প্রতিভাবান নাট্যকারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না।)

গিরিশচন্দ্র ইতিপূর্বে গীত রচনা করেছেন, নাটকের প্রস্তাবনা লিখে দিয়েছেন, ক্ষুদ্র রঙ্গনাটিকা, গীতিনাট্য প্রভৃতি লিখে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন, কিন্তু ছোট পটভূমিকাতেই রঙ ফলাতে তিনি পারেন, বড় পট দেখে তিনি ভীত হন - পেছিয়ে পড়েন; সে শক্তি কি তাঁর আছে—মনে সংশয় জাগে। একটা পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখবার জন্য তাই তিনি তখনও সাহস করে এগিয়ে আসতে পারেন না। তাঁর মধ্যে যে অসামান্য নাট্য-প্রতিভা বিদ্যমান—এ পরিচয় তিনি তখনও পান নি। তিনি অনেক জায়গায় বলেছেন যে, তিনি সখ করে নাটক লিখতে আসেন নি, তাঁকে দায়ে পড়ে নাট্যকার হ'তে হয়েছে। কিন্তু খ্যাতিমান নাট্যকার হ'বার আকাঙ্ক্ষা কি গিরিশচন্দ্রের মধ্যে ছিল না? যিনি তাঁর সব রচনাতেই প্রশংসা পেয়েছেন, তাঁর মনে এ কামনা থাকা খুবই স্বাভাবিক।

গিরিশচন্দ্রের মনেও এই আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছিল ঠিকই; কিন্তু তিনি তখনও নিজেকে উপযুক্ত হয়েছেন বলে মনে করেননি বলেই সে সময় নাট্য-রচনায় হাত দিতে চান নি; তখন তাঁর মধ্যে চলেছে প্রস্তুতি এবং নানাভাবে জ্ঞান-সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা-আহরণ। গান, গীতিনাট্য ইত্যাদি লিখেছেন, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ প্রভৃতির নাট্যরূপ দান করেছেন সেক্‌স্‌পীয়ার প্রমুখ পাশ্চাত্য নাট্যকারদের নাটক, উপন্যাস সমূহ এবং অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করেছেন, ময়দানের লুইস থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারিণী প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী মিসেস লুইসের সঙ্গে নানারূপ বিদেশী নাটকেরও অভিনয়-

সমালোচনায় এবং দিনের পর দিন অভিনিবেশ সহকারে লুইস্ থিয়েটারের অভিনয়-দর্শনের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা ক্রমশঃ বিকাশোপযোগী হয়ে উঠেছিল। তখনও ঠিক সেই উপযুক্ত মুহূর্ত এসেছে বলে গিরিশচন্দ্র মনে করেন নি। তাই তাঁর এত দ্বিধা, এত সংশয়,—অন্যকে দিয়ে নাটক লিখিয়ে নেবার জন্য এত আকুলতা। উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য প্রতীক্ষা করার অবসরে গিরিশচন্দ্র রচনা করেন 'মায়াতরু' এবং 'মোহিনী প্রতিমা' নামক দুইটি গীতিনাট্য ও 'আলাদিন' নামে একটি রঙ্গ-নাটিকা।

১৮৮১র ২২শে জানুয়ারী 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকের পর অনুষ্ঠিত হয় মায়াতরুর গীতাভিনয়। এই গীতিনাট্যটির গানগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

লুইস থিয়েটারে অভিনীত W. S. Gilbert-এর 'Pygmalion & Galatta' নামক নাটকের ছায়া-অবলম্বনে রচিত হয় গিরিশচন্দ্রের 'মোহিনী প্রতিমা' নাটক এবং অভিনীত হয় ১৮৮১র ১৬ই এপ্রিল। এই নাটকটির মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ভাবধারা প্রতিফলিত হয়েছিল। নাটকটির বিষয়বস্তু ছিল মানব প্রেমের সুগভীরতা। এক শ্রেণীর দর্শকের নিকট 'মোহিনী প্রতিমা' সমাদৃত হয়েছিল।

এই সঙ্গে উপস্থাপিত করা হত 'আলাদিন' নামক পঞ্চরঙখানি। এই রঙ্গ-নাটিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল।

নানাভাবে চেষ্টা করার পরও যখন কোন ভাল নাটক পাওয়া গেল না, তখন গিরিশচন্দ্র নিজেই পরীক্ষামূলকভাবে নাটক লিখতে চেষ্টা করলেন। এইভাবে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে আগমন ঘটলো গিরিশচন্দ্রের। গিরিশচন্দ্র লক্ষ্য করলেন তখন চলেছে ঐতিহাসিক যুগ; নাটকে 'কৃষ্ণকুমারী' থেকে আরম্ভ করে 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' প্রভৃতিতে এবং বঙ্কিমের অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাস নাট্যে রূপান্তরিত হওয়ায় ঐতিহাসিক নাটকই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তিনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'হামিরে'র মধ্যেও সেই চেষ্টাই দেখেছিলেন। প্রথম বড় পটভূমিকায় রঙ ফলাতে গিয়ে—পূর্ণাঙ্গ একটি নাটক-রচনায় হস্তক্ষেপ

করে গিরিশচন্দ্র তাই গ্রহণ করলেন ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু, এবং পূর্ব-সূরীদের মত একে রোমান্সের রসে জারিয়ে নিতে চাইলেন। এই প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি—'আনন্দ রহো' নাটক। এই নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকা যে লিখেছিলেন—'গিরিশ বাবুর লেখায় আমরা এরূপ কল্পনার অরাজকতা আশা করি নাই',—একথা গিরিশচন্দ্রের 'আনন্দ রহো' নাটক সম্পর্কে বলা খুব অসঙ্গত হয়নি। গিরিশচন্দ্র এতদিন যে সব পাশ্চাত্য নাটক এবং নাট্যসমালোচনা পড়েছিলেন এবং লুইস থিয়েটারে অভিনয়-দর্শন, মিসেস লুইসের সঙ্গে আলোচনায় ও অন্যান্য নানা গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেগুলো তাঁর মধ্যে ভাসমানভাবে বিরাজ করছিল, ঠিক আত্মস্থ তখনও হয়নি; সেই বিচিত্র অনুভূতির অসংযত প্রকাশ ঘটেছিল 'আনন্দ রহো' নাটকের মধ্যে। তখনও তাঁর মনোরাজ্যে সুদূর-প্রসারী কল্পনার পুরোপুরি আবির্ভাব ঘটেনি। তাঁর পঠিত বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে আপন কল্পনার সুসমন্বয় সাধনের ক্ষমতা তিনি তখনও অর্জন করেননি। তাই দেখা গেছে, চিন্তা ও কল্পনার দৈন্য এ নাটকের নানাস্থানে। চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি—তাদের অপরিস্ফুট চিত্রই দৃষ্টি-গোচর হয়। লহনা চরিত্রের মধ্যে Lady Macbeth-এর ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে হয়; একটি অদ্ভুত ধরণের চরিত্র রূপায়িত হয়েছে বেতালের মধ্যে। সর্বদা আনন্দোজ্জ্বল, নির্লিপ্ত, পরদুঃখে বিগলিতপ্রাণ এই বেতাল চরিত্রটি নাটকটির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং গিরিশ-চন্দ্রের অভিনব সৃষ্টি। যাত্রাতে অবশ্য 'যদ্‌ভবিষ্য', 'দিবদাস' প্রভৃতি এই ধরণের চরিত্র আমরা দেখেছি—যারা এসে গানে গানে কিছু তত্ত্বকথা শোনাত, ভবিষ্যতের কথা, লোকের মনের কথা প্রভৃতি বলে দিয়ে যেত। এই বেতাল চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য নাটকেও মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়েছে, তবে অন্য নামে ভিন্ন পটভূমিকায়।

যাই হোক, গিরিশচন্দ্রের অপরিণত শক্তির প্রথম নাট্যসৃষ্টি ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল ১৮৮১র ২১শে মে। জনসাধারণ বিশেষ উৎসাহিত হয়নি এই নাটক-দর্শনে। এই নাটকের জনসম্বর্ধনালাভে

ব্যর্থতার আর একটা কারণ হিসাবে বলা যায় যে, এর কয়েক মাস পূর্বে প্রায় একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট নাটক 'অশ্রুমতী' বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

'আনন্দ রহো'র ব্যর্থতার পর গিরিশচন্দ্র অনুধাবন করলেন তাঁর ত্রুটি কোথায়। তিনি বুঝতে পারলেন এখনও পূর্ণাঙ্গ একটা নাটক লেখার উপযুক্ত তিনি হননি, ইতিপূর্বে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দান করে তিনি প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, কারণ সেখানে ছিল একটা সুগঠিত কাঠামো। সেই কাঠামোর মধ্যেই বিচরণ ক'রে তিনি কিছু কিছু চরিত্র-সৃষ্টি ও দৃশ্য-সংস্থাপনের ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছিলেন। তাই এবার গিরিশচন্দ্র চাইলেন এমন একটা বিষয়বস্তুকে তাঁর নাটকের উপজীব্য করতে, যার মধ্যে আছে বাঙ্গালী নরনারীর মর্মস্পর্শী রসময় আবেদন এবং একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো, যে নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবাধে বিচরণ ক'রে তিনি জনপ্রিয় নাটক সৃষ্টি করতে পারবেন।

গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করলেন যে, বাঙ্গালী ধর্মপ্রাণ, ভক্তিমান, দৈব-বিশ্বাসী। তিনি এই নাটকের বিষয় সংগ্রহ করার দিক দিয়ে উপযুক্ত বলে মনে করলেন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বাঙ্গালীর অতিপ্রিয় ধর্মগ্রন্থগুলিকে। গিরিশচন্দ্র সেই ঐতিহাসিক নাট্যপ্রিয়তার যুগে পৌরাণিক নাটক লিখতে অগ্রসর হয়ে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে অনেকের কাছে মনে হবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র জানতেন এই পরীক্ষায় সাফল্য তাঁর অবধারিত। কারণ বাঙ্গালী দর্শক যে ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস ভালবাসে তার কারণ তা'রা যে ইতিহাসের যথাযথ রূপায়ণের জন্য ভালবাসে তা নয়, তারা এই ধরণের নাটকের মধ্যে পায় উত্তেজনা, পায় খানিকটা ইতিহাস, খানিকটা রোমান্স। তবে উত্তেজনার খোরাক পাওয়াই হচ্ছে এই সকল নাটক ভাল লাগার কারণ। তিনি তখন ভাবলেন, পৌরাণিকের মধ্যেও এমন বিষয় নিতে হবে যার মধ্যে থাকবে যথেষ্ট উত্তেজনা। তিনি দেখলেন, রাবণ-বধের কাহিনীর মধ্যে বীররস পরিবেশন করা যাবে, বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ, এই উৎসাহই নিয়ে

আসবে অপরিসীম উত্তেজনা। আর এই বীররসের সঙ্গে যদি ভক্তিরস, করুণরস প্রভৃতি মিশ্রিত করা যায় তখন তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। রামায়ণের থেকে কাহিনী নিয়ে তিনি লিখলেন—'রাবণ-বধ' নাটক। নাটকটি অভিনীত হল ১৮৮১র ৩০শে জুলাই।

(গিরিশচন্দ্র লাভ করলেন বহুবাঞ্ছিত যশোমাল্য. নাটকের অভিনয় হল সাফল্যমণ্ডিত, গিরিশচন্দ্রও স্বীকৃতি পেলেন প্রতিভাশালী নাট্যকার-রূপে। সেইজন্যই আমরা আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে গিরিশচন্দ্র নট হয়েছিলেন এক রাত্রে, কিন্তু নাট্যকার হ'তে তাঁর বহু প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছে) সেই ঐতিহাসিক নাটকের যুগে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক সাফল্যলাভ করবে কি না এবিষয়ে অনেকেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু বলেছেন—

("রাবণ-বধ নাটক যেদিন প্রথম অভিনীত হয়, আমাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল—পৌরাণিক নাটক চলিবে কি না ?" যাই হোক সেদিন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র, তাঁকে বরণ করে নিলেন বঙ্গনাট্যলক্ষ্মী এবং দিলেন যথাযোগ্য পথের সন্ধান। এতদিন গিরিশচন্দ্র ছিলেন খ্যাতিমান নট ও নাট্য-পরিচালক,—এখন থেকে তিনি লাভ করলেন সম্মানিত নাট্যকারের ঈপ্সিত আসন।) 'রাবণ-বধে' গিরিশচন্দ্র বাল্মীকি রামায়ণকে পুরোপুরি অনুসরণ করেননি, তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপর। বাল্যকালে গিরিশচন্দ্র একান্ত চিত্তে তদ্গত হয়ে শুনতে ভালবাসতেন রামায়ণ, মহাভারত-পাঠ, কথকতা প্রভৃতি এবং এগুলি সেই বালকচিত্তকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে পরবর্তীকালে পরিণত বয়সেও তাঁকে এই সমস্ত বিষয় যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে। কারণ যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ, মহাভারত-পাঠ কেবল সাময়িক আবেশে অভিভূত করেনি তাঁকে, তাঁর অস্থিমজ্জার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মিশে গিয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে মূল রামায়ণ বা মূল মহাভারতকে অনুসরণ না করে কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাস-এর রচনাকেই

পুরোপুরি অনুসরণ করেছিলেন, এর কারণ তিনি বাঙ্গালী সমাজে বাঙ্গালীর মানস প্রকৃতির কাছে যা প্রীতিকর এবং অনায়াসগ্রহণযোগ্য হবে, সেই উপকরণই সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন তাঁর নাটকের জন্য। বাল্মীকি রামায়ণে কোনও কোনও চরিত্র এমনভাবে অঙ্কিত হয়েছে যেটা বাঙ্গালী পাঠকের রসচিত্তের কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ ও দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়।

কৃত্তিবাস তাই বাল্মীকির রামায়ণের হুবহু অনুবাদ করেননি, তিনি তার মধ্যে যেখানে যেখানে বাঙ্গালী সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমন অংশ দেখেছেন, সেগুলোকে বর্জন করেছেন, এবং বাঙ্গালীর মনের মত করে, বাঙ্গালীর ভাব-কল্পনার সম্পূর্ণ উপযোগী করে নূতনভাবে এঁকেছেন সেই সমস্ত চিত্রগুলিকে।

এই প্রসঙ্গে আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা থেকে প্রমথনাথ তর্কভূষণের আলোচনার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করলাম, তিনি লিখেছেন—

"এই কাব্যে তিনি যে সকল চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা সর্বাংশে প্রাচীন বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের আদর্শ। মহাকবি বাল্মীকি প্রণীত মূল রামায়ণের কয়েকটি আদর্শ চরিত্রকে কৃত্তিবাস যে ভাবে পরিবর্তিত করিয়া তাঁহার রামায়ণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই আমাদের এই উক্তি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। মূল রামায়ণে লক্ষ্মণের চরিত্র অযোধ্যাকাণ্ডে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"তদিদং বচনং রাজ্ঞঃ পুনর্বাল্যমুপেয়ুষঃ।
পুত্রঃ কো হৃদয়ে কুর্য্যাদ্ রাজবৃত্তমনুস্মরণ্॥

প্রোৎসাহিতোঽয়ং কৈকেয্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা।
অমিত্রভূতো নিঃসঙ্গং বধ্যতাং বধ্যতামপি॥
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্য্যং ভবতি শাসনম্॥"

অযোধ্যাকাণ্ড, ২১ সর্গ।

পিতা দশরথ কর্তৃক নিজের নির্বাসন আজ্ঞা কৈকেয়ীর মুখ হইতে অবগত হইয়া বনগমনোদ্যত রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত জননী কৌশল্যার নিকট বিদায় লইবার জন্য যখন উপস্থিত হন, সেই সময় এইরূপ উক্তি মূল রামায়ণে আছে—"রাজা আবার বালক হইয়াছেন। তাঁহার এই প্রকার বনবাসের আদেশ রাজবৃত্তান্তাভিজ্ঞ কোন্ পুত্র গ্রহণ করিতে পারে?.........

"কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত রাজা তাঁহারই দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া এরূপ কার্য করিয়াছেন, হউন না, তিনি আমাদের পিতা, তথাপি তিনি যেহেতু শত্রুরূপে পরিণত হইয়াছেন, সুতরাং বধ করিতে হইবে, বধই করিতে হইবে। যে গুরু গর্বিত, যাঁহার কার্যাকার্য বিবেক নাই অথবা অসৎপথকে অবলম্বন করিয়াছেন তিনিই দণ্ডার্হ।" লক্ষ্মণের এই প্রকার উক্তি কাব্যের উপযোগী হইলেও ইহা শিষ্ট সমাজ-সম্মত হইতে পারে না। মহাকবি বাল্মীকি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রকে ভাল করিয়া ফুটাইবার জন্য বনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লক্ষ্মণের মুখ হইতে এই প্রকার উক্তি করাইয়াছেন। ভ্রাতার স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ পিতাকে বধ করিতে প্রবৃত্তি কখনও শিষ্ট সমাজের অনুমোদিত বা ধর্মসঙ্গত হইতে পারে না, ইহা স্থির। কৃত্তিবাসের সময় বাঙ্গালার শিষ্ট সমাজে পুত্রের এই প্রকার উক্তি কখনই ভাল বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

এই প্রকার জ্ঞান ছিল বলিয়াই তিনি এই স্থলে লক্ষ্মণের মুখ দিয়া যে কয়টি কথা বলাইয়াছেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার লোকচরিত্র-জ্ঞান ও রচনা-কুশলতা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মণের উক্তিরূপে আমরা এই কয়টি পয়ার দেখিতে পাই—

"লক্ষ্মণ বলেন সত্য তব কথা পুজি।
স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি॥

বার্ধক্যে দুর্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল।
করিয়াছেন বাধ্য তাঁরে কৈকেয়ী কেবল॥

যদি রঘুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই।
ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোমারে দেওয়াই ॥

………ইত্যাদি।

উপরের মূল রামায়ণে লক্ষ্মণের উক্তি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই লক্ষ্মণের উক্তি পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, কৃত্তিবাস মূল রামায়ণ হইতে তাঁহার অনভিমত অংশ লক্ষ্মণের উক্তি হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়া ভালই করিয়াছেন।

……কৃত্তিবাস বাঙ্গালার প্রকৃত বাঙ্গালী কবি ছিলেন, বাঙ্গালার প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক দৃশ্যরাজি তাঁহার কল্পনা ও কবিত্ব শক্তির প্রধান অবলম্বন ছিল।

এই প্রকৃত বাঙ্গালী দরদী এবং বঙ্গীয় কৃষ্টির উপর শ্রদ্ধাশীল কবির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে ও কৃতজ্ঞতায় গিরিশচন্দ্রের হৃদয় পূর্ণ ছিল বাল্যকাল থেকে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের অধিকাংশই গিরিশচন্দ্রের প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। এইজন্যে বহু স্থানে কৃত্তিবাসের ভাষা পর্যন্ত তাঁর নাটকের মধ্যে এসে গেছে। অনেক সময় মনে হয় গিরিশচন্দ্র বুঝি কোন মৌলিক নাটক লেখেন নি। তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশ বিশেষকেই যেন নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর 'রাবণ-বধ' নাটকে রাবণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি চরিত্র সজীব হয়ে উঠেছে গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব বর্ণনা গুণে।

('রাবণ-বধ' নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্র করেছিলেন করুণ রস, বীররস, ভক্তিরস, হাস্যরস প্রভৃতি নানা রসের সমাবেশ এবং বাঙ্গালী দর্শকের রসচিত্তে আনন্দদানে সমর্থ হয়েছিল এই নাটকটি। জনকনন্দিনীর দুঃখে সকল দর্শকই অশ্রু বিসর্জন করেছে, আবার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী হনুমান ও ত্রিজটার কথাবার্তায় হাস্যমুখরিত হয়ে উঠেছে প্রেক্ষাগৃহ। 'ভারতী' মাসিক পত্রিকা এই নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন।) কিন্তু হাস্যরসাত্মক দৃশ্যটি সংস্থাপনায় তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। হনুমান ও রাক্ষসী ত্রিজটার কথোপকথনের মধ্যে কিছু গ্রাম্য ও চলিত ভাষা প্রয়োগ হয়ত তাঁরা সমর্থন করতে পারেন নি। কিন্তু তৎকালে কোন রুচিশীল

দর্শকের কাছেই তা রুচিবিগর্হিত বলে মনে হয় নি। বরং সমগ্র নাটকের গম্ভীর পরিবেশে Relief Scene হিসাবে এই দৃশ্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল।

গিরিশচন্দ্র 'রাবণ-বধে'ই প্রথম প্রবর্তন করলেন ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ। চতুর্দশ অক্ষরের বন্দন থেকে অমিত্রাক্ষরকে মুক্ত করে গিরিশচন্দ্র তাকে দিলেন স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিবেগ—সৃষ্টি হল নাটকের উপযুক্ত ভাষা। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধনে আবদ্ধ এবং উহা আয়ত্ত করাও সাধারণ অভিনেতৃবর্গের পক্ষে কষ্টসাধ্য।

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নকসা'র প্রচ্ছদপটে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত একটি ক্ষুদ্র কবিতা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র এই নবতম গৈরিশী ছন্দ প্রবর্তনের। মুক্ত হরিণীর ন্যায় স্বচ্ছন্দ গতিতে চলমান, শ্রুতিমধুর, সহজ সরল গৈরিশী ছন্দ পরে গিরিশচন্দ্রের এবং অন্যান্য নাট্যকারের বিভিন্ন নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং নাটক-রচনার উপযুক্ত বাহনরূপে স্বীকৃত হয়েছিল। মাইকেল থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সূত্রপাত এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি অনেক নাট্যকারই ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন। সে ইতিহাস সকলেই জানেন। তাই এই ছন্দের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্যে আমরা যেতে চাই না। আমরা শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম এই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দকে এমন একটা সার্থক রূপ দিলেন যে, নাটকের অভিনয়-কালে সেকালের সুকণ্ঠ নটনটীগণের কণ্ঠে এই ছন্দের নাট্যাংশ আবৃত্তিতে যে শব্দঝঙ্কার সৃষ্টি হত, তাতে দর্শকগণ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। অনেকেরই এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এইরূপে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ঘসে মেজে যে গৈরিশী ছন্দ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ছন্দই হল নাটকের সম্পূর্ণ উপযোগী।

নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র ছিলেন অসীম শক্তিধর, শক্তি-চঞ্চল লেখক। বঙ্গীয় নাট্যশালাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁর লেখনী পরিচালিত হয়েছিল অপ্রতিহত গতিতে। সে অভিযাত্রায়

কোন দিন ক্লান্তি ছিল না,—কোন দিন চিন্তার দৈন্য এসে তাঁকে হতাশায় ম্লান করতে পারে নি। গিরিশচন্দ্রের স্বর্ণ-প্রসূ লেখনী থেকে তাই সৃষ্টি হয়েছে এমনই বিপুল সংখ্যক নাট্যসম্পদ যে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। পেশাদার নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পর দর্শকসংখ্যা খুবই নগণ্য থাকায় এক একটি নাটক বড় জোর দুই-তিন সপ্তাহ অভিনীত হত ; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির অনবদ্য অভিনয় এবং রঙ্গালয়ের উন্নততর দৃশ্যসজ্জা প্রভৃতির জন্য তাঁর সময় প্রথম দিকে দুই মাস পর্যন্ত একটি নাটকের অভিনয় চলত, পরে অবশ্য ছয় মাসও চলেছে। প্রতি দুই মাস অন্তর গিরিশচন্দ্র তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বারা নূতন নাটক রচনা করে, উপযুক্ত নাট্যশিক্ষা দান করে তাকে অভিনয়োপযোগী রূপে মঞ্চে উপস্থাপিত করতেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর অসামান্য শক্তির দ্বারা এইভাবে ৮০ খানি নাটক লিখেছেন। তাঁর নাট্যকার-জীবনের সমগ্র সৃষ্টির সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। সেইজন্য সে চেষ্টা আমরা করবনা এবং তার প্রয়োজনও নেই। আমরা কেবল এইটুকুই দেখাতে চাই, আর্য যুগের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে এবং বাংলাদেশে নাট্য-সংস্কৃতির যে ধারা আজ পর্যন্ত প্রবহমান, সেই ধারাকে গিরিশচন্দ্র 'রাবণ-বধ' নাটক লেখার পর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল ১৯১২ সাল পর্যন্ত কিভাবে পুষ্ট করে এসেছেন নাট্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রীতি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং রঙ্গালয় পরিচালনার মাধ্যমে। ইতিপূর্বে অনেককে বলতে শোনা গেছে যে, 'গিরিশ বক্তৃতামালার' বক্তারা জাতীয় রঙ্গালয়ের স্রষ্টা গিরিশচন্দ্রের প্রতি ঋণ স্বীকার করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই করে গেছেন, তেমন কোন সমালোচনা করে যান নি। আমিও ঠিক এই কথাই বলবো যে, আমি আজ এখানে এসেছি সেই অসামান্য নাট্যপ্রতিভা-সম্পন্ন নট, নাট্যকার, অভিনয়-শিক্ষক, প্রয়োগশিল্পী এবং বঙ্গরঙ্গভূমির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্রের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য,—শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে। তাঁর সমস্ত নাটকের সমালোচনা করতে আমি আসিনি এবং আমার পক্ষে তা' সম্ভবও নয়। প্রত্যেক সমালোচকেরই কোনও না কোন প্রবণতা থাকে এবং সেই প্রবণতা দিয়ে বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকেই

আমরা সব জিনিসের বিচার করে থাকি। তাই নিছক নিরপেক্ষ সমালোচনা বড় কঠিন।

(যাই হোক, আমরা এখানে এইটাই দেখাতে চেষ্টা করবো যে বঙ্গীয় নাট্য-জগতে গিরিশচন্দ্রের অবদান কতটুকু।) নাটক-রচনার ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং নবযুগ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেগুলির যথাযথ স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে আমরা গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক-গুলির মধ্য থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি মাত্র নাটককে বেছে নিয়ে সেগুলোর সম্বন্ধেই আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবো।

('রাবণ-বধের' অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে গিরিশচন্দ্র বুঝতে পারলেন যে, তিনি জাতির মর্মস্থলে রস সঞ্চার করার জন্য উপযুক্ত বিষয়বস্তুকেই নির্বাচন করেছেন। তখন গিরিশচন্দ্রের উৎসাহিত লেখনী থেকে সৃষ্টি হল তাঁর দ্বিতীয় পৌরাণিক নাটক 'সীতার বনবাস'। ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এই নাটকটির প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠান হয় ১৮৮১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে, এবং এর অভিনয় সর্বশ্রেণীর দর্শকের বিশেষ করে মহিলাদের হৃদয়কে অনায়াসে জয় করে নিতে পেরেছিল। রামায়ণের করুণতম অংশকে অবলম্বন করে যে নাটক গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন, তার সর্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয় যে করুণ রসের প্লাবন বহিয়ে দিয়েছিল তার তুলনা বিরল।) এই সময় থেকে বাংলার মা লক্ষ্মীদের আগমনের সাথে সাথে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিও বর্ষিত হয় বঙ্গীয় নাট্যশালার উপর, সেই সময় রঙ্গালয়কে ভদ্র, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ বেশ প্রীতির চক্ষে দেখতেন না, কারণ অভিনেতাদের মধ্যে পান-দোষের প্রাবল্য দেখা যেত। সেইজন্য ভদ্রলোকেরা মহিলাদের প্রায় নিয়ে আসতেন না রঙ্গালয়ে। কিন্তু 'সীতার বনবাসে'র অপূর্ব অভিনয়ের কথা শুনে ক্রমশঃ প্রচুর সংখ্যক মহিলা দর্শকের সমাগম হতে লাগল। 'সীতার বনবাস'ই প্রথম বাংলার মা জননীদের নাট্যশালায় অভিনয়-দর্শনে আগমনের জন্য সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। মায়েদের আগমনে বঙ্গীয় রঙ্গালয় ধন্য হল এবং সকল শ্রেণীর নরনারীই নির্মল আনন্দলাভের পীঠস্থানে পরিণত হল। মহিলাদের জন্য আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হল, এমন কি সারা ত্রিতলটিকে চিক দিয়ে

ঘিরে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের বসবার জন্য। 'সীতার বনবাস' যে শুধু একটি অভিনয়-সফল জনপ্রিয় নাটক মাত্র—তাই নয়, মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কবিত্ব শক্তির মহনীয়তা বহু ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই নাটকের মধ্যে। সীতার মধ্যে বাঙ্গালী নারীর চিত্র উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে। সীতার বনবাসে রামচরিত্র-অঙ্কণে গিরিশচন্দ্র পূর্ববর্তী মহাকবিদের অন্ধ-ভাবে অনুসরণ করেননি। তাই গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রামচন্দ্র নবরূপে রূপায়িত হয়েছিলেন। কেবলমাত্র প্রজানুরঞ্জনের জন্য বা লোকনিন্দার জন্যই সীতাকে নিষ্পাপ সতী জেনেও ত্যাগ করা মনস্তাত্ত্বিক বিচারে রামচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই গিরিশচন্দ্র মনে করেছিলেন। তাই রামচন্দ্রের সীতা-ত্যাগের একটা শক্তিশালী কারণ উপস্থিত করার জন্য তিনি রামচন্দ্রকে অঙ্কন করেছিলেন প্রণয় বিষয়ে সাধারণ মানুষের ন্যায় সংশয়াকুল ও ঈর্ষ্যান্বিত একটি চরিত্র রূপে। কৃত্তিবাস যা শুধু বর্ণনা করে গেছেন গিরিশচন্দ্র সেই সূত্রকেই রামচন্দ্রের সীতা-ত্যাগের হেতুরূপে ব্যবহার করেছিলেন। উর্মিলার অনুরোধে রাবণের একটি আলেখ্য অঙ্কন করেছিলেন সীতা এবং তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই তিনি সেখানে নিদ্রিতা হয়ে পড়েন। রাবণের আলেখ্যের পার্শ্বে সীতাকে নিদ্রিতা দেখে রামচন্দ্রের অন্তরে জ্বলে উঠেছিল সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা;—তাই রামচন্দ্রের ঈর্ষায়, সন্দেহে দগ্ধচিত্তে স্বগতোক্তি শোনা যায়—

"একি! রাবণের চিত্র হেরি!
ফলিল তারার অভিশাপ!
দুঃখানল, মন্দোদরি, নিভিল তোমার—
কলঙ্কিনী জনক নন্দিনী।"

ঈর্ষাবিষে জর্জরিত রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ডেকে বলেছিলেন—

'শুন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ,
দুষ্টা নারী সীতা,
চিত্রি রাবণের অবয়ব,
হানি বাজ লাজে,
স্বচক্ষে দেখেছি ঢালিয়াছে কায়,
রাক্ষস ছবির পরে।'

বিরহ-অনলে দগ্ধীভূত রামসীতার অলৌকিক প্রেমের নিকষিত হেম-দীপ্তি দীপ্যমান হয়ে উঠেছে গিরিশচন্দ্রের সীতার বনবাসের মধ্যে।

বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে 'সীতার বনবাসে'র দান কতটুকু, যদি আমরা বিচার করতে চাই,—তাহলে দেখব করুণ রসের সঙ্গে যে হৃদয়গ্রাহী বাৎসল্য রসকে একত্রে পরিবেশন করেছেন গিরিশচন্দ্র সেইটাই এ নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সাফল্যের মূল কারণ। করুণরস, মধুর রস, এমন কি বাৎসল্য রসও আমাদের দেশে কিছু নূতন নয়, কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে আমরা গোপালের প্রতি মা যশোদার বাৎসল্য রস উৎসারিত হতে দেখেছি। কিন্তু বাংলা নাটককে মঞ্চসফল করার জন্য এই বাৎসল্যকে নাটকের মধ্যে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন, সেই প্রয়োগটাই গিরিশচন্দ্রের অভিনব এবং সার্থক প্রচেষ্টা।

পতিগতপ্রাণা, সাধ্বী সীতা যখন বিনা দোষে, ঈর্ষা-জর্জরিত এবং লোকনিন্দাভীত স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হলেন তখন তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে, এইভাবে ঘৃণিতা হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার অধিকার তাঁর নেই। যখন পৃথিবীর সমস্ত স্নেহমায়া-বন্ধন ছিন্ন, পৃথিবীতে বাঁচবার যখন কোন প্রয়োজন নেই, ঠিক সেই সময়েই তিনি বুঝতে পারলেন যে, এখন তাঁকে বাঁচতেই হবে, কারণ তিনি সন্তানের জননী হ'তে চলেছেন—সন্তানকে স্নেহ দিয়ে ভালবাসার বারি-সিঞ্চনে সযত্নে লালন করে তুলতে হবে, কিন্তু তাঁর মত অনাথিনী কেমন করে সন্তান প্রতিপালন করবেন; অন্তরে তাঁর দারুণ আশঙ্কা আর উদ্বেগ—তাই মহর্ষি বাল্মীকির কাছে উৎকণ্ঠিতা সীতাকে বলতে শুনি—

> "আমি ওগো আজি কাঙ্গালিনী,
> পতি মোরে ঠেলেছেন পায়।
> আছে রামের সন্তান গর্ভে মম,
> কেমনে বাঁচাব,
> কেমনে রাখিব পাপ প্রাণ।"

সীতার হৃদয়ে নূতন করে জেগে ওঠে সন্তান-স্নেহের অনাস্বাদিত ক্ষুধা—তিনি তখন ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন সন্তানপ্রীতি, বাৎসল্যের অমৃতধারা—

"জগৎমাতা,
শিখাওগো দুহিতারে জননীর প্রেম !
ছিন্ন অন্ত্র ডুরি,
প্রেমে বাঁধা রেখো মা সংসারে ;
ওরে, কে অভাগা এসেছ জঠরে ?"

করুণ রসাত্মক পরিবেশের মধ্যে গিরিশচন্দ্র এমনভাবে বাৎসল্য রস উদ্রিক্ত করেছিলেন এবং তা' এতই মর্মস্পর্শী হয়েছিল যে, বাংলাদেশের মায়েরা রঙ্গালয়ে আসতেন জনমদুঃখিনী সীতার বেদনা-মধুর সন্তান-বাৎসল্য দেখে অশ্রু বিসর্জন করতে। শুধু মহিলাদেরই নয়, পুরুষদের ভারাক্রান্ত চিত্তও অজ্ঞাতসারে অশ্রু সজল হ'য়ে উঠত। দর্শকদের অন্তরে তখন বিরহিনী অথচ সন্তানবৎসলা সীতা এবং প্রাণ-জুড়ানো মধুর সংগীতময় লব-কুশের প্রতি যে অনুভূতির সঞ্চার হ'ত, তা সহানুভূতির চেয়েও অনেক বড় জিনিস—Psychologyর ভাষায় যাকে বলা হয় empathy. বাঙ্গালী কেন, এমন কি, রঙ্গালয়ের অবাঙ্গালী মালিক প্রতাপ জহরীও ভাল করেই বুঝেছিলেন যে, এই নাটকের লব-কুশই বাংলার নরনারীকে অভিনয়-দর্শনের জন্য আকর্ষণ করে নিয়ে আসছে—এই লব-কুশের দয়াতেই তাঁর প্রতি লক্ষ্মীর এত সদয় অনুগ্রহ।

তাই তিনি গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটক 'অভিমন্যু বধ' যখন সীতার বনবাসের ন্যায় বিপুলভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারে নি, তখন তাঁকে বলেছিলেন—"বাবু যব দোস্‌রা কিতাব লিখগে, তব ফিন্ ওহি দুনো লেড়কা ছোড় দেও।"

প্রতাপ জহরীর সনির্বন্ধ অনুরোধে লব-কুশকে পুনরায় নিয়ে আসার জন্য গিরিশচন্দ্রকে 'লক্ষ্মণ-বর্জন' নাটক লিখতে হয়েছিল। রামায়ণকে অবলম্বন করে দুটি নাটক লেখার পর গিরিশচন্দ্র মহাভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। রচিত হ'ল বীররসপ্রধান নাটক 'অভিমন্যুবধ'।

'অভিমন্যুবধ' গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকের মধ্যে বীররস থাকায় উত্তেজনা সর্বদা বিরাজমান। অভিমন্যু-চরিত্র বীরত্বে, তেজস্বিতায়, পত্নীপ্রেমে, জননীর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—suspense বা কৌতূহল 'অভিমন্যুবধ' নাটকটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্তরে স্তরে ক্রমশঃ চরম পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছেচে। অভিমন্যু যখন দুর্ভেদ্য ব্যূহের মধ্যে সপ্তরথী কর্তৃক বেষ্টিত, অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেও যখন তিনি নিজেকে বিপন্মুক্ত করতে পারছেন না, অর্জুন তখন সংসপ্তক যুদ্ধে নারায়ণী সৈন্যকে পরাভূত করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রথে করে ফিরে আসছেন—নিরুদ্ধ আগ্রহে দর্শকগণ তখন মনে করছেন—আহা, অর্জুন যদি ব্যূহ ভেদ করে অভিমন্যুর কাছে এসে পড়েন, তাহলে বীর বালকের জীবন রক্ষা পায়। ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ঘটনা-স্রোত বয়ে চলে। সিংহশিশুর ন্যায় বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে অস্ত্রহীন, ক্লান্ত, আঘাতে-জর্জরিত একাকী বালক অভিমন্যু সেই অন্যায় যুদ্ধে প্রাণ দিলেন।

প্রাণাধিক পুত্র হারাণোর পর অর্জুনের বিলাপ অতি শোকাবহ এবং হৃদয়ভেদী। নিস্তব্ধ, কোলাহলহীন, নিরানন্দ শিবির দেখে অর্জুনের চিত্ত সংশয়, সন্দেহে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল—তিনি সারথী কৃষ্ণকে বললেন—

"বিকল অন্তর,
অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয় ;
নহে, যে হৃদয় কাঁপে নাই কভু,
মহা অস্ত্র-দীপ্তি হেরি,
চাহে কাঁদিবারে উভরায়,
হীনমতি বালিকা যেমতি।
ঘোর কলরব—
বিজ্জল-হলহলা শুন কৌরবের দলে,
দম্ভে বাজে দামামা দগড়া ;
অন্ধকার পাণ্ডব-শিবির,
নাহি রব, প্রাণিশূন্য যেন,
চল দ্রুত পদে যদুবীর !"

শিবিরাভ্যন্তরে এসে যুধিষ্ঠির ও ভীমের বিলাপোক্তির মধ্য থেকে অর্জুন জ্ঞাত হলেন সপ্তরথী কর্তৃক অভিমন্যুবধের নিদারুণ সংবাদ। তাঁর পিতৃ-হৃদয় বেদনার আঘাতে ভেঙে পড়ল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা-বাণী শুনে অশান্ত হৃদয়াবেগকে সংযত করলেন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন। বীরের শোকে নিঃসারিত হ'ল বজ্রগর্ভ ভীষণ প্রতিজ্ঞার মধ্যে—

"হে মাধব!
মরে পুত্র জয়দ্রথ হেতু,
কালি তারে বধিব সমরে,
অস্ত না হইতে ভানু!
শুন শুন বীরভাগ! প্রতিজ্ঞা আমার,

* * * * *

কিন্তু,
শক্তি ধর যদি কেহ থাকে কোন স্থানে,
রথীন্দ্র সমাজে পূজ্য, রাখে জয়দ্রথে,
ধনু অস্ত্র না ধরিব আর,
মুক্ত কণ্ঠে কহিব ক্ষত্রিয় মাঝে,
ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে জন্ম নহে মম;
না হ'ল, না হ'বে কভু পিতৃলোক গতি;
অগ্নি কুণ্ড কাটি নিজ হাতে,
নিজ হাতে পঞ্চ চুলে সাজি,
প্রবেশিব বহ্নি মাঝে
পুনঃ কহি,
বীর কার্য দেখাইব কালি;
রুধিরে ডুবাব ক্ষিতি,
প্রেতাত্মার তৃপ্তি হেতু তার।"

কিন্তু প্রাণাধিক পুত্রের শোক কি সহজে বিস্মৃত হওয়া যায়? যত বড় বীরই হোন না কেন অর্জুন—তবু তিনি পিতা, পিতৃস্নেহের নির্ধারিত ধারাকে

কেমন করে রোধ করবেন তিনি, তাই ক্ষণকালের জন্য আবার ভেঙ্গে যায় সমস্ত সংযমের বাঁধ ;

বীর অর্জুনের পিতৃহৃদয় অসহ্য মর্ম-যাতনায় আর্তনাদ করে ওঠে—

"ওহো নিঃসহায় পড়েছে বালক,.
মৃত্যুকালে,
অবশ্য ডেকেছে মোরে কুমার আমার,
হায় হায়, ফেটে যায় বুক,
অভিমন্যু হত রণে !
তিন লোক কাঁপিতরে বাণে তোর,
হা হা পুত্র ? কোথা গেছ আমায় ত্যজিয়ে ?
কি ক'ব মায়েরে তোর,
কি কহিব গর্ভবতী উত্তরারে,
কহ মোরে শ্রীমধুসূদন।

অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং জীবন্ত হয়ে উঠেছে বীর অর্জুন এবং পিতা অর্জুনের অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর নাটক হওয়া সত্ত্বেও 'অভিমন্যুবধ' 'সীতার বনবাসের' ন্যায় সর্বশ্রেণীর দর্শকগণের চিত্তজয়ে সমর্থ হ'ল না। 'অভিমন্যুবধ' নাটকটি বিয়োগান্ত নাটক বলেই দর্শক সমাজে পূর্ববর্তী নাটক 'সীতার বনবাসের' মত আদৃত হয়নি। পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশ-চন্দ্র এই সর্ব প্রথম বিয়োগান্ত নাটকের অবতারণা করলেন। যে সময় মিলনান্ত যাত্রাভিনয় ও নাটক দেখতেই সকলে অভ্যস্ত এবং এই শ্রেণীর নাটকের প্রতি তাদের আন্তরিক সহানুভূতি বিরাজমান,—সেই যুগে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিয়োগান্ত নাটক রচনা করে গিরিশচন্দ্র একটা দুঃসাহসিকতার কাজ করেছেন বলা যায়। দর্শক সমাজও এই দুঃসাহসের প্রতিদান দিতে ভোলেনি, তাই নাটকটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

যে নাটকে নানাবিধ দুঃখকর বিচ্ছেদমূলক ঘটনার শেষে মিলন সংঘটিত হয়, সেখানে নূতন ক'রে কোন মিলন দৃশ্য ঢোকানর প্রয়োজন হয় না। কারণ স্বাভাবিকভাবেই সে নাটক মিলনান্ত, যেমন 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক।

কিন্তু যে নাটকে মিল থাকত না বিচ্ছেদের মধ্যে বিয়োগের মধ্যেই যার পরিণতি, তাকে'ও জোর করে মিলনান্ত করতে হ'ত। অভিমন্যুবধ নাটকের পরিণতি মিলনের মধ্যে হতে পারে না, কিন্তু সক্রিয় সেই নাটকেও মিলন-দৃশ্য সংযোজিত করা হ'ত।

অভিমন্যু মৃত্যুর পর শশধর রূপে স্বর্গে ফিরে গিয়ে রোহিণীর সঙ্গে মিলিত হ'তেন এবং নক্ষত্ররাজি নৃত্যগীতে দৃশ্যটিকে মিলন-মধুর করে তুলত। তখনকার দিনে মিলনান্ত অভিনয় দেখবার অভ্যাস এবং আগ্রহ কিরূপ ছিল, সে বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী এখানে বিবৃত করলে আমাদের মনে হয় প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে ধারণাটা খানিকটা স্বচ্ছ হ'বে। কাহিনীটি অবশ্য সম-সাময়িক কালের নয়, কিছু পরের; কিন্তু তা হ'লেও এর মধ্য দিয়ে বিষয়টা প্রাঞ্জল হ'য়ে উঠবে বলে আশা করি।

মফঃস্বলের কোন এক জমিদারের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে অভিনয় করবার জন্য ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় আমন্ত্রিত হ'লেন। ষ্টারের ম্যানেজার তখন নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। সম্প্রদায় নিয়ে তিনি সেখানে গেলেন। নির্দিষ্ট দিনে অভিনয় সুরু হল। অভিনয় হচ্ছে বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর'। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস খুবই জনপ্রিয়। জমিদারের নায়েব ষ্টারের 'চন্দ্রশেখর' অভিনয়ের খুব সুখ্যাতি শুনেই এঁদেরকে এখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। চন্দ্রশেখর বই পড়া বা অভিনয় দর্শন কোনটিই তিনি করে উঠতে পারেননি, কেবল নাম-ডাকের আকর্ষণেই জমিদার মহাশয়ের কাছে তিনি এই সম্প্রদায়ের নাম করেন এবং জমিদারও সানন্দে রাজী হন। যাই হোক, ষ্টার সম্প্রদায়ের অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকবৃন্দ অভিভূত। অবশেষে প্রতাপের মৃত্যুর মধ্যে নাটকের সমাপ্তি হল। যবনিকা পড়ে গেল। কিন্তু দর্শকরা যে যার বসেই আছে, আসন আর ত্যাগ করে না। কারণ, যাত্রায় যাকে বলে মেল্‌তা—সেই মেল্‌তা বা মিলন হলনা, অথচ নাটক শেষ হয়ে গেল, একি ব্যাপার? একি কখনও হতে পারে নাকি? তা'রা তো হতবাক? দর্শকরা আসন ত্যাগ করে না দেখে নাটক শেষ হয়ে গেছে জানাবার জন্যে ঢোল বাজিয়ে দেওয়া হ'ল।

তখনকার দিনে যাত্রায় ঐ রকম রীতি ছিল। ঢোল বাজান হ'লে অভিনয় শেষ হয়ে গেছে বলে সকলে জানতে পারল, তখন সকলে তো বিস্ময়-বিমূঢ়। একি কাণ্ড? বাড়িতে একটা শুভ কাজ, আর সেই উপলক্ষ্যে কিনা বিয়োগান্ত নাটকাভিনয়? এতো নিতান্ত অমঙ্গলের ব্যাপার। বাড়ির মেয়েরা তো এ ব্যাপারটা কিছুতেই সন্তুষ্টচিত্তে নিতে পারলেন না। সকলে গিয়ে ভীষণভাবে অনুযোগ করতে লাগলেন জমিদার বাবুর কাছে। তিনি তখন তাঁর ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, "থিয়েটারওলাদের বলে দিন এরকম বিয়োগান্তভাবে নাটক শেষ করলে চলবে না,—এ অত্যন্ত অকল্যাণকর হবে.—নাটকটিকে যেন তাঁরা মিলনান্ত করে শেষ করেন; বাড়ির মেয়েরাও এতে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন।" শুনে নাট্যাচার্য অমৃতলাল তো মহা সঙ্কটে পড়লেন। সে কি! বিচ্ছেদের ব্যাপারটাকে মিলনে শেষ করি কি করে? আর তার সময়ই বা কই? তিনি বললেন, "বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসেই তো বিচ্ছেদের মধ্যে শেষ হয়েছে. তাকে আমরা মিলনান্ত করব কি করে?" জমিদারের ম্যানেজার রুষ্ট হয়ে বললেন, "ওসব আমরা বুঝি না, বুঝতে চাই না, মেল্‌তা চাই।" অমৃত বাবু তখন দেখলেন মহা বিপদ, এতো বোঝালেও বুঝবে না, মেল্‌তা যদি না করি তাহলে হয়ত সাজপোষাক প্রভৃতি সব আটকেই রেখে দিবে, আর ভাগ্যে কি জুটবে কে জানে? তার উপর আবার মেয়েদের নিয়ে আসা হয়েছে অভিনয়ের জন্যে। জমিদারদের তখনকার দিনে দোর্দণ্ড প্রতাপ, তাঁরা যা খুসী করতে পারতেন—এমন কি হাতে মাথা কাটতে পারতেন - এখন এই জমিদারের অন্যায়ের জন্য যদি পরে মামলা করতে হয়, তাহ'লেও তো আসতে হবে এই জেলাতেই—তাঁরই হাতের মুঠোর মধ্যে, তিনি তখন চট্ করে উত্তর দিলেন—"আচ্ছা মেল্‌তাই হবে।" তিনি সাজঘরে এসে যা'রা সখী সাজে সেই মেয়েদের বললেন "তোমরা তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নাও,—নাচতে হবে; রংটং না মাখা থাকলেও চলবে। তারা তো অবাক, ইত্যবসরে কনসার্ট বাজতে সুরু হয়েছে,—দর্শকেরা শুনে আশ্বস্ত হয়েছে যে, অভিনয় শেষ হয়নি, আবার অভিনয় হবে। নাট্যাচার্য পরিকল্পনা করে নিলেন যে, শেষ

দৃশ্যে প্রতাপ শৈবলিনী বসে থাকবেন এবং তাদের সামনে সখীরা এসে নাচগান করবে। এইভাবে নৃত্যগীতময় মিলন দৃশ্যের মধ্যে নাটকের যবনিকাপাত হবে। তা'তে শ্যামও রাখা হ'বে, আবার কুলও থাকবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গান লিখে সুর দিয়ে গাওয়া তো মুশকিল্, তাহ'লে গানের ব্যাপারটা কি হবে? অমৃতলাল তখন বললেন ঠিক আছে,—গানের ভাবনা কি? হাতের কাছে 'আলিবাবা'র গান রয়েছে—

"চাঁদ চকোরে, অধরে অধরে।"

মরজিয়ানা আর হুসেনের মিলন-দৃশ্যে গাওয়া হয়, এই গানটা সকলেই জানে, এইটাই নাচের সঙ্গে গাইয়ে দেওয়া যাক্। ঠিক সেই মতই সব করা হ'ল। দর্শকেরা মেল্‌তা দেখে সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন এবং ষ্টার থিয়েটারের দলও মানে মানে কলকাতায় ফিরে আসতে পারলেন।

অনেক পরের যুগেও মিলনান্ত নাটকের জন্ত কি রকম আগ্রহ ও ব্যাকুলতা, সেটা আমরা দেখতে পেলুম; তাহ'লে গিরিশচন্দ্র যখন 'অভিমন্যু-বধ' নাটক লেখেন, সে সময়ে এই আকাঙ্ক্ষাটা দর্শকদের মধ্যে কত তীব্র ছিল সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। ঐ রকম পরিস্থিতিতে সাধারণ রঙ্গালয়ে বিয়োগান্ত নাটকের মত একটা নূতন জিনিসকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করাকে নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিকতা বলা যেতে পারে।

গিরিশচন্দ্র অতঃপর 'লক্ষ্মণ-বর্জন', 'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস' 'সীতাহরণ' নাটক উপহার দিলেন নাট্য-ভারতীর পাদপদ্মে। চরিত্র-চিত্রণের গুণে, ভাষার সাবলীলতায় এবং শক্তিশালী অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটক-গুলি দর্শক সমাজকে আকৃষ্টও করেছে, কিন্তু বাংলা নাটক বা নাট্যশালার ক্ষেত্রে তেমন কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান এই নাটকগুলির নেই। তাই আমরা এই সকল নাটক সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করতে চাই না। গিরিশচন্দ্র সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটকাভিনয়ের চলমান ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্ত অল্প সময়ের মধ্যে অনেক নাটক লিখেছেন—রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটিকা বা পঞ্চরঙ্ রচনা করেছেন, গীতিনাট্য প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু এর মধ্যে বেশির ভাগই শূন্ত স্থান পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে

যখন তিনি যথেষ্ট সময় পেয়েছেন, চিন্তা করার অবসর পেয়েছেন, কেবল মাত্র তখনই জন্মলাভ করেছে মহান নাটকগুলি। সেই জন্য যে সমস্ত নাটকের বঙ্গীয় নাট্য আন্দোলনের ধারাকে পুষ্ট করার মত সম্পদ ছিল সেই গুলির সম্বন্ধেই আলোচনা করবার চেষ্টা করব। ন্যাশন্যাল থিয়েটারে শেষ অভিনীত হয় 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটক।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির ভীড়ে হারিয়ে যাওয়ার মত নাটক এটি নয়—

ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে অনায়াসে দৃষ্টি-আকর্ষণকারী নাটক এই 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'—আপন শক্তিতে মহিমান্বিত অবিস্মরণীয়। গিরিশচন্দ্র যখন 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' লিখতে বসেছেন, তখন তাঁর লেখনী যথেষ্ট বলিষ্ঠতা অর্জন করেছে—সমস্ত ভয়-দ্বিধা-সঙ্কোচের অবসান হয়েছে। তাই নাটকের প্রায় প্রতিটি চরিত্র উজ্জলরূপে রূপায়িত হয়েছে। ছদ্মবেশী ভীম ও অর্জুনের বীর হৃদয়ে এবং পৌরুষে বারবার আঘাত এসে পড়েছে, কিন্তু তাঁদের সমস্ত ক্রোধকে অবদমিত করেছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্যের প্রতি সম্মান দিয়ে। যদি তাঁদের প্রতিশোধগ্রহণ-প্রচেষ্টার ফলে তাঁদের সত্যকার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে ; যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনলাভ আকাশ-কুসুমে পরিণত হ'বে, তাই তাঁদের এই কঠোর আত্মসংযম—ভ্রাতার জন্ত এই আত্মত্যাগ সত্যই অতুলনীয়। দ্রৌপদী তেজস্বিনী,—অজ্ঞাতবাসে কীচক কর্তৃক বিড়ম্বিতা দ্রৌপদীর নারীত্ব-গর্ব—মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখর দীপ্তির ন্যায় জ্বালাময়।

দৃপ্তকণ্ঠে তাই দ্রৌপদী ভীমকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—

"জানিতাম সহিবারে নারীর সৃজন—
সহগুণ পুরুষে অধিক দেখি।
শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত,—
ভার্যা ত্যজি রাজ্য যদি হয়,
অজ্ঞাত সময়—বণিতার বলাৎকার ?
ভার্যা হেতু পুনঃ কেবা যায় বনে !

ভার্যা মাত্র পণের কারণ ?
হীনপ্রাণা, নহি বীরাঙ্গনা,
কলঙ্কিনী দেহে কিবা কাজ।”

‘জনা’ ছাড়া আর কোথাও এই রকম জ্বালাময় ভাষা দেখা যায় না। কাশীরাম দাসে দ্রৌপদী চরিত্র এইরূপভাবে অঙ্কিত হয় নি।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নাটকে অর্জুন, ভীম, দ্রৌপদী, কীচক প্রভৃতি চরিত্র আপন বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। সে সময় ন্যাশন্যাল থিয়েটারও এক হিসাবে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিল যে, ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস’ নাটকটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলার মত প্রতিভাশালী অভিনেতৃগোষ্ঠী লাভ করেছিল।

গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ম’শায় বলেছেন যে, তখন যেন অভিনয় হত না—অভিনয়ের প্রতিযোগিতা হত। একথা সত্য। প্রত্যেক অভিনেতাই আপন আপন ভূমিকাটিতে কৃতিত্ব দেখাবার মত যথেষ্ট সুযোগ পেতেন।

একের পর এক অভিনেতা অভিনেত্রীরা রঙ্গমঞ্চে আসছেন এবং তাঁদের অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকচিত্তে উত্তেজনা ধাপে ধাপে উঠতে থাকে। ভীমরূপী অমৃতলাল মিত্র, দ্রৌপদীর চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী, এবং কীচকবেশী গিরিশচন্দ্র কীচক বধ অধ্যায়ে তাঁদের অনবদ্য অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকচিত্ত জয় করে নিলেন এবং দর্শকগণের বিস্ময়, কৌতূহল ও উত্তেজনাকে এমন চরম পর্যায়ে নিয়ে এলেন যে, মনে হ’ল এর পর আর কারও অভিনয় দর্শকচিত্তে রেখাপাত করতে পারবে না। কিন্তু উত্তরের সঙ্গে গোধন রক্ষা-কল্পে যাত্রাকালে অর্জুনবেশী মহেন্দ্রলাল বসু এমন অপূর্ব অভিনয় প্রদর্শন করলেন যে, তাঁর যাদুস্পর্শে দর্শকমণ্ডলী অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও শক্তিশালী নটের প্রাণবন্ত অভিনয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

এই রকম সমবেত অভিনয়-উৎকর্ষ আজকের দিনে দুর্লভ। এই নাটকটির অভিনয় করা খুব সহজসাধ্য ছিল না, এই নাটক জমান খুব শক্ত ছিল ;

কারণ নাটকটি যদিও বিরাট পর্বের অন্তর্ভূক্ত কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, তাহলেও এই নাটকের মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী নাট্যিক ধারাতে বিন্যস্ত হয়েছে—একটি কীচকবধ-প্রসঙ্গ এবং অপরটি উত্তর ও গোধন উদ্ধার প্রচেষ্টা। গিরিশচন্দ্রের সুনিপুণ লেখনী এই দুই ভিন্ন ধারাকে সুন্দরভাবে একই সঙ্গমে মিলিত করে নাট্য পরিবেশকে রসমধুর করে তুলেছেন। এই রকম দুটি কাহিনীর গঙ্গা-যমুনার ধারার প্রয়াগতীর্থ অন্য কোন নাটকে পূর্বে অথবা পরে লক্ষিত হয়নি।

গিরিশচন্দ্রকে ইতিপূর্বে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের পুরোপুরি অনুসরণ করতে দেখা গেছে,—মনে হয়েছে যেন তাঁদের কাব্যাংশেরই নাট্যরূপ দান করেছেন। কিন্তু 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' রচনাকালে গিরিশচন্দ্র নিজের উপর যথেষ্ট আস্থাশীল,—আত্মশক্তিতে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ। তাই পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস রচনায় তিনি কাশীরাম দাসকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেননি।

তিনি অভিনয়ের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করে. প্রয়োগ-শিল্পের দিকে তাকিয়ে কাশীরাম দাস-বর্ণিত কাহিনীর অনেক জায়গা পরিবর্জন ও পরিবর্তন করেছেন। সুশর্মা কর্তৃক রাজা বিরাটকে বন্দী এবং ভীম কর্তৃক বিরাটের মুক্তিলাভের কাহিনী গিরিশচন্দ্র বর্জন করেছেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতে কীচককে ভীম অপেক্ষা শক্তিশালী বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কীচককে বধ করতে ভীমকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল—তার জন্যে তাঁকে ভয়ানক দ্বন্দ্বযুদ্ধে রত হতে হয়েছিল।

কাশীরাম দাস লিখেছেন—

"মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জয়।
দশভীম হৈলে তার সম যুদ্ধে নয়॥
কৃষ্ণার ধরিয়া কেশে আয়ু হৈল ক্ষীণ।
বিশেষে চরণাঘাতে বল হৈল হীন॥
তথাপি বিক্রমে ভীমের নহে ঊন।
পদাঘাত দৃঢ় মুষ্টি হানে পুনঃ পুনঃ॥

আঁচড় কাঁমড় মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি।
ধরা ধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি ॥
কখন উপরে ভীম কখন কীচকে।
শোণিতে জর্জর অঙ্গ পদাঘাত নখে ॥" ইত্যাদি

কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁর মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন যে, এই যুদ্ধ-দৃশ্য ইত্যাদি মঞ্চের উপর অনেকক্ষণ দেখান সম্ভব নয়, তাই তিনি কীচককে ভীম অপেক্ষা হীনবল রূপে চিত্রিত করে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার নিধন পর্ব সমাপ্ত করেছেন। গিরিশচন্দ্র দেখালেন কীচক ও ভীম যুদ্ধ করতে করতে প্রস্থান করল, তারপর মঞ্চে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও স্বগতোক্তি। নেপথ্যে তখন ভীম ও কীচকের একটি ক্রুদ্ধ সংলাপ শোনা যায় এবং কিছুক্ষণ পরেই ভীম প্রবেশ ক'রে দ্রৌপদীকে বলেন—"কৃষ্ণা! কৃষ্ণা! মিটিল না তৃষা—মিটিল না তৃষা—অল্পঘায়ে ত্যজিল পরাণ।" গিরিশচন্দ্র এইভাবে মঞ্চে অভিনয়ের সুবিধার জন্য অনেক কিছু নূতন জিনিস আনবার চেষ্টা করেছেন,—তাঁর পরবর্তী নাটকের আলোচনার সময়ও এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে' গিরিশচন্দ্র নেপথ্যগীতি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু ঠিক মনোমোহনের মত নয়। তিনি একটি গানকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে দিয়েছিলেন এবং গানটিকে ব্যবহার করতেন যখন মঞ্চে-অবস্থিত অভিনেতা থাকতেন নিষ্ক্রিয়, নীরব।

এই নেপথ্যগীতি যে কেবল মনের কোন অভিব্যক্তি মাত্র প্রকাশ করত তা নয়, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও বিচিত্র দ্বন্দ্বময় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত।

এই নাটকের অভিনয়ের পর অভিনেতাদের বেতনবৃদ্ধি ব্যাপার নিয়ে প্রতাপ জহুরীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় গিরিশচন্দ্র সদলবলে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। দুই বৎসর কাজ করবার পর তিনি ন্যাশন্যাল থিয়েটার পরিত্যাগ করে তাঁর দলের অনেক জনকে নিয়ে বিডন ষ্ট্রীটে যেখানে পরবর্তী কালে মনোমোহন থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে গুর্মুখ রায়ের সহায়তায় ষ্টার থিয়েটার স্থাপনা করেন। তার দ্বারোদঘাটন-কার্য সম্পন্ন হয় ১৮৮৩ সালের আগষ্ট মাসে (বাংলা ১২৯০ সালের ৬ই শ্রাবণ) তাঁর রচিত নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'এর অভিনয় দ্বারা।

উচ্চ শ্রেণীর নাট্যত্ব এবং ভাবগাম্ভীর্যে নাটকখানি নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান, মঞ্চ-সাফল্যের দিক দিয়েও 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক সৌভাগ্যবান। তাই অনায়াসে অর্জিত হয়েছিল বিপুল জনপ্রিয়তার জয়মাল্য।

'দক্ষযজ্ঞের' দক্ষ চরিত্র গিরিশচন্দ্রের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। বাংলা নাট্য সাহিত্যে সমতুল অন্য কোন চরিত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রথম অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে উদ্যানে দক্ষ চিন্তান্বিত, কিন্তু তা'র মধ্যেও একটা মহিমাব্যঞ্জক ভাব পরিস্ফুট। দক্ষের বিভিন্ন আচার-আচরণের মধ্যে বাস্তবানুগতার পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষরাজ প্রজাপতি—প্রজার প্রতি তাঁর যথেষ্ট স্নেহ, শিবের প্রতি তাঁর অসীম ঘৃণা এবং শিবকে অপমানিত করার একটা দুরন্ত বাসনা, দক্ষ-চরিত্রে এ সকলই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই নাটকের পরিণতিও অতুলনীয় নাটকীয়তার চরমোৎকর্ষে, দর্শকের হৃদয়ানুভূতিকে করে তোলে অশান্ত আবেগে সংক্ষুব্ধ, উদ্বেলিত। অভিনয়ের দিক্ থেকে যা' আমরা শুনেছি তা' নূতন করে ব্যক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, অভিনয়-জগতে দক্ষ, শিব এবং সতী চরিত্রের অভিনয়—অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করেছিল,– যে অভিনয়ের কথা স্বচক্ষে দেখলেও ঠিক মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। আমরা চাক্ষুস না দেখলেও লেখার মধ্য দিয়ে একটা কল্পনা করতে পারি যে. দক্ষের মত পুরুষ কঠিন, অনমনীয় দৃঢ়তাসম্পন্ন একটি বিরাট পুরুষের চরিত্র—শক্তিশালী প্রতিভাধর অভিনেতা ব্যতীত অন্য কারোর জন্য গিরিশচন্দ্র সৃষ্টি করেন নি, আর তা'ছাড়া সাধারণ কারোর পক্ষে অসাধারণ চরিত্র রূপায়ণ সম্ভবও ছিল না। দক্ষযজ্ঞের মধ্যে আমরা দেখতে পাই গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের বাঁধাধরা রীতিগুলিকে একে একে অতিক্রম করেছেন। পূর্বে দূতের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য—ভগ্নদূতের মত আসরে এসে দু'একটি শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করেই তা'র প্রস্থান। কিন্তু গিরিশচন্দ্র দক্ষযজ্ঞে দূতের ভূমিকাগুলিকেও চরিত্রের মর্যাদা দান করেছেন। দু'একটি কথা বলেই দূতের ভূমিকা শেষ নয়, সেই চরিত্রেও তিনি অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাবার উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে গেছেন। দক্ষযজ্ঞে 'তপস্বিনী' গিরিশচন্দ্রের একটি অভিনব চরিত্র রূপায়ণ। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র ছন্দের পরিবর্তন সাধন

করেছেন ভাব এবং অভিব্যক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে। ভাঙা অমিত্রাক্ষরকেও তিনি ভেঙে ভেঙে গদ্য ছন্দে রূপান্তরিত করেছেন।

অনেক সমালোচক ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' প্রভাব দক্ষযজ্ঞের শিবের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন। কাহিনীর সাদৃশ্য থাকতে পারে কিন্তু এই দুই শিবের মৌলিক পার্থক্যটা তাঁরা লক্ষ্য করেন নি।

শিবায়ন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যেতে আমরা শিবদুর্গার কোন্দলের বর্ণনা পেয়েছি। শিবকে চাষীরূপে কল্পনা করা হয়েছে,—মানুষের দোষে-গুণে তিনি আমাদের খুবই পরিচিত,—দ্বন্দ্ব, কলহ প্রভৃতি তুচ্ছতায় দেবত্বহারা! অন্নদামঙ্গলের মধ্যেও শিব ও দুর্গার কলহপরায়ণ রূপই ফুটে উঠেছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কল্পনায় শিব—কোন্দলপরায়ণ চরিত্র নয়—তিনি কৈলাসপতি—যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেব,—নির্বিকার ধ্যানস্তিমিতলোচন—সমস্ত তুচ্ছতা, সঙ্কীর্ণতা, মায়া মোহ বন্ধনের অতীত। কিন্তু সতীকে লাভ করে তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে যেন মোহ-মায়া এসে প্রবেশ করছে।

ভারতচন্দ্র দেখিয়েছেন, দক্ষযজ্ঞের সময় সতী পিতৃ-গৃহে যেতে চাইলে—শিব বিনা নিমন্ত্রণে যেতে নিষেধ করলেন, সতী তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হয়ে কালী, তারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দশরূপে শিবকে ভয় দেখাতে লাগলেন।

ভারতচন্দ্রের ভাষাতেই বলি—

"যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হইলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥"

বিভিন্ন মূর্তি দেখে ভীত শিব অবশেষে কালী মূর্তির কথা শুনে সতীকে পিত্রালয়ে গমনে অনুমতি দিলেন। কিন্তু 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে গিরিশচন্দ্রের বর্ণনায়—শিব ও সতীর মধ্যে কোন উষ্মা বা ক্রোধের উত্তাপ মাত্র নেই। সেখানে সতীর কণ্ঠে মিনতি এবং গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট শিবের উক্তিতে সতীবিচ্ছেদ-আশঙ্কায় ব্যাকুলতার সুর। তাই সতীকে সেখানে বলতে দেখি—

"নাথ,
ধরি পায়, ক'র না নিষেধ।"

অভিমানাহত মহাদেব তখন বললেন—

"ইচ্ছা যাও, মোরে না শুধাও
চ'লে যাই হ'ল ধ্যানের সময়।"

শিব গমনোদ্যত হলে সতী কালী আদি বিভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করে শিবের মোহ এবং সতীকে নিয়ে ঘর বেঁধে শিবত্ব ত্যাগ করে ক্ষুদ্র কীট হয়ে থাকবার বাসনাকে দূরীভূত করলেন। যখন মহালক্ষ্মী রূপে সতী বলেছিলেন—

"যার তরে একার্ণবে শক্তির সাধন,
তা'র কথা করি অযতন—
কোথা যাও মহেশ্বর?"

তখন যোগীন্দ্রের মোহাবেশ ছিন্ন হ'ল।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—ক্ষীরোদ সমুদ্রে পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে শিব ও দুর্গার শুরু হয়েছিল যে সাধনা, সেই সাধনাতেই আজ শিথিলতা দেখা দিয়েছে, ধ্যান-তন্ময়তার শক্তি আজ মন্দীভূত। সতী, নন্দী ভৃঙ্গী, ভূত-প্রেত, প্রমথ প্রভৃতিকে নিয়ে গড়ে উঠছে তাঁর সুখের সংসার। তাই দুর্নিবার কাল-প্রবাহে এ সমস্তই একদিন ভেসে যাবে, মহাকালের অমোঘ নির্দেশেই দক্ষযজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণে সতীর গমন অবশ্যম্ভাবী; শিবনিন্দায় তাঁর দেহত্যাগ এবং সতীর সেই প্রাণহীন দেহ নিয়ে শিবের ত্রিভুবন ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিবের মোহ-মুক্তি কালচক্রের আবর্তনে অনিবার্য পরিণতি। দক্ষযজ্ঞে সতী এইভাবে দশ মহাবিদ্যার মূর্তি ধারণ করেছিলেন শিবের মোহনিদ্রা ভঙ্গের জন্য, সেখানে ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধির কোন প্রয়াস ছিল না।

নাট্য প্রচেষ্টার দিক থেকে দক্ষযজ্ঞ যে শুধু যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল তা নয়, নূতন মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে তাতে নবতর দৃশ্যপট সংযোজন করে তিনি বঙ্গীয় নাট্যশালায় মঞ্চসজ্জায় বিশেষ উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন।

মঞ্চাচার্য জহরলাল ধর অতি উচ্চস্তরের দৃশ্যপট সৃষ্টি করেছিলেন এবং বিশেষ করে মায়া-সৃষ্টিকারী (Illusion Scenes) দৃশ্যপটগুলি দর্শক সমাজের পক্ষে এক অপূর্ব মোহের সৃষ্টি করেছিল।

'দক্ষযজ্ঞে'র পর গিরিশচন্দ্র 'ধ্রুবচরিত্র' ও 'নল দময়ন্তী' নাটক রচনা করেন এবং এই নাটকগুলিও ষ্টার থিয়েটারে সগৌরবে অভিনীত হয়। কিন্তু এই সময় সাধারণ রঙ্গালয়ের সম্মুখে পুনরায় নেমে এল কৃষ্ণ যবনিকা। অসুস্থতা এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের জন্য স্বত্বাধিকারী গুর্মুখ রায় থিয়েটারটি বিক্রয় করতে উদ্যত হ'ন। গিরিশচন্দ্র তখন অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ চারজন কর্তৃক সংগৃহীত অর্থদ্বারা রঙ্গালয়টি ক্রয় করে উক্ত চারজনকেই স্বত্বাধিকারী নির্বাচিত করেন। এইভাবে নূতন উদ্যমে পরিচালিত রঙ্গালয়ে একে একে গিরিশচন্দ্রের 'কমলে কামিনী', 'বৃষকেতু' ও 'হীরার ফুল' এবং 'শ্রীবৎস চিন্তা' নাটকের সাফল্যজনক অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৮৮৪ সালের ২রা আগস্ট স্টারে অভিনীত হ'ল গিরিশচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর-বহনকারী যুগান্তকারী নাটক 'চৈতন্যলীলা'।

গিরিশচন্দ্রের অন্তরে আধ্যাত্মিক চেতনা ও ধর্মবিশ্বাসের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে 'চৈতন্যলীলা' নাটকের সম্পর্ক সুনিবিড়। তাই তাঁর ধর্ম-জীবনের সূত্রপাত সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে ছিলেন ঘোরতর নাস্তিক; যৌবনের উন্মাদনায় তিনি উদ্ধতভাবে অস্বীকার করতেন ভগবানের অস্তিত্বে। তিনি মনে করতেন, ঈশ্বর ব'লে কিছু নেই, প্রকৃতির নিয়মে সব পরিচালিত। একবার গিরিশচন্দ্র বিসূচিকা রোগে গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়েন। চিকিৎসকেরা তাঁর জীবনের সমস্ত আশা ত্যাগ করে চলে যান। এমন সময় গিরিশচন্দ্র সেই বেঘোর অবস্থাতেই যেন দেখতে পেলেন তাঁর পরলোকগত মা এসে তাঁর মুখে মহা-প্রসাদ দিয়ে গেলেন এবং বলে গেলেন—কোন ভয় নেই, তুমি ভাল হয়ে উঠবে। এই বিজ্ঞানের যুগে অনেকেই হয়ত মানতে চাইবেন না; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারপরই গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করলেন। এর সত্যমিথ্যা আমাদের বিচার্য নয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জীবনে এই ঘটনাটির প্রভাব বড় কম নয়, এই ঘটনাই নিয়ে এসেছিল তাঁর মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

নাস্তিক পরিণত হ'ল আস্তিকে—'সল' পরিণত হ'ল 'সেণ্ট পলে'। গিরিশচন্দ্র তখন থেকেই হলেন ধর্মবিশ্বাসী এবং ঈশ্বর যে আছেন এবিষয়ে

তাঁর অন্তরে দৃঢ় প্রতীতি জন্মাল। তখন থেকেই তাঁর সামনে এক বিরাট প্রশ্ন দেখা দিল—ভগবান্ তো আছেন, কিন্তু তাঁর দেখা পাওয়া যাবে কি করে? গুরু কে? কে দেবে সত্যকার পথের সন্ধান? তখনও হৃদয়ে তাঁর মদগর্ব,—কোন মানুষ কি কখনও তাঁর গুরু হতে পারে? মানুষের কাছে তিনি মাথা নোয়াবেন কি ক'রে? তাই তারকেশ্বরের তারকনাথকেই তিনি অবলম্বন করলেন। তাঁর প্রতি নিঃসারিত করে দিলেন তাঁর অন্তরের বিশ্বাসকে। এই সময় থেকেই তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে লাগলেন মহাপুরুষ ধর্ম-প্রচারকদের আলোকদৃপ্ত পুতঃ জীবনী গ্রন্থ। হয়ত এর মধ্য থেকেই তিনি দেখতে পাবেন বাঞ্ছিত পথের আলোকরেখা। পথের দিশারী মহামানবদের জীবনী-পাঠের সময় গিরিশচন্দ্র প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণব্যাকুলতার তীব্র আবেগ অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন গভীরতমভাবে।

চৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদ,—দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা এবং প্রেমের ধর্মে অমৃতময় হরিনামে সারাদেশকে প্লাবিত করার মধুর সাধনার বিবরণ গিরিশ-চন্দ্রের অশান্ত হৃদয়ে সৃষ্টি করল মাধুর্যরসঘন আধ্যাত্মিক জগতের ভাবময় পরিমণ্ডল। তিনি অসংকোচে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন শ্রীচৈতন্যকে অবতার,—রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু শ্রীকৃষ্ণরূপে,—তাই সমস্ত অহমিকাকে চূর্ণ করে গিরিশচন্দ্র সেই লীলাময়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন হৃদয়ের অকুণ্ঠ-শ্রদ্ধার্ঘ; তিনি রচনা করলেন চৈতন্যদেবের লীলা-কাহিনী—'চৈতন্য-লীলা'। কোন জীবনী-গ্রন্থ রচনা করলেন না—তাঁর অন্তর দিয়ে শ্রীচৈতন্যের যে মহাভাবকে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই অনুভূতিকেই তিনি রূপ দিলেন 'চৈতন্যলীলা' নাটকের মধ্যে। চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাসের অন্ধ অনুকরণে অথবা সমসাময়িক সমাজে চৈতন্যদেবের অবিসংবাদিত অবতার-স্বীকৃতিকে অনুসরণ করেই গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা' প্রণয়ন করতে অগ্রসর হন্‌নি—তাঁর অন্তর-রাজ্যের অনুভূতি এবং শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেমে সমর্পিত প্রেমমত্তার স্বরূপ উপলব্ধিই অনুপ্রাণিত করেছিল লীলাবর্ণনমূলক,—মহিমাজ্ঞাপক নাটক-রচনায়। তাই চৈতন্যদেবকে গিরিশচন্দ্র রক্তমাংসের মানুষরূপে চিত্রিত করেন নি, তিনি তাঁকে এঁকেছিলেন অবতাররূপে এবং

তাঁর নাটকের প্রথম থেকেই এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত। অনেকে বলেছেন, 'চৈতন্যলীলা' নাটকে চৈতন্যের মানবিকতার দিক্‌টা অস্বীকার করে গিরিশচন্দ্র মানুষ চৈতন্যের জীবনের বহুবিধ নাটকীয় উপাদানকে যথাযথ ব্যবহার করে একটি শক্তিশালী নাটক সৃষ্টির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমরা কিন্তু এই সত্যকে মেনে নিতে পারি না।

গিরিশচন্দ্র শ্রীচৈতন্যকে প্রথম থেকেই অবতার রূপে চিত্রিত করেছেন এবং যিনি অবতার, তাঁর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না, কারণ তিনি যে সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উর্দ্ধে, একথা ঠিক। কিন্তু একটা কথা আমাদের জিজ্ঞাস্য,—দ্বন্দ্ব বা conflict না থাকলে কি নাটক হয় না,—নাটকের মধ্যে conflict কি অপরিহার্য অঙ্গ? পাশ্চাত্য পণ্ডিত Aristotle এবং Horace এই conflict সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নি। ফরাসী নাট্য-সমালোচক Ferdinand Brunetiere এই 'Conflict Theory'র আবিষ্কর্তা। তাঁর আবির্ভাব হয় উনবিংশ শতকের শেষভাগে। William Archer কিন্তু এই theory-কে গ্রহণ করেন নি। তিনি তাঁর ১৯১৩ সালে প্রকাশিত 'Play making' গ্রন্থে এই বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, নাটকের মধ্যে conflict বা দ্বন্দ্ব থাকা অবশ্যপ্রয়োজন নয়। দ্বন্দ্ব না থাকলেও নাটক হতে পারে। যদি এই conflict খুঁজতে যাওয়া হয়, তাহ'লে পৃথিবীর বেশির ভাগ বিখ্যাত নাটকই তাদের নাটকত্ব হারাবে। Archer বলেছেন—

"The orthodox opinion of the present time is that which is generally associated with the name of the Late Ferdinand Brunetiere.

'The theatre in general', said that critic, "is nothing but the place for the development of the human will, attacking the obstacles opposed to it by destiny, fortune, or circumstances." And again: 'Drama is a representation of the will of man in conflict with the mysterious powers or natural forces which limit and belittle us; it is one of

us thrown living upon the stage, there to struggle against fatality, against social law, against one of his fellow-mortals, against himself, if need be, against the ambitions, the interests, the prejudices, the folly, the malevolence of those who surround him".*

Archer বলেছেন যে, সমস্ত নাটকের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপনের মোটেই উপযুক্ত নয় নাটকের এই সংজ্ঞা, কেবল Romance এবং অন্যান্য কাহিনীর ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তাই তিনি বলেছেন, "Many of the greatest plays in the world can with difficulty be brought under the formula, while the majority of romances and other stories come under it with ease. Where, for instance, is the struggle in the Agamemnon ?

There is no more struggle between clytem-nestra and Agamemnon than there is between the spider and the fly who walks in to his net. There is contest indeed in the succeeding plays of the trilogy : but it will scarcely be argued that the Agamemnon, taken alone, is not a great drama. Even the Oedipus of Sophocles, though it may at first sight seem a typical instance of struggle against Destiny, does not really come under this definition. Oedipus, in fact, does not struggle."

আবার অন্যত্র Archer-কে বলতে দেখি, "It is clearly an error to make conflict indispensable to drama ; and especially to insist as do some Brunetiere's followers—that the conflict must be between will and will. নাটকে conflict-এর অপরিহার্যতা

* 1. Etudes Critiques, Vol. VII P. P. 153 & 207.

অস্বীকার করেও Archer বলেছেন যখন কোন দ্বন্দ্ব চিত্রিত করা হবে, তখন তাকে যতদূর সম্ভব প্রকৃত এবং গভীর ভাবে ফুটিয়ে তোলার যেন চেষ্টা করা হয়। তাঁর কথাতেই বলি—"Though conflict may not be essential to drama, yet, when you get forth to portray a struggle, you may as well make it as real and intense as possible."

সুতরাং এই আলোচনা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি দ্বন্দ্ব না থাকলেও নাটক হয় এবং উচ্চ শ্রেণীর নাটক হতে পারে। 'চৈতন্যলীলা'য় গিরিশচন্দ্র প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেবের লীলা-বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রেমধর্ম-প্রচারের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন এবং এই নাটক-অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সে উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। আর তাছাড়া প্রত্যেকটি নাটকই তো কোন-না-কোনও উদ্দেশ্য বা আদর্শের প্রচারক। গিরিশচন্দ্র-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের মধ্যে নাটকের নায়ক হবার উপযোগী গুণাবলী নেই বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। প্রেম-ভক্তি ও বৈরাগ্য যে নাটকের উপজীব্য রস, সেই নাটকের নায়ক প্রেম-ভক্তি-বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি চৈতন্য ছাড়া আর কে হ'তে পারেন।

যে নাটকের অভিনয়ের অসামান্য সাফল্যে শুধু নাট্যক্ষেত্রেই নয় সমাজে, সংসারে, বঙ্গীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট চাঞ্চল্যকর, যুগান্তকারী প্রভাব দেখা দিয়েছিল—সে নাটকের নাটকত্ব যে কেমন করে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়, তা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের বুদ্ধির অগম্য। কোন নাটককে যদি রঙ্গালয়ের অভিনয় থেকে বিচ্যুত করে আবদ্ধ কক্ষে তার নাটকত্ব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা যায়, সেই পণ্ডিতের বিশ্লেষণে নাটকের যথাযথ মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব হতে পারে না। রঙ্গালয়ের বাইরে সমগ্র দেশব্যাপী 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়ের প্রভাব সম্পর্কে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুর অভিমত এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন—

"বখাটে নট ও অর্থাটি নটীবৃন্দ দ্বারা দেশে ধর্মপ্রচার হইল। ছিঃ ছিঃ! একথা মনে আসিলেও স্বীকার করিতে নাই, তাতে মহাপাপ আছে! কিন্তু কে জানে কেমন, তারিখে একটু গোলমাল করে, মনে হয় যেন এই নগণ

সম্প্রদায়কে 'জঘন্য' বেদীতে শ্রীকৃষ্ণমহিমা কীর্তন করিতে শুনিয়াই ধর্ম-বিপ্লবকারী বীরগণ অন্তরে ঈষৎ কম্পিত হইলেন, আর ধর্মপ্রাণ নিদ্রিত হিন্দু জাগরিত হইয়া ব্রজরাজ ও নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্বমোহন প্রেম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, গীতা ও চৈতন্যচরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া সগর্বে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।"

এইভাবে 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়-দর্শনে সারা বাংলা দেশে হরিনামের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই নাটকটির অভিনয় দেখার জন্য প্রথম রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন এবং অভিনয়-দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

(ঐতিহাসিক নাটকের যুগে গিরিশচন্দ্র যেমন একদা পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ের সূত্রপাত করে জনসাধারণের রুচি, চাহিদা ও রসবোধের গতিকে পরিবর্তিত করেছিলেন, তেমনি বলিষ্ঠতার সঙ্গে দুঃসাহসভরে জীবনী-নাট্য-রচনার মাধ্যমে নবতম রস পরিবেশন করলেন বাঙ্গালী দর্শকদের নিকট।

তখনকার পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তার দিনে এবং বহুল পরিমাণে শাক্ত অধ্যুষিত শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পীঠস্থান কালীঘাট-সমন্বিত কলকাতায় মহামানবের জীবনী-নাট্য-প্রদর্শনের প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনব—এবং দুঃসাহসিক। কিন্তু তবু সেদিন গিরিশচন্দ্রকে ব্যর্থ হতে হয় নি। তিনি লাভ করেছিলেন সাফল্যের জয়মাল্য।)

'চৈতন্যলীলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের ১ম ও ২য় গর্ভাঙ্কে গিরিশচন্দ্র পাপ, কলি এবং ষড়রিপুদের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে যেভাবে নাটকের মূলতত্ত্ব ও পরিণতির ইঙ্গিত দান করেছেন—নাটকের প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের প্রচেষ্টারূপে অভিহিত করা যায়।

'চৈতন্যলীলার' পর 'প্রহ্লাদ-চরিত্র', 'নিমাই-সন্ন্যাস', 'প্রভাস-যজ্ঞ', 'বুদ্ধদেব-চরিত' প্রভৃতি নাটক গিরিশচন্দ্র কর্তৃক রচিত হয় এবং স্টারে এই সকল নাটক প্রশংসনীয়ভাবে অভিনীত হয়। 'বুদ্ধদেব-চরিত' Sir

Edwin Arnold এর 'Light of Asia' কাব্য অনুসরণ করে রচিত হয়েছিল এবং Arnold সাহেব তাঁর দেশভ্রমণ-কালে কলকাতায় এসে এই নাটকের অভিনয় দেখে—এই নাটকটিকে গভীরভাবসম্পন্ন নাটকরূপে অভিনন্দিত করে গেছেন।

এরপর স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' অভিনীত হয় ১৮৮৬ সালের ১২ই জুন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নাটকে রূপায়িত হয়েছে রূপজ প্রেম থেকে রূপাতীতের প্রতি প্রেমের ত্যাগ-বৈরাগ্যময় কাহিনী। প্রেম ভক্তি-বৈরাগ্য এবং দার্শনিকতার অপূর্ব সমন্বয় এই নাটক। নিখুঁত মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত এবং চিরভাস্বর। রসবেত্তার কাছে, দার্শনিকের কাছে, মনস্তাত্ত্বিকের কাছে, ভক্ত, প্রেমিক সকলের কাছেই বিল্বমঙ্গলের নাট্যরস সমান আকর্ষণীয়। গিরিশচন্দ্র ভক্তমাল গ্রন্থে সুরদাসের জীবনী পাঠ করে এই নাটক রচনা করতে প্রবৃত্ত হন নি, তিনি এই আখ্যান শুনেছিলেন তাঁর গুরুদেব ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখের বর্ণনা থেকে। রামকৃষ্ণদেবই গিরিশচন্দ্রকে তাঁর এই নাটকে একটি ভণ্ড সাধুর চরিত্র দেবার জন্য বলেছিলেন, এমন কি লোক দেখান তিলক সেবাকারী সাধকের চরিত্র তিনি নিজে অভিনয় করে গিরিশচন্দ্রকে দেখিয়েছিলেন।

'বিল্বমঙ্গল' নাটকে সাধক চরিত্র-সৃষ্টির অনুপ্রেরণা গিরিশচন্দ্র এইভাবে পেয়েছিলেন। এই নাটকের অপূর্ব চরিত্র—'পাগলিনী'ও গিরিশচন্দ্রের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে একটি পাগলী প্রায়ই যাওয়া-আসা করত। তার অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বহু কাহিনী শুনেছিলেন এবং সেই সকলের মধ্যেই নিহিত ছিল গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের 'পাগলিনী' চরিত্রের মূলসূত্র। এই 'পাগলিনী' চরিত্রটি সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ, কোনও অবাস্তবতা এবং আদর্শ ও কল্পনার অনুরঞ্জন এই চরিত্র-পরিকল্পনায় লক্ষিত হয় না। পাগলিনীর ছদ্মবেশে যাত্রার বিবেক প্রভৃতির ন্যায় আধ্যাত্মিক বাণী শোনান বা মুক্তিপথের সন্ধান দেওয়াই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বিবাহের রাত্রিতে স্বামীহারা সংসার

কর্তৃক লাঞ্ছিতা নারীর মর্মযাতনাও এর মধ্যে পরিস্ফুট এবং উন্মাদিনীর অসংলগ্নতা, চিত্তের সামঞ্জস্যহীনতা, তার কথায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে তাকে পুরোপুরি পাগলিনীতে পরিণত করেছে। তবে এই পাগলিনী—সাধিকা পাগলিনী, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী—তার সংগীতের মধ্যে তাই সাধনার বিকাশ ক্রম প্রকাশমান। এই পাগলিনী চরিত্র গিরিশচন্দ্রের একটি উল্লেখযোগ্য চিত্রায়ন।

চৈতন্য-চরিতামৃতের কৃষ্ণদাস গোস্বামী যে বলেছেন—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম।"

—সেই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাই ক্রমশঃ বিল্বমঙ্গলের মধ্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছারূপ প্রেমে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। যে গভীর নারীপ্রেমে একদিন বিল্বমঙ্গল কাষ্ঠ মনে করে শবদেহ ধরে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, নদীর উত্তাল তরঙ্গমালা পার হয়েছিলেন, রজ্জুভ্রমে সাপের লেজ ধরে প্রাচীর লঙ্ঘন করে প্রেয়সী এক বীরাঙ্গনার সাথে মিলিত হতে ছুটে গিয়েছিলেন,—সেই দুর্নিবার পার্থিবরূপ তৃষা—পরিণতি লাভ করল স্বাভাবিকভাবেই অরূপ, অসীম, লীলাময়ের প্রেমে।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রধান দূত দর্শনেন্দ্রিয়। দর্শনই হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে নানা তরঙ্গোচ্ছ্বাস, ঘটায় চিত্ত-চাঞ্চল্য। পৃথিবীর অনন্ত সৌন্দর্যের রূপে বিভোর সাংসারিক জীব—এই মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টির দ্বারাই।

বিল্বমঙ্গল যে বলেছিলেন—

"আরেরে নয়ন,
মন্মথের তুইরে প্রধান সেনাপতি!"

একথা অত্যন্ত সত্য। তাই গভীর বৈরাগ্যে যে সংসারের সমস্ত কিছু আকর্ষণ ত্যাগ করে বৃহত্তর জগতের মহত্তর প্রেমের সন্ধানে চলে এসেছে—সেই সাধক অন্তরেও নূতন করে রঙ ধরেছিল সুন্দরী রমণী অহল্যাকে দেখে এবং প্রমাণিত হয়েছিল পূর্ব সংস্কার, কামনার তীব্র আকর্ষণ সহজে যাওয়ার নয়, গভীর বৈরাগ্যের মধ্যে, কঠিন তপস্যার

মধ্যেও চলে পুষ্পধনুর বিজয় অভিযান। তাই বিশ্বামিত্র ঋষিরও পদস্খলন ঘটে, পরাশর মুনির চিত্তবিভ্রম দেখা দেয়। এই সকল উচ্চ-মার্গের তপস্বীদেরও যদি চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখা দিয়ে থাকে তো বিল্বমঙ্গলের মত সন্ত বিরাগীর অন্তরেও নারীর রূপাকাঙ্ক্ষা ও ভোগলালসা জেগে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

সেই মোহমুগ্ধতার প্রধান বাহন চক্ষুর্দ্বয়কে অনায়াসে, বিনা দ্বিধায় অন্ধ করে দিলেন বিল্বমঙ্গল—তিনি প্রার্থনা করলেন অন্তরের অম্লান, শুভ্র সমুজ্জ্বল প্রেমদৃষ্টি, স্বচ্ছ দিব্য দৃষ্টির সহনীয়তা। সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করে অন্তরের আলোক ছাড়া তো সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার সন্ধান পাওয়া যায় না। পরিশেষে তিনি ধন্য হলেন দিব্য দৃষ্টি লাভ ক'রে—সার্থক হল তাঁর আত্মসমর্পিত গভীর বৈরাগ্য, চির-আকাঙ্ক্ষিত চির-প্রার্থিত কৃষ্ণ-দর্শন বিল্বমঙ্গলের এবং অন্যান্য ভক্তদের জীবনে সঞ্চার করল স্বর্গীয় পুলক রোমাঞ্চ—অপার্থিব আনন্দচপলতা।

বিল্বমঙ্গল নাটকটির কোন স্থানে কোন অসঙ্গতি নেই, কোন চরিত্রের পরিণতিই আকস্মিক নয়, প্রতিটি চরিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। বিল্বমঙ্গলের পরিবর্তন আকস্মিক নয়, বরং বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গতিপূর্ণ ফলশ্রুতি। কিন্তু চিন্তামণির বৈরাগ্যোদয় কারো কারোর মতে সম্পূর্ণ আকস্মিক, তার কোন পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল না। যাঁরা একথা বলেন, তাঁদেরকে আর একবার নাটকটির তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পাগলিনীর সঙ্গে চিন্তামণির কথোপকথন অংশটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি, তাহলে তাঁরা দেখতে পাবেন চিন্তামণির পরিবর্তনেরও ক্ষেত্র পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল।

তার মধ্যেও গভীর ভালবাসা ফল্গুনদীর ন্যায় গোপনে বিরাজমান ছিল, সংস্কারের বাঁধনে, অহঙ্কারের আবরণে তা আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের বৈরাগ্য দেখার পর থেকে ধীরে ধীরে একটি একটি করে শতদলের দলগুলি খুলে যেতে লাগল এবং পরিশেষে তার অন্তরের গোপন সত্যকে উজ্জ্বল দিবালোকে উদঘাটিত করে দিল।

সেক্‌স্‌পীরীয় নাট্যরীতির সঙ্গে এদেশীয় যাত্রার সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য নাটকে অনেক সময় লক্ষিত হলেও বিল্বমঙ্গলের মধ্যে এই সমন্বয় অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর। এই নাটকে যাত্রার ন্যায় সংগীতাধিক্য রয়েছে—কিন্তু প্রতিটি গীত এতই সময়োপযোগী এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে যে, সেগুলি পাত্রপাত্রীর মনোবিশ্লেষণের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছিল এবং তাদের হৃদয়াবেগকে করে তুলেছিল তীব্রতর ও অনুভূতিশীল।

বিল্বমঙ্গল অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় নাটকীয় গতিও রুদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বস্তুতঃ তা' হয়নি। রূপসৌন্দর্যে মন-মোহ-করা বিশ্বভুবন বিল্বমঙ্গলের চোখের সামনে থেকে দূরে সরে গিয়েছিল বলেই কি তাঁর অন্তরের সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছিল ?

তখন তাঁর হৃদয়ানুভূতি অত্যন্ত সজীব, সক্রিয় এবং সংবেদনশীল। দর্শনেন্দ্রিয়কে পঙ্গু করে দিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্রীভূত করে—এক আনন্দময় সত্ত্বা—প্রেম-মাধুরী মাখা শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেও বিল্বমঙ্গলের অন্তরে আশঙ্কা ঘোচে না—সদা-ব্যাকুলিত না-পাওয়ার ভয়ে সর্বদা কণ্টকিত। রাখালের প্রতি ভালবাসা—রাখালের দুর্নিবার আকর্ষণ বুঝি তাঁকে কেন্দ্রচ্যুত করবে—লক্ষ্যভ্রষ্ট করে পথভ্রান্তি ঘটাবে। তাই সংশয়-ব্যাকুল, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় দোদুল্যমান বিল্বমঙ্গলের কণ্ঠে শুনতে পাই খেদোক্তি—

"ওঃ! রাখাল আমার সর্বনাশ করলে, আমি কোন মতেই তা'রে ভুলতে পারিনি। আরে মহাপাতকী, তুই মহামোহে বদ্ধ, তুই কৃষ্ণদর্শন করবি কি ক'রে? দেখি—আর সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখি, যদি মনস্থির করতে না পারি, ত আত্মহত্যা করব। একি! আমার প্রাণের উপর দুরন্ত আধিপত্য রাখাল কিরূপে কর্লে? কে ও রাখাল, আমার কাল হয়ে এল? হা কৃষ্ণ।" অন্ধ অবস্থাতেও বিল্বমঙ্গলের অন্তর্দ্বন্দ্ব বড় কম নয়। তবে নাটকের এই অংশে ভক্তিরস, প্রেমরসের জোয়ার এসে আবেগের তটভূমিকে পরিপ্লাবিত করেছে—রসিক ও বোদ্ধা দর্শকদের হৃদয়ে সৃষ্টি

করেছে রসঘনভাবমণ্ডল। সর্ববিষয়ে নিখুঁত, ত্রুটিশূন্য, চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ মধুর অপূর্ব রস প্রেম ও দার্শনিকতায় অভিমণ্ডিত এই নাটকখানি বিশ্বনাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদীপ্তমান হ'য়ে থাকার মত কালজয়ী নাটক। এই গ্রন্থখানি বার বার পাঠ করেও স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় দার্শনিক সাধকের আশা মেটেনি। তিনি অসঙ্কোচে এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে বলেছিলেন—এই 'বিল্বমঙ্গল'খানি মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকগুলি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিল্বমঙ্গলের গান গাইতে স্বামীজী অত্যন্ত ভালবাসতেন। স্বামীজীর মত রসিক, দার্শনিকও আধ্যাত্মিক জগতের জ্যোতির্ময় পুরুষের উক্তির মূল্য কখনই কম নয়।

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেষ্ঠ নাটক 'বিল্বমঙ্গল' সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রচার বা ব্যাখ্যা কতটুকু হয়েছে—বিদেশীরা এর পরিচয় কতটুকু জানে—একথা যখন আমরা চিন্তা করি তখন আমাদের হৃদয়ে দুঃখের অবধি থাকে না।

সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের এত খ্যাতি কি তাঁর জীবিতকালে বা তাঁর পরবর্তীকালে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই হয়েছে?

তার পেছনে রয়েছে প্রায় ৪০০ বৎসরের প্রচার, ব্যাখ্যা, অভিনয় এবং আন্তরিক উদ্যম। ইংরেজরা যেখানেই উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং যেখানেই ইংরাজী ভাষাভাষি লোকেদের বাস, সেইখানেই চলেছে সেক্‌স্‌পীয়ারের নাট্যশৈলীর উপযুক্ত ব্যাখ্যা এবং সাধারণ্যে প্রচার-প্রচেষ্টা ও অধ্যয়ন। তাই আজ সেক্‌স্‌পীয়ারের নাম বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তবে একথা ঠিক, উচ্চাঙ্গের নাট্যপ্রতিভা না থাকলে কোন প্রকারে কিছু হয় না, সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। আমাদের দেশে গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে গবেষণা আমরা কতটুকু করেছি? কতটা চেষ্টা করেছি তাঁর নাট্য-অবদানের যথার্থ মূল্যায়নের এবং দেশে বিদেশে তাঁর অমর প্রতিভার কালজয়ী সৃষ্টিগুলিকে প্রচার করতে কতটা উদ্যোগী হয়েছি আমরা?

তাই গিরিশচন্দ্রের সত্যকার স্বরূপ আজও সকলের কাছে বিদিত নয়—বিদেশীদের কাছেতো কথাই নেই। আমাদের দেশে এখনও রসজ্ঞ

গিরিশচন্দ্র সেক্‌স্‌পীয়ারের এবং পাশ্চাত্য অন্যান্য নাট্যকারের নাটকাবলী গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাঁদের নাটকের নাট্যসত্বার স্বরূপ তাঁর কবি হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নবরুচি প্রবর্তনের বাসনায় মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটক অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ হয়েছিল অতি প্রাঞ্জল, মূলানুসারী এবং অতি উচ্চাঙ্গের।

সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের অন্তর্নিহিত ভাব গিরিশচন্দ্রের অনুবাদে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ও অবিকৃতভাবে বিরাজমান।

১৮৯৩ সালের ২৮শে জানুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয় 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রথম অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। পণ্ডিত ও উচ্চস্তরের দর্শক মহলে এই নাটকের অভিনয় অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছিল। এমন কি যে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা বাঙ্গালীর কোন জিনিসকে কোন দিনই সু-চক্ষে দেখতে পারে নি, বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সময়ও যথেষ্ট অপ্রসন্ন হয়ে কটূ ভাষণে মুখর হয়েছিল, সেই ইংলিশম্যানও গিরিশচন্দ্রের অনূদিত 'ম্যাকবেথে'র অভিনয়-দর্শনে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল,—ইংলিশম্যানের সম্পাদক এ বিষয়ে লিখেছেন—

'A Bengali Thane of Cawder is a lively suggestion of incongruity, but the reality is an admirable reproduction of all the conventions of an English Stage.'

জ্ঞানী-গুণী-বিদ্বদ্ সমাজে উচ্চপ্রশংসিত হ'লেও সাধারণ দর্শক সমাজের নিকট এই নাটকটির অভিনয় খুব সমাদর লাভ করল না। বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ ভক্তি রসাশ্রিত হৃদয়ে এই নাটকটি তেমন রেখাপাত করতে সমর্থ না হওয়ায় ব্যবসায়িক দিক দিয়ে রঙ্গালয় লাভবান হ'ল না। এইভাবে সাধারণ দর্শকের আগ্রহহীনতা লক্ষ্য করে গিরিশচন্দ্র অনুবাদ মূলক নাটক রচনা থেকে সম্পূর্ণ বিরত হলেন। গিরিশচন্দ্র যদি আরও কয়েকখানি বিদেশী নাটকের সার্থক ও সাফল্যজনক অনুবাদ করে বঙ্গীয় নাট্যভারতীকে উপহার দিতে পারতেন, তাহ'লে হয়ত এদিক দিয়ে তিনি তাঁর স্থায়ী অবদান রেখে

যেতে পারতেন। কিন্তু সে বিষয়ে বাঙ্গালী নাট্যামোদী সাধারণ তাঁদের নিজেদের ঔদাসীন্য-প্রদর্শনের জন্যই সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

সেই জন্য গিরিশচন্দ্রের এই অনুবাদ-নাটকটি সম্পর্কে আমরা অধিক আলোচনা করার প্রয়োজন দেখি না। গিরিশচন্দ্র প্রধানতঃ পৌরাণিক, ধর্মমূলক ও ভক্তিরসাত্মক নাটকের কৃতী নাট্যকার। কিন্তু সামাজিক, ঐতিহাসিক বহু জনপ্রিয় নাটকও তিনি রচনা করেছিলেন।

তিনি যখন ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন—তার পূর্বে তাঁকে গভীর ভাবে বহু গ্রন্থ অধ্যয়নের মধ্যে নিমগ্ন হতে দেখা গিয়েছিল সত্য ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য। তিনিই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক লিখতে গিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করে সত্যকার ইতিহাস সংগ্রহ করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। তাই সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাসিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে সত্য যথাযথভাবে রূপায়িত হয়েছিল। তবে নাটকের প্রয়োজনে কিছু চরিত্র ও ঘটনার উপস্থাপনা তাঁকে করতে হয়েছিল ঐ সকল নাটকের মধ্যে নাটকত্ব আনবার জন্যে। জাতীয়তা ও প্রেমের উদ্বোধনের কালে রচিত তাঁর ঐ সকল নাটকে ঐ ভাবকে উদ্দীপিত করে তোলার জন্য গিরিশচন্দ্র মনে প্রাণে আগ্রহশীল ছিলেন এবং তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পেরেছিলেন, দেশবাসীর অন্তরে তিনি জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতা অনুপ্রাণিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিহাস, জাতীয়তাবোধ ও রস সাহিত্যের অপূর্ব সমন্বয়ে গিরিশচন্দ্র অভিনব সার্থক ঐতিহাসিক নাটক রচনা ক'রে জাতীয় সংগঠন আন্দোলনের ইতিবৃত্তেও স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

একথা আমরা পূর্বেই বলেছি যে, গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার পূর্ণ চন্দ্রোদয় হয়েছিল পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকগুলির মধ্যে। এই শ্রেণীর অন্যতম চরিত নাটকের চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষিত হয় তাঁর 'শঙ্করাচার্য' নাটকে। অদ্বৈতবাদের ন্যায় জটিল নিগূঢ় তত্ত্বের রসময় ব্যাখ্যা গিরিশচন্দ্রের ন্যায় যুগান্তকারী প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। উন্মাদনাবিহীন, নীরস বিষয়বস্তু নিয়ে, একজন বেদান্তের বাণী-প্রচারক মহামানবের চরিত্রকে

গিরিশচন্দ্র অদ্ভুতভাবে সমৃদ্ধ ও রসঘন করে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তাঁর অসামান্য নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দান করেছিলেন। নাট্য জগতে সেদিন নবযুগের সূচনা হ'ল। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমস্ত শ্রেণীর দর্শকই সেই অপূর্ব নাটকের অনবদ্য অভিনয় দর্শনের জন্য অধীর আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠল। রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্য নাটকের অভিনয় সেদিন সৃষ্টি করেছিল নবতম বিস্ময়কর ইতিহাস। মঞ্চ-সাফল্যের দিক দিয়ে এই নাটকখানি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—অদ্বিতীয়।

নাট্যরসিক মহলে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল যে এই নাটকের প্রচারের জন্য ডঙ্কা-নিনাদের প্রয়োজনীয়তা হ'ত না। প্রচার-পত্রে তখন লেখা থাকত—

"প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ সূর্য দেখায় না।"

ধর্মমূলক নাটকে ভক্তিরসের পরিবর্তে জ্ঞানযোগের দুরূহ এবং গভীরতম গুহা নিহিত তত্ত্বকে অপূর্ব রসাশ্রিত করে বঙ্গীয় নাট্যামোদী জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করেছেন গিরিশচন্দ্র। ধর্মমূলক নাটকের ভিন্নতর রস-পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তিনি দর্শক সমাজের রুচি ও মানসিক প্রবণতার গতিপথকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

(গিরিশচন্দ্র বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি একাধারে নাট্যকার—অভিনয়-শিক্ষাদাতা, নাট্য-সংস্কারক, আদর্শবাদী, অধ্যাত্ম দৃষ্টি-সম্পন্ন পুরুষ। বাংলার নাট্যজগতকে তাই তিনি পরিপুষ্ট করে যেতে পেরেছেন তাঁর নানা-বিষয়িণী প্রতিভার সমবেত প্রাচুর্যে। বিভিন্ন বিষয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার-জীবন সার্থক হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন অভিনেতা—দর্শকদের হৃদয়-নদীর জোয়ার-ভাটার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ।

তাই তাঁর নাটকে সন্ধান পাওয়া যায় জনচিত্তগ্রাহিতার বহুবিধ উপাদান। তাই তাঁর নাটকগুলি বিস্ময়করভাবে মঞ্চসফল। পৌরাণিক, ধর্মমূলক, সামাজিক, ঐতিহাসিক সকল শ্রেণীর নাট্যপথেই গিরিশচন্দ্রের পদক্ষেপ ঘটেছে এবং কৃতী অভিযাত্রী হিসাবে তিনি লাভ করেছেন যশের

গৌরব কিরীট। ইটালিয়ান অপেরার ধরণে গীতিনাট্য-রচনাও গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচায়ক। পূর্বেই আমরা গিরিশচন্দ্র-রচিত বিভিন্ন ধারার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁর ঐ সকল বিভাগে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। গিরিশচন্দ্র প্রথমে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু তেমন কোন বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেনি সে নাটক। তিনি তাঁর 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে এক জায়গায় বলেছেন—

"হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।"

এই সত্য গিরিশচন্দ্র তাঁর 'আনন্দ রহো' নাটকের ব্যর্থতার পর উপলব্ধি করেছিলেন এবং আদর্শ ও ধারণা নিয়ে সেই সময় তাঁর যে পৌরাণিক নাটক-গুলি লিখিত হয়েছিল সেগুলি সাফল্যের সিংহদ্বার একে একে অতিক্রম ক'রে গৌরবতীর্থে পৌঁছতে পেরেছিল। গিরিশচন্দ্রের নাট্যশৈলীতে দেশী ও বিদেশী, বাংলার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদর্শ এবং সেক্‌স্‌পীরীয় নাট্য-বৈশিষ্ট্যের দুই ধারার মিলন সংঘটিত হয়েছিল। তাই একদিকে যেমন তাঁর উপর পড়েছিল বাংলার যাত্রা, কবিগান, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির প্রভাব—অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্য দেশের মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ারও তাঁর ভাব-কল্পনায় অনেকখানি স্থান অধিকার করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র কুমুদবন্ধু সেনের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর নাট্যাদর্শ সম্বন্ধে বলেছিলেন—

"মহাকবি সেক্সপীরই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি। তবে যেন আমার নিজেরও একটা স্বাধীন ভাব আছে।……… মহাকবি কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস আমার ভাষার বনিয়াদ।"

পৌরাণিক নাটকের দিক থেকে ক্রমশঃ ধর্মীয় মহাপুরুষদের জীবন-লীলার নাট্যরচনার দিকে তাঁর প্রবণতা দেখা দিয়াছে। নিজের ধর্মজীবনের অতৃপ্ত ক্ষুধার পরিতৃপ্তি খুঁজেছেন তিনি এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে। আধ্যাত্মিক ভাব-চেতনা ও উচ্চতর আদর্শের স্বপ্নময় জগতের অধিবাসী ছিলেন গিরিশচন্দ্র; ভাবঘন পরিমণ্ডলে তাঁর চিত্তবৃত্তির নিঃশব্দ বিচরণ। তাই

তাঁর অধিকাংশ নাটকই ভক্তিরসে ভাবের জোয়ারে পরিপ্লুত। সামাজিক নাটকের দিকে গিরিশচন্দ্র তত আগ্রহান্বিত ছিলেন না। তিনি বলতেন, 'কাদা ঘাঁটতে আমার ভাল লাগে না'। সামাজিক নাটক লিখতে গেলে সামাজিক মানুষের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে - তা'দের কলুষ কামনা স্বার্থান্ধ কদর্যতার ছবিও আঁকতে হবে বস্তুনিষ্ঠ সত্য-অন্ধ হ'য়ে। তাই তাঁর অনেক নাটকে জাল-জুয়াচুরি, প্রতারণা-শঠতা অমানুষিক নৃশংসতা, হত্যালীলা প্রভৃতি রূপায়িত হয়েছে, কিন্তু শুধু বাস্তব চিত্র এঁকেই তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায় নি ; আদর্শবাদী গিরিশচন্দ্র এসেছেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে পথের সন্ধান দেবার জন্য।

তাই তাঁর সব নাটকেই শোনা যায় ন্যায়, নীতি ও উচ্চ আদর্শের অনুসরণ। ভাঙার ভিতর থেকেও নূতন ক'রে গড়ে তোলার বীজ ছড়িয়ে গেছেন তিনি তাঁর সামাজিক নাটকের ভস্মীভূত ক্ষেত্র-বিশেষে।

কুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে আলোচনাকালে গিরিশচন্দ্র এক সময় বলেছিলেন— "রঙ্গালয় জাতীয় জীবনের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। কোনও ভাবের প্রচার করতে হ'লে রঙ্গালয় একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান। দেখ, যখন আমি ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় পাই, তখন থিয়েটার ছাড়বার এক-একবার ঝোঁক হ'ত। কিন্তু ঠাকুর, ছাড়তে চাইলেই বল্‌তেন 'না না থাক্—ওতে দেশের অনেক উপকার হচ্ছে'। এর মর্ম আমি তখন বুঝতে পারিনি। এখন মনে হয় আমি নিজের জন্য কিছু কর্চ্ছি না, তাঁরই কাজ কর্চ্ছি। নাটকে ঠাকুরের ভাবেরই প্রচার হচ্ছে।"

(পরমহংসদেবের অমৃতময় বাণীই প্রচারিত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের অনেক নাটকের মধ্যে। রঙ্গালয়ে নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে কেবলমাত্র নিছক আনন্দ পরিবেশনই গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না,—তা'র মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল লোকশিক্ষার মহান আদর্শ।

বাংলার নাট্য-সংস্কৃতির প্রবহমান ধারা গিরিশচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভার স্পর্শে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছিল—উচ্ছ্বাসে, প্রাণচাঞ্চল্যে, আনন্দ-কলতানে মুখরিত হয়েছিল নাট্য-তরঙ্গিনীর স্রোতধারা। নাট্য-সাহিত্য ও অভিনয়-জগতে গিরিশচন্দ্রের দান অবিস্মরণীয়।

আজকের নাট্যকারদের জন্যে তিনি রেখে গেছেন নাট্যাদর্শ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত বহুমূল্য মন্তব্য। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'নাট্যকার' প্রবন্ধে যে সকল বহু অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানগর্ভ কথা বলে গেছেন—আধুনিক কালের নবীন নাটক-রচয়িতাদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি—এর মধ্য দিয়ে তাঁরা সত্যকার আদর্শের সন্ধান পেতে পারেন। গিরিশচন্দ্র ঐ প্রবন্ধে লিখেছেন—"মানব হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্ন দেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কলাবিদ্যার পার্থক্য লইয়া আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্যে বা প্রাচ্যে দেশভেদে বিভিন্নতা। এমন কি, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে বিভিন্নতা দেখা যায়। কবিতা, চিত্রপট সংগীত সকলই কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাহার কারণ বোধ হয় ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছবি।......

এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত,—তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্মপ্রাণ-হিন্দু, ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর।"

নটগুরু, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের অবদানের কথা নাট্যরসিক বাঙ্গালী কোনদিনই বিস্মৃত হবে না—চিরদিনই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে এবং যুগস্রষ্টা নাট্যরথীকে উপহার দেবে হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রীতি-অর্ঘ্য।

গিরিশচন্দ্র অশেষ সৌভাগ্যবান নাট্যকার। তাই জীবিতকালেই তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল যশোমাল্যলাভ। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবকালে ন্যাশনাল ও বেঙ্গল থিয়েটার এই দু'টি নাট্যশালার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল,—কিন্তু পরে তাঁর জীবদ্দশাতেই বাংলা দেশে ৪টি রঙ্গালয় একসঙ্গে সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হয়েছিল। প্রতিটি রঙ্গালয় তখন গিরিশচন্দ্রের হাতে-গড়া শিষ্য-প্রশিষ্যে পরিপূর্ণ। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরীতির তখন প্রবল প্রতিপত্তি।

১৯০১ সালে বেঙ্গল থিয়েটারের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নাট্যধারায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন অস্তিত্বই বাংলা দেশে আর দেখা যায়

গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী—প্রবল প্রতাপান্বিত, একচ্ছত্র সম্রাট। গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িককালে বাংলা দেশে নাটকের খুবই অভাব। মাইকেল, দীনবন্ধুর মুষ্টিমেয় নাটকগুলির পুনরাবির্ভাব হয় বারে বারে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেই নাটকায়িত করে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের নাটকের দৈন্য মেটাবার চেষ্টা করা হয়। অপ্রত্যাশিতভাবে গিরিশচন্দ্র এই সময় বাংলা নাট্যজগতে দেখা দিলেন সৃজনী শক্তির প্রসূতিরূপা প্রয়োজনীয়তার তাগিদে; অনেকটা বাধ্য হ'য়েই নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়ে গিরিশচন্দ্র ক্রমে ক্রমে তাঁর অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার দ্বারা বিপুল নাট্যসম্ভার উপহার দিলেন বঙ্গীয় নাট্যলক্ষ্মীর পাদপদ্মে। ঊষর নাট্যক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র বহালেন বহু নাটকের মন্দাকিনী-ধারা—বাঙ্গালী নাট্যামোদীর তৃষ্ণা মিটল সেই স্নিগ্ধ শীতল বারিরাশিতে এবং অনুর্বর ক্ষেত্র উর্বর হ'ল, ও পরবর্তীকালে ভ'রে গেল বহু শক্তিশালী নাটকের সোনার ফসলে।

গিরিশচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে অধিক কিছু আর না বলে আমরা 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে খ্যাতিমান অভিনেতা ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে দিচ্ছি—

তিনি লিখেছেন—

"গিরিশচন্দ্র এ দেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রস সঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন; আর এই জন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Native Stage, ইহার খুড়া-জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিল না। ইহা এক প্রকার অভিভাবকশূন্য বেওয়ারিশ অবস্থায় টলিতেছিল, পড়িতেছিল, ধূলায় গড়াইতেছিল। যে অমৃতপানে বাঙ্গালার নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল বাঁচিয়া আছে, প্রকৃত পক্ষে সে অমৃতভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাঙ্গালা নাট্যশালায় পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা তিনিই।" আমাদের এর চাইতে বেশি কিছু বলার নেই। তবে ১৮৬৮ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের এই ৪৪

বৎসরের সুদীর্ঘ কর্মসাধনার ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছি—'সধবার একাদশী'তে অভিনয় করে নাট্যজগতে প্রথম আবির্ভাবের দিনই গিরিশচন্দ্র হয়ে গেছেন বাংলার 'নটগুরু'; আর এই পৃথিবীর নাট্যশালা থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার শোকাবহ দিনও ঠিক সেই ভাবেই নাট্যগুরুরূপে তিনি নিয়ে গেছেন অগণিত মন্ত্রশিষ্যের এবং গুণমুগ্ধ কৃতজ্ঞ নাট্যরসিকের হৃদয়মথিত তপ্ত অশ্রুর শ্রদ্ধাঞ্জলি। গিরিশচন্দ্রের নাট্যজগতে আবির্ভাবকালে যে পাদপবিহীন বাংলায় এরণ্ড ক্রমায়িত হয়ে উঠেছিল, সেই বাংলাতেই গিরিশচন্দ্রের তিরোধানকালে নানাদিকে উন্নত-মস্তক মহীরুহ বিজয়ীর মত দেখা দিয়েছে। বাংলার নাট্যজগতে দিক্‌পাল নাট্যকাররূপে একদিকে দ্বিজেন্দ্রলালের, অন্যদিকে ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং অপর একদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং তাঁদের শিষ্যবর্গ। নাট্যক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের জল-সিঞ্চনের সোনার ফসল এই সব দিক্‌পাল নাট্যরথীবৃন্দ।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'The Bengali Theatre' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, আমরা সেই উদ্ধৃতি দিয়ে গিরিশপ্রসঙ্গ শেষ করবো। তিনি বলেছেন—"

"Then was initiated the glorious period in the history of the Bengali stage, no less of the Bengali drama, almost every page of which in embellished by scme brilliant achivement of Girish Chandra. Henceforth the history of the stage is mainly the history of his dramatic activity. The majority of the new institutions that followed the 'Great National' are almost without exception, to be traced to the energy and inspiration of Girischandra. 'The Star', 'The Emareld', 'The City', 'The Minerva', 'The Classic', 'The Grand', 'The New Classic', 'The Kohinoor', 'The Monomohan' and the

offspring of 'The Bengal Theatre', such as 'The Arora', 'The Unique', 'The National', 'The Great National', 'The Grand National' and 'The Thespian Temple' were and are in some way or other indebted to him, for it was his volumnious productions that supplied the life-blood to their growth and devolopment, and that is why the veneration of a grateful posterity has cherished his name as the 'Father of the Bengali Stage'.

গিরিশোত্তর যুগের অন্যতম শক্তিশালী নাট্যকার রূপে বাংলার নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হ'লেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর নাট্যপ্রতিভার যাদুস্পর্শে সজীব নাটকগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং মঞ্চ-সাফল্যের দিক্ দিয়ে ইতিহাস-সৃষ্টিকারী। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রয়াস প্রহসনগুলির মধ্যে রূপায়িত হয়ে ওঠে। রঙ্গ-ব্যঙ্গ, হাসির গান ও নির্দোষ পরিশুদ্ধ কৌতুক রসের উচ্ছ্বাসে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলি উদ্বেলিত হয়ে ওঠায় জনগণচিত্তে অনাবিল হাস্যরসের ধারাকে উৎসারিত করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রহসনগুলিতে প্রধান ভূমিকা তাঁর বহু খ্যাত হাসির গানগুলির। এই হাস্যরসাত্মক অনবদ্য গানগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে রসায়িত করে তুলেছিল। 'কল্কি অবতার' তাঁর প্রথম প্রহসন। আঘাত-বিহীন পরিহাসের সহায়তায় তিনি ব্রাহ্ম, নব্যতন্ত্রীহিন্দু, বিলেত ফেরৎ, প্রাচীন ও নবীনপন্থী এবং রক্ষণশীল সমাজের সকলের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের জন্য চেষ্টিত হয়েছেন। কোথাও কোন আক্রমণ বা আক্রোশমূলক কটাক্ষ-পাত এই প্রহসনে দৃষ্ট হয় না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিরহ' নামক প্রহসনের কৌতুক-রসাশ্রিত কাহিনী বিশুদ্ধ ও উচ্চাঙ্গের রস পরিবেশনে অমলিন সৌন্দর্যে মণ্ডিত। 'ত্র্যহস্পর্শ,' 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পুনর্জন্ম', 'আনন্দবিদায়' প্রভৃতি কয়েকটি প্রহসন-রচনার মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরসের প্রবাহ বহাতে চেষ্টা করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভার দ্বিতীয় স্তরে রচিত হয়েছে পৌরাণিক নাটকাবলী। দ্বিজেন্দ্রলালের এ জাতীয় নাটকগুলি গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক

নাটকের ন্যায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। তার কারণ পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

পুরাণকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর যুক্তিবাদী বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টির আলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, কিন্তু সেইখানেই তাঁর ব্যর্থতার বীজ নিহিত। পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের ন্যায় তিনি ভক্তিরস ও আধ্যাত্মিক ভাববন্যা বহাতে পারেন নি। অলৌকিক ভাব-জগতকে বাস্তব জগতের দ্বন্দ্বময় মানবীয় পরিবেশে রূপায়িত করতে উদ্যোগী হয়েছেন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল। এইরূপে ভাবভাষা ও পরিবেশ কোন দিক দিয়েই দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটক সত্যকার আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত পৌরাণিক হয়ে উঠতে পারে নি।

প্রথম পৌরাণিক নাটক 'পাষাণী'তে অহল্যা ও ইন্দ্র চরিত্র বাস্তব জগতেরই অনুরূপ সম্পূর্ণ রক্ত মাংসের মানুষে পরিণত হয়েছে। কামনা-মলিন, নির্লজ্জ লালসা এই নাটকের পৌরাণিক চরিত্রগুলির মহিমাকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে। 'সীতা' বা 'ভীষ্ম' কোন নাটকই সফল পৌরাণিক ভাবগাম্ভীর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভার স্ফূরণের তৃতীয় স্তরে আমরা দেখেছি পরিণত উজ্জ্বলদীপ্তি—তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে।

ঐতিহাসিক নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে উড্ডীন হয়েছে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার বিজয়-বৈজয়ন্তী,—বাংলার নাট্য-দরবারে চিহ্নিত হয়েছে তাঁর স্থায়ী আসন। ইতিহাসকে যদিও বিষয়-বস্তুরূপে গ্রহণ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, তা হ'লেও গিরিশচন্দ্রের মত নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাসকে অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই তাঁর ঐতিহাসিক নাটক হ'য়ে উঠেছে রোমান্টিক ধর্মী। সে কালের অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের মতই অবশ্য তাতে কোন দোষণীয় হয় নি। আঙ্গিকের দিক্ দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম দিকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন বিশুদ্ধ সেক্স্পীরীয় নাট্যধারা। গঠন-কৌশলের দিক্ দিয়ে অভিনবত্ব খুব না থাকলেও গদ্য সাহিত্যে কাব্যময় অপূর্ব ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে বিশিষ্টতায় ভূষিত করেছে। প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাই' ব্যর্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একটি অপরিণত নাটক।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের দুর্বল ও অক্ষম প্রয়োগের চেষ্টা ত্যাগ করে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের উপযুক্ত ভাষা উদ্ভবের জন্য প্রয়াসী হলেন। কাব্যিকতার প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারলেন না।

তাই তাঁর পরবর্তী নাটকের ভাষা কাব্যের সুললিত ঝঙ্কারে অনুরণিত হয়ে উঠেছে। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের কোন চরিত্রের সংলাপ শুনতে শুনতে মনে হয় বুঝি কোন মহাকবির কাব্যামৃত আস্বাদ করছি। এই ছন্দময় অপূর্ব নাটকীয় ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালকে অবিস্মরণীয় কীর্তি দান করেছে এবং এই ভাষাই বাংলার নাট্যজগতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। পরবর্তী কালের অনেক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের ভাষার আদর্শে নাট্য রচনা করে যশোলাভ করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকে অনুসৃত দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা যে কত সজীব, রসঘন ও কাব্য-সৌন্দর্যে ভূষিত ছিল, তার উদাহরণ স্বরূপ 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

সিন্ধুতটে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে সেকেন্দার শাহ্ ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য এবং এদেশের মানবের প্রকৃতির বিষয়ে সেলুকসকে বলছেন—

"কোথাও দেখি, তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিরাট বট স্নেহছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গম পর্বতসম মন্থর গমনে চলেছে; কোথাও মহা ভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্ররেখায় পড়ে আছে; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জন বনমধ্যে, শূন্য প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য গৌর দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন কর্ছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে ব্যাত্যার সাহস। এ শৌর্য পরাজয় করে আনন্দ আছে।"

এই একটি অণুচ্ছেদের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিবরণ ও অধিবাসিগণের সম্পর্কে একটি নিখুঁত, জীবন্ত এবং উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করা যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচায়ক। বাংলার নাট্য-সাহিত্যে কেন পৃথিবীর কোন সাহিত্যে এইরূপ সংক্ষিপ্ত ভাষণে একটা দেশ ও জাতির প্রাণবন্ত বর্ণনা

খুবই দুর্লভ। সুপরিকল্পিত মঞ্চনির্দেশ-দানের মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটকে এক অভিনব ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। বার্নাড শ র নাটকগুলির ন্যায় প্রয়োগশিল্প-নৈপুণ্য দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিতে লক্ষিত হয়। নাট্য-রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বৈশিষ্ট্য প্রায় তাঁর সমস্ত নাটকেই পরিদৃশ্যমান। প্রতিটি অঙ্কের শেষ দৃশ্যটিকে তিনি ভাবের চমৎকারিত্বে, ঘটনা-সংস্থাপনে, আবেগ সৃষ্টিকারী সংলাপে ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এক উত্তেজনামূলক উচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত করেছেন। দর্শক চিত্তের কৌতূহল ও আবেগকে উদ্বেলিত করে উচ্চতর স্থানে নিয়ে আসার পরই প্রতিক্ষেত্রে ঘটেছে যবনিকাপতন।

যবনিকা-পতনের ঠিক পূর্বে যেন নাটকের নাট্যক্রিয়া স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে এক অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত চিত্রে পরিণত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে বাংলা নাটকে এই অপূর্ব ভাস্কর্য (Tableau) দেখা যায় নি। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকগুলিকে পূর্বেকার মত স্বগতোক্তি কণ্টকিত না করে যথা সম্ভব স্বগতোক্তিবিহীন করবার চেষ্টা করেছেন। তবে দৃশ্যারম্ভের প্রথমে অনেক ক্ষেত্রে তিনি স্বগতোক্তি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু সেটা নাটকের গতিকে ব্যাহত না করে, বরং চরিত্রের মনোভাব প্রকাশের সহায়ক হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণকারী পরবর্তী নাট্যকারেরা এই দিকে দৃষ্টি দিয়ে এই প্রচেষ্টার কোন উন্নতিসাধনে উদ্যোগী হন নি, তাঁদের অনুকরণ সর্ববিষয়ে ব্যর্থ ই হয়েছে।

'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাট্যশৈলী ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। জাতীয় ভাবোদ্দীপক দেশপ্রেমমূলক ধ্যান-ধারণা তাঁর এই সকল নাটকের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক সংগীতগুলি জাতীয় সংগীতরূপে বাংলার নরনারীর কণ্ঠে গীত হয়েছে।

শুধু বাংলার নাট্য-সাহিত্যে কেন, বাঙালীর জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদরূপে এই সকল গান দ্বিজেন্দ্রলালকে বাঙালীর কাছে সার্থক গীতিকার রূপে অমর করে রাখবে।

'নুরজাহান' দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অমর নাট্যসৃষ্টি। নুরজাহানের ব্যথামৌন অন্তরের তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস বেদনাতুর পরিবেশন সৃষ্টি করেছে। ঐশ্বর্য ও ক্ষমতায় গর্বোদ্ধত উন্নত মস্তক পরিশেষে অবনত হ'ল কন্যার করুণা ও মমতাপূর্ণ স্নেহ-ভালবাসার সাহায্যে। করুণ রসাত্মক এই নাটকখানি বেদনাভারাক্রান্ত করে তোলে দর্শকের রসচিত্তকে। যদিও 'মেবারপতন' নাটকের পর রচিত হয়েছে 'সাজাহান' নাটক, কিন্তু তাহলেও আমরা এই নাটকখানির সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা করতে ইচ্ছুক; কারণ 'সাজাহান' দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটকরূপে অবিসংবাদিত-ভাবে গণ্য হয়ে থাকে। এই 'সাজাহান' নাটক শুধু বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের নাট্যদরবারেও সম্মানীয় স্থানের অধিকারী, অপূর্ব চরিত্র-চিত্রণে, দূর-দূরান্তে ক্রিয়াশীল শিথিল ঘটনাগুলিকে এক সুদৃঢ় গ্রন্থিতে আবদ্ধ-করণে, সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে, ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রমোচ্চতায়, মহান্ আদর্শের অনুরঞ্জনে—'সাজাহান' নাটকখানি সহৃদয় হৃদয়-সংবেদ্য হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে অনেক অনৈতিহাসিক ঘটনা চিত্রিত হ'লেও—এই সমস্ত দৃশ্য অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত হয়ে ওঠেনি—এগুলি নাটকের মধ্যে অনেক আবেগময়, হৃদয়গ্রাহী মুহূর্তের সৃষ্টি করেছে। দার্শনিক দিলদারের সঙ্গে দার্শনিক দারার কথোপকথন অনৈতিহাসিক হ'লেও দর্শকদের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে।

৪র্থ অঙ্কের ৭ম দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই—খিজিরাবাদের কুটীরে রাত্রিকালে দারার সঙ্গে দিলদারের সাক্ষাৎকার। দারার অভাবনীয় অবস্থা দেখে দিলদারের চোখে বেদনাশ্রু। দারা তখন বলছেন—"একি যুবক! তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে যে—কাঁদছো!—কাঁদো। দিলদার উত্তরে বলেন—"না কাঁদবো না! এ বড় মহিমময় দৃশ্য! একটা পর্বত ভেঙে পড়ে রয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছে, একটা সূর্য মলিন হয়ে গিয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের একদিকে সৃষ্টি, আর একদিকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সংসারেও তাই। এ একটা ধ্বংস বিরাট, পবিত্র, মহিমময়।"

দিলদারের এই দার্শনিকতাপূর্ণ উক্তি দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আবার ৫ম অঙ্কের ৫ম দৃশ্যে ঔরংজীবের বহিঃকক্ষে দ্বিপ্রহর

রাত্রিতে ঔরংজীবের সঙ্গে কথোপকথনকালে দিলদারের নিদারুণ ভবিষ্যৎ বাণী অপূর্ব পরিবেশ রচনা করতে সমর্থ হয়েছিল। গমনোদ্যত দিলদারকে ঔরংজীব ফেরাতে চেষ্টা করলে দিলদার অগ্নিগর্ভ কণ্ঠে বলে উঠলেন—"না, আমায় ফেরাতে পারবে না ঔরংজীব।—আমি চল্লাম। তবে একটা কথা বলে যাই। মনে ভাবছো যে, এই জীবন-সংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে। না, এ তোমার জয় নয় ঔরংজীব! এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি। অধঃপতন। তুমি যত ভাবছো উঠ্‌ছো, সত্য সত্যই তুমি পড়ছো। তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, যখন সাদা চোখে দেখবে যে নিজের আর স্বর্গের মধ্যে কি মহাব্যবধান খনন করেছো, তখন তার পানে চেয়ে তুমি শিউরে উঠবে।—মনে রেখো!"

দিলদার-চরিত্রসৃষ্টিতে ইতিহাসকে যথাযথ অনুসরণ করা না হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল নিজস্ব মনের রঙ দিয়ে যে দিলদার-চরিত্র অঙ্কন করেছেন তা অপ্রাসঙ্গিক, অবাস্তর ও বৈচিত্র্যহীন হ'য়ে ওঠেনি। বরং হয়ে উঠেছে একটি আদর্শবাদী সুন্দর চরিত্র।

'সাজাহান' নাটকের শেষ দৃশ্যটিকে নাট্যকার তাঁর নাট্য প্রতিভার সমস্ত কিছু নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে অতি যত্নে অতি সাবধানতায় হৃদয়ের রূপ-রস-ছন্দ সব কিছু মিশিয়ে একটি অনিন্দসুন্দর, অচিন্তনীয় দৃশ্যরূপে রূপায়িত করে তুলেছেন যার তুলনা বিশ্বনাট্য-সাহিত্যে বিরল, যে অবিস্মরণীয় দৃশ্য সাজাহান নাটকটিকে classic-এর মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

পঞ্চম অঙ্ক। ষষ্ঠ দৃশ্য। আগ্রার প্রাসাদ অলিন্দ

কাল—অপরাহ্ন

ঔরংজীবের আকস্মিক প্রবেশে সাজাহান ভীত ও বিস্মিত। অর্ধোন্মাদ সাজাহান উদ্বিগ্ন স্বরে বলছেন—

"আমার মণিমুক্তা নিতে এসেছ! দেবো না, দেবো না। এক্ষণই সব লোহার মুগুর দিয়ে গুঁড়ো করে ফেলবো।"

কিন্তু নির্মমহৃদয় ঔরংজীবের অন্তরে তখন অনুতাপের বৃশ্চিক দংশন।

তিনি জানু পেতে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন পিতার কাছে। অমনি স্নেহময় পিতার হৃদয় একান্তভাবে ক্ষমা করতে উদ্যত হল অবাধ্য, নৃশংস, অত্যাচারী বিভীষিকা-সৃষ্টিকারী সন্তানকে।

জাহানারা এটা এক কপট অভিনয় মনে করে একথা একেবারে বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু যখন ঔরংজীব মুকুট খুলে সাজাহানের পদতলে রাখলেন, তখন অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত পিতা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না—

তিনি তখন ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন—"আমার হৃদয় গলে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে।" তারপর ঔরংজীব যখন চরণদ্বয় জড়িয়ে ধরে কাতরভাবে ক্ষমা চাইলেন তখন সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হ'ল।

তিনি সন্দেহ-প্রকাশের জন্য জাহানারাকে ভর্ৎসনা করে বললেন—

"কথা কস্‌নে জাহানারা! পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমায় ক্ষমাভিক্ষা চাচ্ছে, আমি কি তা-না দিয়ে থাকতে পারি?—হারে বাপের মন! এতদিন ধরে তোর হৃদয়ের নিভৃতে ব'সে কি এইটুকুর জন্য আরাধনা কর্চ্ছিলি! এক মুহূর্তে এই ক্রোধ গলে জল হ'য়ে গেল।"

তবু জাহানারা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না ঘাতক রাজদস্যু ভ্রাতাকে। জাহানারার সেই বাধাদানে সাজাহানের পিতৃহৃদয়ের সন্তান-বাৎসল্য অদম্য আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে শতধারে প্রবাহিত হ'তে থাকে।

আতঙ্কময় দুঃস্বপ্নের মত অমারাত্রির অবসান হয়েছে—সাজাহানের চিত্তাকাশে ঝলমল্ করছে নবজন্মের প্রসন্ন প্রভাত। সাজাহানের চোখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ক্ষমাসুন্দর স্নিগ্ধ দীপ্তি। জাহানারাকে বুঝিয়ে তিনি আবেগময় কণ্ঠে বললেন—"তোরই মত মাতৃহারা জাহানারা—তোরই মত বেচারী! ক্ষমা কর। ওর মা যদি এখন বেঁচে থাকতো, সে কি করত জাহানারা? তার সেই মায়ের ব্যথা যে সে আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছে—কি জাহানারা! তবু নিস্তব্ধ? চেয়ে দেখ এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে—দেখ সে কি স্বচ্ছ। চেয়ে দেখ এই সন্ধ্যাকালে ঐ

আকাশের দিকে—দেখ সে কি গাঢ়! চেয়ে দেখ ঐ কুঞ্জবনের দিকে—দেখ সে কি সুন্দর! আর চেয়ে দেখ—ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপের আপ্লুত বিয়োগের অমর কাহিনী—ঐ স্থিরমৌন নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ,- সে কি করুণ! তাদের দিকে চেয়ে ঔরংজীবকে ক্ষমা কর,—আর ভাবতে চেষ্টা কর্ যে—এ সংসারকে যত খারাপ ভাবিস্—সে তত খারাপ নয়।"

এই সর্বজয়ী ক্ষমার তুলনা কোথায়? কোথায় এই অসাধারণ অন্তর সৌন্দর্যে মণ্ডিত মিলন-দৃশ্যের অনবদ্য রূপায়ণ। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যশৈলীর স্বর্ণময় অবদান এই অনির্বচনীয় দৃশ্য-রচনা। সাজাহানের উক্তির মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্ব দর্শন। তিনি এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, এ সংসারের মানুষ মন্দ নয়; ঘৃণ্য নয়,—পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মানুষের বহিরঙ্গের পরিচয়ই তার সত্যকার পরিচয় নয়, এ পরিচয় তার জীবনের খণ্ডিত ভগ্নাংশ মাত্র; মানব প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় সন্ধান করতে হ'লে তার অতলান্ত হৃদয়-সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করতে হ'বে—তবেই ডুবুরীর মত আমরা সংগ্রহ করতে পারবো মানব প্রকৃতির মণিমুক্তার রত্নরাজি। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নাটকীয় সত্তা (Dramatic Propriety) নেই বলে অনেক আপত্তি জানিয়েছেন। হয়ত সে কথা সত্য। Propriety না থাকলেও মঞ্চের প্রয়োজনীয়তার দিক্ থেকে কতকগুলি দৃশ্য এত সফল হয়েছে এবং দর্শকদের মনে এত আনন্দ-আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, ঐতিহাসিকত্বের দিক থেকে এগুলি ঠিক না হলেও মঞ্চ-সাফল্যের দিক দিয়ে বিচার করে সেগুলি তিনি ইচ্ছা করেই পরিবর্তন করেন নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার-পতন' নাটকে মানবতার এক মহান আদর্শ দীপ্যমান হ'য়ে উঠেছে। দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের প্রতীক চরিত্রগুলির ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বপ্রেমের মহনীয়তা।

নাটকটির পরিণতিতে ধ্বনিত হয়েছে এক অনন্ত আশার উন্মাদনাময়ী বাণী—তাই হৃদয়ের সমস্ত ক্লেদ-ক্লিন্নতা ধুয়ে মুছে ফেলে নবসূর্যের দীপ্তিতে

উজ্জ্বল, প্রকৃত মানুষ হবার উদ্দীপনাময় সংগীত গীত হ'য়েছে চারণদের কণ্ঠে—

"কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'॥

('মেবার-পতন' শেষ দৃশ্য)

সেই প্রবল জাতীয়তার দিনে,—দেশপ্রেমের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে অবিচলিত, অকম্পিত কণ্ঠে "গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ' "—এই ওজস্বিনী বাণী শোনাবার শক্তি আর কার মধ্যে দেখা গিয়েছে? মানবপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের নির্ভীক কণ্ঠেই একমাত্র উচ্চারিত হয়েছিল মনুষ্যত্ব-উদ্বোধনের এই মহামন্ত্র। মানবতার এই মহান আদর্শ ই দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্য, তাঁর নাটকগুলির মধ্যে তাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে মানবতার নবজাগরণী সংগীতের সুরধ্বনি।

গিরিশ-যুগের আর একজন প্রতিভাশালী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। তিনিও বাংলার নাট্যস্রোতস্বিনীকে অজস্র ধারায় পুষ্ট করতে এগিয়ে এসেছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের রূপকথার কাহিনী-আশ্রিত-নাটক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক সমূহ সম্পর্কে আলোচনার অনেক কিছু আছে। কিন্তু সে চেষ্টা থেকে আমরা আপাততঃ বিরত থাকবো—কারণ তা সময়সাপেক্ষ এবং একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রবন্ধ গ্রন্থে সেই আলোচনা করা সম্ভব—এই অল্প পরিসরে তা সম্ভব নয়।

তাই আমরা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য-শৈলীর বৈশিষ্ট্য, বাংলা নাট্য-সাহিত্যে তাঁর অবদান এবং তাঁর পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলবার চেষ্টা করবো।

ক্ষীরোদপ্রসাদকে আমরা এক কথায় রোমান্টিক ধর্মী নাটক-রচয়িতারূপে যদি অভিহিত করি, তাহ'লে তা খুব অসমীচীন হবে না। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, রূপকথাশ্রয়ী প্রায় সমস্ত শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ক্ষীরোদপ্রসাদের রোমান্স-প্রিয় কল্পনাবিলাসী কবি-মানস।

সম্ভাব্যতা ও বাস্তবানুগতা তাঁর নাটকে খুব কম, কারণ তাঁর নাটকগুলির মধ্যে চলেছে দূরপ্রসারী রোমান্টিকতার লীলাবৈচিত্র্য। পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের ন্যায় ভক্তি-ভাবের অত উচ্ছ্বাস ছিল না—ভক্তিকে তিনি যুক্তি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নাটকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। ভক্তি, যুক্তি, কল্পনাবিলাস একত্র মিশ্রিত হয়ে অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছে ক্ষীরোদ-প্রসাদের পৌরাণিক নাটকগুলিতে—'নরনারায়ণে'র মধ্যে এই রীতির পূর্ণ সার্থকতা লাভ হয়েছে।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের একটি অমূল্য এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টিরূপে নর-নারায়ণ চিরদিন বাঙ্গালী নাট্যরসিক কর্তৃক কীর্তিত হ'য়ে থাকবে।

ঐতিহাসিক নামধেয় 'আহেরিয়া' নাটকে বংশানুক্রমিকতার সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অস্বীকার করে ক্ষীরোদপ্রসাদ যৌক্তিকতা বিসর্জন দিয়েছেন। তাই এই নাটককে রূপকথার কাহিনী বলে অনেক সময় ভ্রম হয়।

সুপ্ত বংশগরিমা ও পরিবারগত ঐতিহ্য একদিন না একদিন সমস্ত প্রতি-বন্ধকতা ভেদ করে মানুষকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে;—এই মতবাদ ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য কয়েকটি নাটকেও প্রচারিত হয়েছে। 'রত্নেশ্বরের মন্দিরে' নাটকটির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

'চাঁদবিবি' নাটকের মধ্যেও অধিক স্থান দখল করেছে অনৈতিহাসিক লোকশ্রুতিমূলক ও রোমান্টিক কাহিনী।

স্বদেশপ্রেমের বাণী ও জাতীয়তাবোধ সন্নিবেশিত হয়েছিল ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের মধ্যে।

আধুনিক স্বাদেশিকতার উদ্দীপনাময় সুর এই নাটকে ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠায় বাংলার নাট্যামোদী জনসাধারণের হৃদয়জয়ে সমর্থ হয়েছিল 'প্রতাপাদিত্য' নাটক। কিন্তু নাটকের মূল্য-বিচারে এর স্থান খুব উচ্চ নয়। অসংযত কল্পনার উচ্ছ্বাসে নাটকটি হারিয়েছে তার ঐতিহাসিকতা এবং নাটকীয় মর্যাদা। কোন কোন চরিত্র রূপায়িত হয়েছে বিকৃতভাবে, আবার কোন চরিত্র বা রয়ে গেছে অপরিণত—অপরিস্ফুট।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' নাটক ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত হলেও ইতিহাসের সঙ্গে এর সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। অতি নাট্যিক রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিই এর মধ্যে মুখ্য হয়ে উঠেছে। কাহিনীর মধ্যে ঘটনা-বিন্যাসের যাথার্থ্য না থাকায় অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছে নাট্যগ্রন্থি। রঘুবীর-চরিত্রই এই নাটকের মধ্যে প্রধান চরিত্র এবং এই চরিত্রটি অনেকটা বিকাশ লাভ করেছে। রঘুবীর-চরিত্রে দুই সংস্কারের দ্বান্দ্বিক রূপ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। একদিকে বংশানুক্রমিকতার সংস্কার, অন্যদিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে অর্জিত শিক্ষার সংস্কার।

অন্যান্য নাটকের মতই এখানেও আমরা ক্ষীরোদপ্রসাদকে তাঁর পূর্বানুরূপ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে দেখি—জন্মগত সংস্কার বা বংশানুসারী ধারা সুপ্ত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত হতে পারে না—একদিন না একদিন তার অভিপ্রকাশ দেখা দেবে সমস্ত শিক্ষাগত সংস্কারকে ভেদ ক'রে। এ নাটকেও সহজাত সংস্কারকেই জয়ী হ'তে দেখা যায়।

দস্যুসন্তান রঘুবীর ব্রাহ্মণগৃহে লালিত হয়ে লাভ করেছে ব্রাহ্মণসুলভ দয়া, মায়া, ক্ষমা, পরহিত প্রভৃতি সদগুণরাজি। তাই পরের উপকারের জন্য, বিপন্নের উদ্ধারের জন্য সদা ব্যগ্র তাঁর ব্রাহ্মণ-হৃদয়।

তাই যখন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রজনীতে সূচিভেদ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর অরণ্যে নবাবনন্দিনী পরীবানু—বৃদ্ধ ভৃত্য সাহাজানের আকস্মিক মৃত্যুতে অত্যন্ত বিপদগ্রস্তা—সেই মুহূর্তে রঘুবীরের পরোপচিকীর্ষু অন্তরে ত্বরিতে ছুটে গেছে অসহায়া, নিরাশ্রয়া, বিপন্না নারীকে সাহায্য করবার জন্য। হিন্দুমুসলমানের প্রশ্ন তাকে বাধা দিতে পারে নি।

একদিন নিদাঘ সন্ধ্যায়, প্রবল বাত্যায়, নর্মদার তরঙ্গক্ষিপ্ত বুকে নিমজ্জিত নৌকারোহীদের রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পরহিত-ব্রতী রঘুবীর। নর্মদার ভীমগ্রাস থেকে সে ছিনিয়ে নিয়ে এল পরবর্তী কালের দুরাত্মা, রাজঘাতী জাফরকে। বিপন্নকে রক্ষা করতে কোনদিনই সে পিছিয়ে যায় নি।

রঘুবীরের অন্তরে বারে বারে সহজাত এবং অধিগত দুই সংস্কারের দ্বন্দ্ব এসে দেখা দিয়েছে, অস্থির করে তুলেছে তার সমগ্র মন প্রাণ-অন্তরাত্মাকে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ভাগ্য-বিড়ম্বিত বৃদ্ধ অনন্ত রাও যখন আপন দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে রঘুবীরকে উত্তেজিত করে তোলার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, তখন রঘুবীরের হৃদয়ে জেগে ওঠে আশঙ্কা। রঘুবীর তখন বলে ওঠে—

"শিখায়েছো
নিষ্কাম কামনা ; তবে, আজ কেন দাসে
এ ছলনা ! ভিক্ষা মাগি পায়, ত্যাগ শিক্ষা
দিয়াছ আমায়, নীচ আমি, ভিত্তি ভাল
নয়, আদেশ করনা দাসে।"

কোন ভীল দস্যুসন্তানের কণ্ঠে কি এই ধরণের উক্তি আশা করা যায়? ভীল রঘুবীরের পক্ষে এ ধরণের কথা বলা সম্ভব না হলেও ব্রাহ্মণায়িত রঘুবীরের মুখে এ কথা বেমানান নয়। এখানে শিক্ষাগত সংস্কারেরই প্রাধান্য। অর্জিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার নিষ্ঠুর আসুরিক শক্তির উন্মেষ-আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়ে এবং প্রতিহত করতে অগ্রসর হয় হিংসাবৃত্তির জাগরণকে।

কিন্তু পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আমরা দেখি পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং অন্তরঙ্গগণের উত্তেজনামূলক অনুরোধের চাপে রঘুবীরের মধ্যে তার জন্মগত সংস্কার উদ্দাম আবেগে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে? ব্রাহ্মণের আদর্শে অনুপ্রাণিত রঘুবীরের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে ভীলের প্রচণ্ড শক্তির দুর্ধর্ষ পরাক্রম এবং অকুতোভয়তা প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে, তার রক্তে জাগিয়েছে দুরন্ত জীবনের উন্মাদনা। বৃদ্ধ অনন্ত রাও-এর কাছে তাঁর পুত্র বলদেবকে কারামুক্ত করার শপথ করে রঘুবীর। দুরাত্মা জাফরকে হত্যা করে বলদেবকে উদ্ধার করা যে তার অসার দম্ভোক্তি মাত্র নয়, একথা বোঝাবার জন্য রঘুবীরকে বলতে শোনা যায়—

"ভীল নয় মায়ের সন্তান,
শিশু-ভীল সিংহ মেরে খায়।
জান পিতা, ভীল-শিশু সিংহ মেরে খায়?

মত্ত মাতঙ্গের সঙ্গে করি ভীমরণ,
দন্ত তা'র করি উৎপাটন—
আনন্দে মাতঙ্গ-শিরে নৃত্য করে সাধে।
করীগ্রাসী ভীম অজগর—
ভয়ে যার বনচর কাঁপে থরথর,
হেলায় ধরিয়া—তা'রে
ভীল-শিশু করে ছেলে খেলা ?"

অনন্ত রাও রঘুবীরকে নিরস্ত করতে উদ্যত হ'লে রঘুবীরের ভীল হৃদয়ের পৌরুষ আহত হয়, তাই তার সঙ্কল্পে পুনরায় দৃঢ়তা প্রকাশ ক'রে রঘুবীর বলে—

"আশীর্বাদ কর মহামতি। আর আমি
নহি প্রভু, ব্রাহ্মণের নিরীহ সন্তান।
বিশ্বনাথ জনক আমার। আমি পুত্র তার
শুধু মাত্র অভ্যস্ত সংহারে।
দেখ প্রভু, শমন-মূরতি।"

এই বলে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে বক্ষে কালীমূর্তি দেখায়, তখন বিস্মিত অনন্ত রাও বলে ওঠে—"একি মূর্তি? রঘুবীর! রঘুবীর!" রঘুবীর উত্তর দেয়—"রঘুয়া, রঘুয়া। রঘুবীর নহি আর?"

"পিতা! ম'রে গেছে রঘুবীর।
মৃত প্রাণ তার,
মলভরা পূতিগন্ধ মৃত্তিকার রাশি
রঘুয়া কণ্টকতরু উঠেছে সেথায়।
তীব্র ফুল-গন্ধে তার ভরিবে মেদিনী,
এস দ্বিজ লইতে আঘ্রাণ।"

শিক্ষাগত সংস্কারের আবরণ ভেদ করে মাথা উঁচু করে দেখা দেয় জন্মগত বংশগত সংস্কারের প্রভাব। রঘুবীরের রক্তে নৃত্য ক'রে ওঠে ভীলের নির্ভীক দুঃসাহসিকতা।

এই তুই সংস্কারের দ্বন্দ্ব রঘুবীর নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পরিশেষে যখন বহু অন্তর্দ্বন্দ্বের পর সহজাত সংস্কার শিক্ষাগত সংস্কারের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, রঘুবীর তুর্ধর্ষ-শক্তি নিয়ে ছুটে গেল বলদেব প্রভৃতিকে উদ্ধারের জন্য। কিন্তু তখন অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেছে। তাই জাফরকে শাস্তি বিধান করে রঘুবীর যখন ফিরে এল তখন সব শেষ; অনন্তরাও মৃত, পরীবানু বিষপানে প্রাণহীনা এবং শ্যামলীও বিষক্রিয়ায় মৃত্যুপথযাত্রী।

'রঘুবীর' নাটকের শেষ দৃশ্যে যে করুণ রস উৎসারিত হয়েছে তার তুলনা বিরল।

'আলমগীর' ক্ষীরোদপ্রসাদের একটি জনপ্রিয় ও শক্তিশালী নাট্যসৃষ্টি। আলমগীর চরিত্র তাঁর স্মরণীয় অবদান। আলমগীরের অন্তর্মুখী জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। সম্রাটের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের রসঘন এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় অপূর্ব মহিমায় অভিব্যক্ত হয়েছে। আলমগীর একদিকে যেমন বজ্রাদপি কঠোরাণি, অন্যদিকে আবার মৃদুনি কুসুমাদপি। একদিকে নির্মম নিষ্ঠুর, অন্যদিকে তুর্বল, শিশুর ন্যায় অসহায়। আলমগীর চরিত্রের এই অচিন্ত্যনীয় দ্বন্দ্বময় স্বরূপ অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের মধ্যে। উদিপুরী চরিত্রটি এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য সু-অঙ্কিত চরিত্রসৃষ্টি। আলমগীর চরিত্রের বিকাশে উদিপুরীর অংশ বড় কম নয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের একটা নিজস্ব জীবনদর্শন ছিল—সত্যাশ্রয়ীর শক্তি অজেয়, অদম্য। এই সত্যের আদর্শ-গ্রহণকারীর সংঘাতময় জীবনের প্রতিচ্ছবি ক্ষীরোদপ্রসাদের বিভিন্ন নাটকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে 'রঘুবীরে'র মধ্যে। 'আলমগীর' নাটকে,—'নরনারায়ণ'-এ কর্ণচরিত্রের পরিণতিতে, 'গোলকুণ্ডা'য় আবুলহাসান, 'রঞ্জাবতী'তে দলু সর্দারের চরিত্রে—সর্বত্রই ক্ষীরোদপ্রসাদের নিজস্ব জীবন-দর্শনের স্পন্দন শোনা যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে তাঁর পৌরাণিক নাটক 'নরনারায়ণ' বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেও কালজয়ী মর্যাদায় ভূষিত। ভীষ্ম, সাবিত্রী প্রভৃতি পৌরাণিক

নাটক দর্শকগণের নিকট আদৃত হ'লেও সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু গিরিশোত্তর যুগে পৌরাণিক নাটকের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল সার্থক নাটক 'নরনারায়ণ'। ভক্তিকে ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন যুক্তি-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, স্তরে স্তরে—ধীর পদক্ষেপে। দৈব শক্তিতে অবিশ্বাসী আপন পুরুষকারের উপর নির্ভরশীল কর্ণ—কখনও বিশ্বাস করেন নি যে বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণ নরদেহের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন। সেই নরদেহধারী নারায়ণের অস্তিত্বে সন্দেহপ্রবণ কর্ণই একের পর এক জলন্ত প্রমাণের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কর্ণের সমস্ত দ্বিধাসংশয়ের অবসান হ'ল। তাঁর কণ্ঠে তখন শোনা গেল—

"আর ত মানব বলা চলে না তোমায়
বাসুদেব ! দেবের যা সাধ্য-বহির্ভূত,
বাঁচাতে সখারে তুমি যে কার্য করিলে।"

যুক্তির সরণি দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ ভক্তিকে নিয়ে এলেন মানব হৃদয়ে। 'নরনারায়ণ' নাটকখানি ঘটনা-সংস্থাপনের অভিনবত্বে, চরিত্র-রূপায়ণে, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে, ভাষার মাধুর্যে, ভক্তিরসধারায়, আদর্শের জয়গানের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে অনবদ্য, অসামান্য—এক কথায় অনিন্দ্যসুন্দর।

পৌরাণিক নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার নটগুরু গিরিশচন্দ্রের প্রভাব ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে অনুভূত হয়।

গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত মহামানবের জীবনলীলা বর্ণনমূলক নাট্যধারার অনুবর্তন আমরা দেখতে পাই ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের মধ্যে। তাঁর 'রামানুজ' নাটক বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা পরম বৈষ্ণব রামানুজের জীবনলীলার নাট্যরূপ। সূক্ষ্ম জ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব এই নাটকের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য' নাটকের আদর্শ অনুসরণ ক'রে, ঠিক একইভাবে—অনুরূপ ভঙ্গীতে। কিন্তু ভক্তি ও জ্ঞানের সুন্দর মিশ্রণ সম্ভব হয়নি এই নাটকে, তাই সাফল্যের জয়মাল্যলাভ করার সৌভাগ্য হয় নি ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রামানুজ' নাটকখানির।

গিরিশ-যুগে গিরিশ-শিষ্য শক্তিধর নাট্যরথী অমৃতলাল বসুর আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলা নাট্যসাহিত্যের লঘু, তরল হাস্যরসাত্মক দিক্‌টিকে পুষ্ট করে তোলার জন্য। জীবনের গুরুগম্ভীর, উচ্চভাবপূর্ণ দিকে তেমন পরিচালিত হয় নি তাঁর কৌতুকরসোচ্ছল নাট্যরথ। গিরিশচন্দ্রের মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্য লাভ করেছে গভীর ভাবসমৃদ্ধ উচ্চাঙ্গের নাট্যসম্ভার। জীবনের তরল লঘু চপল অধ্যায়ের পরিচয় তাঁর প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবার অবকাশ পায় নি। অবশ্য তিনি কয়েকটি পঞ্চরঙ্‌ রচনা করেছিলেন একথা ঠিক, কিন্তু বাংলা নাট্যধারায় কোন উল্লেখযোগ্য অবদান বলে সেগুলিকে গণ্য করা হয় না।

অমৃতলাল এলেন কৌতুকরস-সৃষ্টির শক্তি নিয়ে, রঙ্গে-ব্যঙ্গে, বুদ্ধিদৃপ্ত বাগ্‌বৈদগ্ধে হাস্যরসের স্নিগ্ধ, আনন্দময় স্রোতধারা প্রবাহিত করলেন তিনি বাংলার নাট্যাঙ্গনে। তাই তাঁর পরিচয়—'রসরাজ অমৃতলাল'।

অমৃতলাল বসুর প্রতিভা ছিল গিরিশচন্দ্রের ন্যায় বহুমুখী। তিনি ছিলেন একাধারে নাট্য-ব্যবস্থাপক, অভিনয়-শিক্ষাদাতা, অভিনেতা ও নাট্যগুরু। ষ্টার থিয়েটার যে একদিন সৌভাগ্যের উচ্চতম শীর্ষে উন্নীত হয়েছিল, তার প্রধান কৃতিত্ব অমৃতলালের।

নাটক-প্রযোজনার শক্তি ছিল তাঁর অসামান্য। মঞ্চে নাট্য-উপস্থাপনায় দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও অন্যান্য বস্তুর বাস্তবানুগতার দিকে তাঁর ছিল সদা জাগ্রত দৃষ্টি। যেমন জিনিস ঠিক তেমনভাবেই তিনি রূপায়িত করতে চেষ্টা করতেন, এজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়েও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।

এই বিষয়ে তিনি গিরিশচন্দ্রকে অনেকটা অতিক্রম করে গেছেন। গিরিশচন্দ্র খ্যাতিমান নাট্য-পরিচালক হ'লেও এই সকল খুঁটিনাটি বিষয় অনেক সময় দৃষ্টিক্ষেপ করেন নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সেই সময় বাংলার নাট্যশালায় ছিলেন তিনজন শক্তিশালী নাট্য-প্রযোজক—তাঁরা হ'লেন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে ছিল ধৈর্যের অভাব। তিনি দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ইত্যাদি সব বিষয়ে লক্ষ্য দিতেন বটে, কিন্তু তত গভীর ভাবে নয়।

অভিনয়-শিক্ষাদান কালে তিনি অভিনেতাদের নিজেদের ধারাটাকেই বজায় রেখে কিছু কিছু সংশোধন করে দিতেন—তা'দের নিয়ে প্রচুর খেটে আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা তিনি করতেন না। অর্ধেন্দুশেখর অন্য সব দেখলেও বিশেষ জোর দিতেন চরিত্রগুলিকে তৈরি করার জন্য। ছোট ছোট ভূমিকার অভিনেতাদের শেখাতে গিয়ে তিনি নাছোড়বান্দার মত লেগে থাকতেন এবং বহু সময় দিতেন। এর ফলে অনেক সময় বড় ভূমিকাগুলি ব্যর্থ হয়ে যেত।

অর্ধেন্দুশেখর তাই প্রযোজক হিসাবে খুব সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। প্রযোজক হিসাবে অমৃতলাল ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নাট্য-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিজস্ব মতবাদে আস্থাশীল দৃঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন অমৃতলাল। তাঁর সুদৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাবের জন্যই তৎকালের রঙ্গালয় দর্শকগণের অসংযত চাপল্য ষ্টার প্রেক্ষাগৃহকে কখনই কোলাহল-পূর্ণ পরিণত করতে পারেনি।

অমৃতলালের নাট্য-বৈশিষ্ট্য বিচার-প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের আলোচনা হয়ত কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু নাট্যকারের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর সৃষ্টিকে যে প্রভাবিত করে থাকে—একথা অনস্বীকার্য। অমৃতলালের নাট্যরীতিতে উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলেই আমরা এখানে তাঁর বিশিষ্ট মনোবৃত্তির কিছুটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি।

অমৃতলালের প্রায় অধিকাংশ নাটকই প্রহসন—হাস্যরসাত্মক, ব্যঙ্গ ও কৌতুকাশ্রিত এবং কিছু কিছু বা গিরিশচন্দ্রের পঞ্চরঙ্-জাতীয়।

সমকালীন সমাজের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রহসনগুলির মধ্যে। যুগের হাওয়া অনুযায়ী তিনি রঙ্গ-ব্যঙ্গের শাণিত শর নিক্ষেপ করেছেন। তাতে হুলের আঘাতের সঙ্গে মধুও উৎসারিত হয়েছে—কাঁটার ক্ষতের সাথে সাথে এসেছে মিষ্ট সৌরভ। তাঁর প্রহসনের অভিনয় দেখে অনেকে আনন্দ পেয়েছেন, হাস্যরোলে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে প্রেক্ষাগৃহ, আবার কেউ কেউ কিছুটা বিরক্ত হ'য়ে চলে গেছেন। এতেই উপলব্ধি করা যায় তাঁর রচনার মধ্যে যথেষ্ট শক্তি ছিল এবং তা হয়ে উঠেছিল সার্থক। তাই সেই প্রহসনগুলির পক্ষে জনচিত্তকে দোলায়িত করা সম্ভব হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ

ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তার প্রতিফলন দেখা যায় অমৃতলালের প্রহসনের মধ্যে। এক দিকে ভারতীয় সনাতন সংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, অন্য দিকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত প্রগতিশীল নবীন সমাজ;—এক দিকে বৃদ্ধস্থবির অচলায়তন, অপর দিকে প্রাণবন্যায় উদ্বেলিত অসংযত উদ্দাম আবেগ।

অমৃতলালের নাটকগুলিতে বেশ সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে দুই যুগের দ্বান্দ্বিক রূপ। আজ কেন, একশ বছর পরেও নাট্য-সমালোচকগণ এর মধ্যে যুগমানসের সংঘাতময় চিত্ররূপ আবিষ্কার করতে পারবেন।

প্রশ্ন জাগে অমৃতলালের নাটক কি তৎকালীন সমাজের সর্বাঙ্গীন ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল, না তার মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর দেখা উত্তর কলকাতার বিশেষ সমাজের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতাই মূর্ত হয়ে উঠেছিল; বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের আভাস্ বলে সন্দেহ করাটা ঠিক যথার্থ হবে না, কারণ আজ থেকে ৬০ বৎসর পূর্বেকার কলকাতার সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরা একথা ভাল ক'রেই জানেন যে, তখনকার কলকাতার সমাজ বলতে বোঝাত উত্তর কলকাতার সমাজকেই। সুতরাং কলকাতার সমাজের রূপ আঁকতে গিয়ে উত্তর কলকাতার সমাজকে রূপায়িত করা হলে তা খুব অন্যায় হ'বে না। তাতেও প্রশ্ন উঠতে পারে কলকাতার সমাজই তো আর সমগ্র বাংলার সমাজ নয়; সারা বাংলার সমাজ-চিত্রের সামগ্রিক রূপ এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় নি। এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে কলকাতা ছিল তখন সারা ভারতের রাজধানী, দেশের প্রাণকেন্দ্র। নবাগত পাশ্চাত্য সংস্কারের যা কিছু দ্বন্দ্ব তা কলকাতাতেই প্রথম অনুভূত হয়েছে। তাই কলকাতার সমাজ-চিত্রের মধ্যেই এ দ্বন্দ্বের রূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পরে এই তরঙ্গোচ্ছ্বাস পল্লীগ্রামের সীমানাতে ছড়িয়ে পড়ে। যাই হোক, অমৃতলালের প্রহসনের মধ্যে আমরা প্রাচীন সনাতন পন্থার সমর্থনের আভাস পাই।

অমৃতলালের নাট্যরীতিতে satire বা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে কৌতুক রস সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'বাবু', 'একাকার', 'বৌমা',

'তাজ্জব ব্যাপার', 'কালাপানি' ইত্যাদি প্রহসনের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুকরণকারী নব্য সমাজের বিভিন্ন আচরণ ও কার্যধারাকে এবং বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা, জাতিভেদ-অস্বীকারের প্রচেষ্টা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন সনাতনপন্থী অমৃতলাল, এবং এই সকলের মধ্য দিয়ে সমকালীন রক্ষণশীলতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

Satire-এর তীব্র আঘাত শ্রেণী-বিশেষকে বিড়ম্বিত ক'রে অন্যান্যের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি ক'রে থাকে, তাই সেখানে আঘাতে-জর্জরিত শ্রেণী ঠিকমত হাস্যরসকে আস্বাদ করা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই অমৃতলালের অনেকগুলি প্রহসন সার্বজনীন হাস্যরসের উৎস হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তাঁর কয়েকটি নাটক এই ত্রুটি থেকে মুক্ত। সেগুলির মধ্যে নির্মল হাস্যরসের মাধুর্য উৎসারিত হয়েছে—সেখানে জ্বালা নেই, আছে মধুর, কোমল, হাস্য-রসের লঘু চপলতা।

'খাস-দখল' নাটকখানি অমৃতলালের একটি স্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি। এই নাটকখানিকে Comedy of Manners জাতীয় বলা চলে। নিখুঁত সমাজ-চিত্র এই নাটকের মধ্যে উৎকীর্ণ হয়েছে, তবে তাতে একেবারে অতিরঞ্জন যে ছিল না তা বলব না। এই জাতীয় নাটকে অতিরঞ্জন মেনে নেওয়া হয়েছে সর্বদেশে।

অমৃতলালের অনন্যসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য 'খাস-দখল' নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কথার খেলায়, ধ্বনি-মাধুর্যে ও শব্দঝঙ্কারের মধ্য দিয়ে অপূর্ব মায়াজাল রচনা ক'রে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করার যাদু ছড়িয়ে রয়েছে অমৃতলালের 'খাস-দখল' নাটকে।

গিরিশচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করে অমৃতলাল 'আদর্শ বন্ধু' নাটক রচনা করেন। গৈরিশ ছন্দের অক্ষম ব্যবহার, গিরিশচন্দ্রের ন্যায় বিদূষক চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতির মধ্যে নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রকে অনুসরণের প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু নাটকীয় উপাদান থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ ব্যবহার না করার জন্য নাটকখানি সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি।

অমৃতলালের পৌরাণিক নাটক 'যাজ্ঞসেনী'র মধ্যে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব প্রতীয়মান। কিন্তু সেই পৌরাণিক পরিমণ্ডল ও ভাষা-সৃষ্টিতে সফল হতে

পারেন নি অমৃতলাল। দুর্বল চরিত্র-চিত্রণ, নাটকীয় গতিহীনতা ও মূলগত ভাবের পরিস্ফুটনের ব্যর্থতাই 'যাজ্ঞসেনী' নাটকের সার্থক পৌরাণিক নাটক হ'য়ে ওঠার পথে সৃষ্টি করেছে প্রতিবন্ধকতা।

অমৃতলালের নাট্য-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁর নাটকে সার্থক ও স্বরচিত গীতাবলীর যথাযথ সমাবেশ, যার ফলে নাটকের গতি হয়ে উঠেছে বেগবান এবং অন্তরের ভাববিশ্লেষণ হয়েছে অনেকাংশে সহজ এবং যথোপযুক্ত। পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে কোথায়ও দু'একটি হাস্যরসাত্মক দৃশ্য অঙ্কন করে যে মিশ্র নাটক রচিত হত,—অমৃতলাল সেই মিশ্রধারার মধ্যে না গিয়ে তাঁর জীবনব্যাপী নাট্য-সাধনার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবে হাস্যরসাত্মক নাট্যসৃষ্টির একটা ধারাকে পুষ্ট করে গেছেন।

নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্রের নাট্যাদর্শের শেষ প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি অপরেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অপরেশচন্দ্রের সাথে সাথেই গিরিশচন্দ্র কর্তৃক প্রজ্বলিত আদর্শের দীপশিখা যে একেবারে নির্বাপিত হ'য়ে গিয়েছিল তা নয়, পরোক্ষ-ভাবে নানা বিষয়ে—বিশেষ করে ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক-রচনার ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের নাট্যকারগণের ভাব-কল্পনাকে অনেক সময় তা আলোকিত করেছে।

বিদায়ী যুগ এবং নবাগত যুগের মিলন-মোহনায় দাঁড়িয়ে অপরেশ-চন্দ্র যেমন একদিকে অস্তোন্মুখ চন্দ্রের স্নিগ্ধ মাধুর্যে হৃদয়পাত্রকে পূর্ণ করেছিলেন, তেমনি আবার অভিবাদন জানিয়েছেন রক্তরাগরঞ্জিত উদীয়মান যুগসূর্যকে।

গুরু গিরিশচন্দ্রের ন্যায় অপরেশচন্দ্রও বাংলার নাট্যক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত বিভাগেই তাঁর নাট্য-প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন। অনুবাদ-নাটক, চরিতমূলক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, কৌতুক-রসোদ্দীপক—সমস্ত শ্রেণীর নাটকই রচনা করেছিলেন অপরেশচন্দ্র রঙ্গালয়ের বিচিত্র চাহিদা মেটাবার জন্য। উপন্যাসের নাট্যরূপ দানে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

ইংরাজী নাটকের ছায়া-অবলম্বনে নাটক-রচনার মাধ্যমেই হয়েছিল বাংলার নাট্যজগতে অপরেশচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব। 'রঙ্গিলা', 'আহুতি',

'শুভদৃষ্টি', 'রাখীবন্ধন', 'বন্দিনী' এমন কি 'ইরাণের রাণী'ও পাশ্চাত্য নাটকের ভাবানুসারে রচিত।

মহাপুরুষগণের জীবন-লীলার নাট্যরূপায়ণে গিরিশচন্দ্র যে ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, সেই পথ লক্ষ্য করেই যাত্রা করেছেন অপরেশচন্দ্র। তাঁর রচিত 'রামানুজ', 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ' প্রভৃতি নাটকে তার স্বীকৃতি বর্তমান। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল এবং ভক্তিরসে প্লাবিত ভাবজগতের সৃষ্টি হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' প্রভৃতি নাটকে, অপরেশচন্দ্রের নাট্যকৃতিতে সে ঐশ্বর্য কোথায়?

অতঃপর কাল যুগধর্ম অনুসরণ করে ঐতিহাসিক নাটকের রীতি অনুযায়ী রোমান্টিকতা এবং অনেক ক্ষেত্রে অনৈতিহাসিকতা অপরেশচন্দ্রের এ জাতীয় নাটকগুলিকে আচ্ছন্ন করেছিল। 'অযোধ্যার বেগম', 'মগের মুলুক' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ। এর মধ্যে 'অযোধ্যার বেগম' নাট্যকারের একখানি জনপ্রিয় নাটক, সেই সময়ে সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য সমস্তই এই নাটকে সন্নিবেশিত। সুতরাং এই নাটকটিকে অনৈতিহাসিকতা দোষে দুষ্ট একথা বলা সঙ্গত হবে না।

'ইরাণের রাণী' অপরেশচন্দ্রের একখানি পুরোপুরি রোমান্টিক নাটক। জনপ্রিয়তার কষ্টিপাথরে এর উৎকর্ষ নির্ণীত হয়েছে।

পৌরাণিক নাটক-রচনায় অপরেশচন্দ্র তুলনামূলকভাবে অধিকতর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'কর্ণার্জুন' নাটক লাভ করেছিল বিপুল জনসম্বর্ধনা। মহাভারতের নাটকীয় আবেদনপূর্ণ অংশকে বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করায় নাট্যকারের নির্বাচনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দৈবের সঙ্গে সংগ্রামরত পুরুষকারের শক্তিতে শক্তিশালী কর্ণচরিত্র বিশিষ্ট মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'কর্ণার্জুন' নাটকে নাটকীয় গতি কোথাও হয়ে পড়েনি শ্লথ,—মন্থর,—ভারগ্রস্ত। এই নাটকে কর্ণ ও শকুনি চরিত্র নাট্যকারের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান। ঘটনা-সংস্থাপনায়, চরিত্র-সৃষ্টিতে, সংলাপমাধুর্যে, অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনে

'কর্ণাজু'ন' একটি স্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি। এই নাটকটির মধ্যে অপরেশচন্দ্রের মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'কর্ণাজু'ন' সম্পর্কে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, নাটকখানি যেখানে যেভাবে অভিনীত হয়েছে, সেখানেই সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং রঙ্গালয়কে এই নাটক প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ ক'রে দিয়েছে। এমন কি, সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ও যখন কোথাও অভিনয় করেছেন, তাঁরা হয়ত উপযুক্ত দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন নি, কিংবা তাঁদের মধ্যে অনেক সময় উচ্চস্তরের অভিনয়-প্রতিভারও অভাব থাকত, কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্ণাজু'ন নাটকের অভিনয় সর্বত্রই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠত, এর ললাটে চিরদিনই অঙ্কিত হয়েছে সাফল্যের বিজয় তিলক। এই নাটকটির সংগঠনে এমনই একটা আশ্চর্যশক্তি নিহিত রয়েছে যে, এর অভিনয় মানুষকে মোহিত করবেই।

অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীরামচন্দ্র' নাটকও রঙ্গালয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি গড়ে উঠেছে বিস্তৃত পরিসরে ব্যাপ্ত সুদীর্ঘ কাহিনীকে অবলম্বন করে। তাহ'লেও নাট্যগ্রন্থি কোথাও শিথিল হয়ে পড়েনি।

কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকের অন্তর্ভুক্ত সুবিস্তৃত বিষয়বস্তু যেন এক-একটি খণ্ড কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। নাটকীয় ঐক্যের যথেষ্ট অভাব এই নাট্য-প্রচেষ্টার মধ্যে।

'মঙ্গলকাব্য' থেকে কালকেতু উপাখ্যান অবলম্বনে অপরেশচন্দ্র রচনা করেছিলেন 'ফুল্লরা' নাটক। এই নাটকে উল্লেখযোগ্য ভাব বর্তমান নাটকীয় দ্বন্দ্ব, কৌতূহল এবং নাট্য-পরিস্থিতি। মানবিক আবেদন নাটকটির মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠায় 'ফুল্লরা' নাটক রসগ্রাহী হ'য়ে উঠেছে। অভিনয়ের দিক থেকেও নাটকটি মঞ্চসফল।

তাঁর সামাজিক নাটক 'ছিন্নহার', হাস্যরসাত্মক 'দুমুখো সাপ' এবং 'অপ্সরা', 'সুদামা' প্রভৃতি গীতি-নাট্যের মধ্যেও নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র এসে বারে বারে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু গুরুর নাট্যাদর্শকে সম্যকভাবে আত্মী-করণ অপরেশচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় তাঁর নাটকগুলি গিরিশ-নাটক-

সমূহের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তাহ'লেও অপরেশচন্দ্রের লেখনীতে এমন যাদু মাখানো ছিল যে, তাঁর প্রায় প্রতিটি নাটক বাংলার নাট্যামোদী সাধারণের অকুণ্ঠ অভিনন্দনে ধন্য হয়েছিল।

রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের নাট্যসৃষ্টির মধ্যে শেষ বারের মত উড্ডীন হ'ল যুগস্রষ্টা গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রভাবের প্রত্যক্ষ নিশান।

আবর্ত

গিরিশোত্তর যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, অপরেশচন্দ্র প্রভৃতি নাট্যরথীগণের সাথে সাথেই একটা বিশেষ যুগের নাট্যধারার পরিসমাপ্তি ঘটল। নবাগত নাট্যকারগণের ভিন্ন খাতে প্রবাহিত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে নাট্যরীতির প্রবর্তন হ'ল, তা'কে একটা সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা বলে চিহ্নিত করা উচিত। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এই নবযুগের গতি-প্রকৃতি এবং মূল্য-নিরূপণ করে সে সম্বন্ধে একটা ইতিহাস আজ লেখা প্রয়োজন, এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত যা চেষ্টা হয়েছে তা' নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অবশ্য আমরা এখানে আমাদের দীর্ঘ প্রবন্ধ দীর্ঘতর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকবো। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে যে সকল নাট্যকারের অবদান রয়েছে প্রাক্-গিরিশ ও গিরিশোত্তর যুগের সেই সকল নাট্যকারের সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করেছি। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনার স্থান এটা নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের 'রাজারাণী' যা এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল, তা'র মধ্যে তৎকালের নাট্যরীতিরই অনুবর্তন দেখা যায়।

সেই জন্যই পরে তিনিও নাটকটিকে তেমন পছন্দ করেন নি, তাই তিনি পরবর্তী কালে ঐ বিষয়-বস্তু নিয়ে 'তপতী' নাটক লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'চোখের বালি' নাট্যরূপায়িত হয়ে অভিনীত হয়েছিল সেকালের অভিনয়-ধারা অনুযায়ী। তিনি নূতন নাটক লেখা আরম্ভ করলেন ১৯০৮ সাল থেকে। তখন তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের দ্বারাই তা অভিনীত হয়েছিল এবং তার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশময়। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে পারলাম না। তবে আমরা তাঁর নাটকের রূপ সম্বন্ধে কেবলমাত্র একটা কথা বলব—যথাকালে।

এখানে আমরা শুধু বাংলার নাট্য-স্রোতস্বিনীর ক্রম-প্রবহমানা ধারা অবলম্বন করে আজকের এই অতি-আধুনিক যুগে তার বর্তমান রূপকে প্রত্যক্ষ করতে চাই—অনুসন্ধানী পথিকের মত এবং এই নাট্যধারার অতীত রূপ যেমন আমরা পূর্বে পর্যবেক্ষণ করেছি, তেমনি এর ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধেও কল্পনার চোখে কিছুটা দেখবার চেষ্টা করতে পারি।

গিরিশ-যুগে এবং গিরিশোত্তর পর্বের নাট্যাদর্শের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, সেখানে একটা স্থির লক্ষ্য রয়েছে—উদ্দেশ্য সেখানে ধ্রুব,—নিশ্চয়াত্মক। ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক সকল শ্রেণীর নাটকেই তা প্রতীয়মান। পর-শাসনে নিপীড়িতা, লাঞ্ছিতা মাতৃভূমিকে বন্ধন-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হ'বে—ফিরিয়ে আনতে হ'বে তার স্বমহিমা; তাই দেশ ও জাতির মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের মন্ত্র, জাতীয়তাবোধের প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করে তোলার প্রয়াস পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে বাংলার তৎকালীন ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে। সামাজিক নাটকসমূহে প্রতিফলিত—প্রাচীন রক্ষণ-শীলতা ও নবীন সংস্কারের দ্বন্দ্ব-সংঘাত। পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে দেখি, নাস্তিকতা এবং অন্যান্য ধর্মের প্রলোভনের হাত থেকে হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা; সনাতন হিন্দুধর্মের মহিমা বিঘোষিত হয়েছে এই সকল নাটকে,—ভক্তি-রসের প্লাবনে বাঙ্গালী হিন্দুর বিশেষতঃ মহিলাদের হৃদয়-তটকে করা হয়েছে প্লাবিত।

স্বাধীনতালাভের পর বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে পূর্বেকার সেই সমস্ত সমস্যাগুলি নেই বটে, কিন্তু সেখানে আজ হঠাৎ অন্য ধরণের নানারকম সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ভায়ে-ভায়ে, স্বামী-স্ত্রীর এবং পিতাপুত্রের মধ্যে আদর্শগত বিরোধের সমস্যা, যন্ত্র-যুগের জীবন-সংগ্রামের সমস্যা, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব, অধিক ও অনধিক প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কণ্টকিত করে তুলেছে সমাজ দেহকে। এই এত বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে কোন্‌টিকে যে নাটকের উপজীব্য করবেন, তা স্থির করে উঠতে পারছেন না নাট্যকারেরা। তাই বাংলার নাট্য-প্রচেষ্টা আজ লক্ষ্যহারা দিগ্‌ভ্রান্ত। বাংলার নাট্যাকাশে আজ গভীর অন্ধতমিস্রা,—কোথাও কোন আলোর রেখামাত্র নেই।

নাট্য-পথের পথিকেরা সেই অন্ধকারে অন্ধের মত হাঁতড়ে এগোবার চেষ্টা করছেন সন্ধান ক'রে ফিরছেন আলোকোজ্জ্বল মুক্তিপথ।

শুধু নাট্যক্ষেত্রে কেন বাঙ্গালীর সমগ্র জাতীয় জীবনে আজ নেমে এসেছে নিদারুণ অমানিশা,—সেখানে নেই কোন আশা, উৎসাহ বা উন্মাদনা। সারা পৃথিবীর দিকে যদি একবার দৃষ্টি ফেরানো যায় তাহ'লেও দেখতে পাব বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র এই একই নৈরাশ্যময় পরিস্থিতি। কিন্তু আজকের এই হতাশার মধ্যে বাংলার নাট্যকারেরা স্থির হ'য়ে বসে নেই,—তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এই জড়ত্বের পাষাণ নিগড়কে ভেঙে ফেলতে,—আলো নিয়ে আসতে অন্ধকার গুহার অভ্যন্তরে। সত্যকার নাট্যাদর্শ স্থির করার জন্য দেশ জুড়ে চলেছে বিরামবিহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা। সারা দেশটা যেন বর্তমানে একটা বৃহৎ গবেষণাগারে পরিণত; পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে পৌছতে হ'বে স্থির সিদ্ধান্তে,—খুঁজে বার করতে হবে বাংলা নাটকের সার্বজনীন আদর্শ। এই সকল নানাবিধ প্রচেষ্টার ফলে নাট্য-তরঙ্গিনীর বুকে সৃষ্ট হয়েছে বিভিন্ন ঘূর্ণাবর্ত, যেগুলির মধ্যে গতি আছে, কিন্তু কোনও অগ্রগতি নেই,—ঘূর্ণিচক্রের মধ্যেই যারা সীমাবদ্ধ, আবর্তনশীল। চল-চঞ্চলা স্রোতস্বিনীর সংগীত আজ স্তব্ধ,—বিপুলভাবে প্রসারতা লাভ ক'রে যেন একটা দহে পরিণত হ'য়ে সে হারিয়ে ফেলেছে তার এগিয়ে চলার ছন্দ।

কিন্তু একথা স্থির যে একদিন জাতীয় জীবনের এই নৈরাশ্যের গ্লানি ধুয়ে মুছে যাবে—সেদিন বাংলার নাট্য-জগতে দেখা দেবে আরক্তিম নবপ্রভাত। যদি একটু বিচক্ষণভাবে এবং ধৈর্য সহকারে আমরা বর্তমান কালে নাটকের নাট্যবস্তু ও রীতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি তা'হলে আমরা সেই অরুণোদয়ের আভাস দেখতে পাব দিগন্তরেখায়, এবং শুনতে পাব সেই নবীন অতিথিকে বরণের জন্য যে সংগীত রচিত হবে তার ক্ষীণ সুরধ্বনি।

এখনকার নবীন নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকে কোন একটি বিশেষ সমস্যার পরিণত রূপ দেবার চেষ্টা না ক'রে এক সঙ্গে কয়েকটি সমস্যাকে উপস্থাপিত করার জন্য কোন একটি সমস্যাই যথাযথভাবে রূপায়িত না হয়ে প্রচারটাই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। জলমিশ্রিত দুগ্ধের মধ্য থেকে হংসের

ন্যায় সার সংগ্রহ করার কৌশল আজও সম্যকরূপে তাঁদের অধিগত হয় নি। তবে আশার কথা, কোন কোন নাট্যরচয়িতা একমুখীন নাটক-রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন এবং একাঙ্ক নাটকের মধ্য দিয়ে অনেকটা সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছেন। যখন এই লেখবার শক্তি ক্রমশঃ বর্ধিত হ'য়ে উঠবে, তখনই তাঁ'দের নাট্যসৃষ্টি সার্থকতার পথে যাত্রা করবে। নাট্যবস্তুর দিক দিয়ে সেই নব গঠনশীলতার আরক্ত আভাসই আজ নাট্যাকাশে প্রতীয়মান।

নাটকের উপস্থাপনার দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যাবে আজকের বাংলার নাট্যাঙ্গনে অভিনয় রীতির তিনটি ভিন্ন ছবি ক্রমশঃ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। নাট্যশালায় অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে বাহু বিস্তার করেছে। পাশ্চাত্য অনেক নাটকের ভাব নিয়ে রচিত নাটক এখন সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হ'য়ে থাকে। আজকের দিনে রঙ্গালয়ে দৃশ্যপট, সাজ-সজ্জা, আলোক সম্পাত প্রভৃতির মধ্যে সংযত, রুচিশীল উপস্থাপন প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যদিকে, বাংলার একান্ত নিজস্ব এবং অন্তরের সামগ্রী যাত্রা—বর্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগে চলচ্চিত্র প্রভৃতি প্রমোদ-অনুষ্ঠানের মাঝেও তার অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে; তার জনপ্রিয়তা ও প্রভাব আজও বড় কম নয়। যাত্রার এই অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির কথা চিন্তা করলে বিস্ময় বোধ না করে পারা যায় না। কলকাতার মত শহরে আজও রয়েছে বহু পেশাদার এবং সৌখীন যাত্রার দল,—যা'রা বিভিন্ন সমিতিতে, ধনী-গৃহে, হাটে-বাজারে, দেশে-বিদেশে নানাস্থানে অপ্রতিহত গতিতে অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এই যাত্রাভিনয়ের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ যাত্রায় সংগীতের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা কমে এসেছে। অনেক সময় রঙ্গালয়ের ন্যায় আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হ'য়ে থাকে এবং অভিনয়-ভঙ্গীও ক্রমশঃ মঞ্চঘেঁষা হ'য়ে পড়ছে।

আর এক ধরণের অভিনয়-ধারার প্রবর্তনে সরকার বর্তমানে উদ্যোগী হয়েছেন এবং ভারতের বহু প্রান্তে তা রূপ পরিগ্রহ করেছে। পল্লী-উন্নয়ন-পরিকল্পনায় (Community Project) নূতন পল্লী যেখানে গড়ে উঠছে, সেই সকল স্থানে অন্ততঃ একটি করে উন্মুক্ত নাটমঞ্চ (Open air-

Theatre) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে; সেই সকল স্থানে একটা স্থায়ী মঞ্চ গাঁথা থাকবে, কিন্তু সেই মঞ্চের বা দর্শকদের বসবার স্থানের উপরে কোন আচ্ছাদন থাকবে না,—উর্ধ্বে—অনন্ত নীল আকাশই হ'বে তার চন্দ্রাতপ। মঞ্চের কোন প্রসাধন থাকবে না,—নিরাভরণা রঙ্গপীঠ শুধু থাকবে অভিনেতাদের জন্য এবং সেই রঙ্গস্থলে বহু সংখ্যক লোক মুক্ত আকাশের নীচে একত্র বসে অভিনয় দেখতে পারবে।

নাট্যাভিনয়ের এই সকল ধারার মধ্যে কোন্‌টি যে কালক্রমে গণ-মানসের স্নেহ-সিঞ্চনে পুষ্ট হয়ে উঠবে, আজকেই তা নির্ভুলভাবে ধারণা করে বলা শক্ত। এইভাবে এই যে তিনটি অভিনয়-ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'ল, তার প্রত্যেকটির জন্যই পৃথক প্রয়োগ-বিধির ও নাটকের প্রয়োজন হ'বে। আমাদের যে আদি নাটকের বিরাট ধারা বয়ে আসছিল তার স্রোত কি এই কারণে রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালীতে এইরকম ভাবে ছড়িয়ে পড়বে? বাংলার চলমান নাট্যপ্রবাহ কি ত্রিস্রোতা হয়ে বা মিলিত ভাবে বয়ে যাবে এ দেশের নাট্যাঙ্গনে, অথবা এই সকলের মধ্যে কোনও বিশিষ্ট ধারা পুষ্ট হয়ে উঠে সমগ্র জাতির অন্তরে আনন্দ-পরিবেশনে সমর্থ হবে?

আজকে সেই প্রশ্নই আমাদের চিন্তান্বিত ক'রে তুলেছে। এ কথা অবিসংবাদী সত্য যে বড় সহরে পাশ্চাত্য প্রভাবিত রঙ্গালয়, পল্লী অঞ্চলে যাত্রার আসর এবং নবগঠিত পল্লী উন্মুক্ত রঙ্গপীঠ—এই তিনটি অভিনয় ক্ষেত্রই বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু এই তিনটি ধারার মধ্যে সমন্বয় যদি না হয় তাহলে জাতীয় নাটক রচিত হ'বে কেমন করে? এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি এমন একটি ধারা পাওয়া যায়, যার প্রয়োগ করা যাবে সমস্ত ক্ষেত্রে,—যাত্রার আসরে,—মঞ্চে,—উন্মুক্ত নাট্যপীঠে—সর্বত্র। এই কথা চিন্তা করতে করতে আমাদের মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কথা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রয়োগ ধারার মধ্যে আমরা এই সমস্যা-সমাধানের কিছুটা ইঙ্গিত পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের নাটকগুলির মধ্যে আমরা দেখেছি, সেখানে কিছু তত্ত্ব রয়েছে, জ্ঞান আছে, কিন্তু বৈরাগ্য নেই,—ঠিক মত বলতে গেলে বলা উচিত তাঁর নাটকে রয়েছে অরূপ-

অসীমের কাছে একান্ত আত্মসমর্পণ; তাই সেখানে কাহিনীই প্রধান হয়ে ওঠে নি,—অনুপম সংগীতের মাধুরীতে একটা ভাব-জগতের সৃষ্টি হয়েছে।

একটু চিন্তা করলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' প্রভৃতি সাঙ্কেতিক নাটকের নাট্যরীতি যেন আমাদের বাংলার প্রাচীনকালের নাটকেরই সুসংস্কৃত, পরিমার্জিত রূপ। এখানে কেউ যেন না মনে করেন রবীন্দ্র নাটকের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের কথা বলছি, আমরা এখানে বলছি তার রূপের কথা, যেটা ছিল আদিকালে স্থূল—সেটা হল সূক্ষ্ম ও পরিমার্জিত। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ইংরেজ আমাদের দেশে আসেনি এবং তাদের রীতি (fashion) আমরা অনুসরণ করিনি—তা হলে সেই অবস্থায় ষোড়শ শতাব্দীতে সংস্কারের মধ্য দিয়ে, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঠিক এই রূপই হয়ত গ্রহণ করত। রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়-পদ্ধতির মধ্যে আমরা আর একটা জিনিস দেখতে পাই যে, তাঁর নাটক অভিনয়ের সময় কোনও মঞ্চ-প্রসাধন বা দৃশ্যপট কিছু থাকে না। মঞ্চপীঠে অভিনয় হয় বটে, কিন্তু তাকে যদি আসরে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়, তাহলে যাত্রার মত অভিনীত হতে সেখানে কোন বাধা থাকে না, আবার যদি উন্মুক্ত নাট্যপীঠে অভিনয় করা যায় তাতেও কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না বরং প্রাকৃতিক পটভূমিতে তা আরও মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠতে পারে।

মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় তাঁর মনোভাব প্রকাশ ক'রে বলেছেন—

"আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলে-মানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। * * * নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সফলতার মধ্যে সে থাকে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্ত-দৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যন্ত্রযুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না।

আমাদের দেশে চির-প্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভীড়ে স্থান সঙ্কীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সঙ্কীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলে-মানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব সত্যকে এ বিদ্রূপ করে; ভাব সত্যকেও বাধা দেয়।"

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি তাই সজ্জাবিহীন মঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী করেই যেন বিশেষভাবে রচিত। তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকে বহু দৃশ্যপটের প্রয়োজন হয় না, সেখানে যেন শুধু একটা পথ পড়ে রয়েছে, যে পথ দিয়ে চলেছে অগণিত নরনারীর একটি বিরাট শোভাযাত্রা। রবীন্দ্রনাথ তাই প্রথমে এই নাটকের নাম দিয়েছিলেন 'পথ' ('গ্রন্থপরিচয়' দ্রষ্টব্য)।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমরা আমাদের জাতীয় নাট্যরীতির প্রায় সবই পেলাম—তত্ত্ব, সংগীত-প্রাধান্য, গানের দল (chorus), আসরে অভিনয়োপযোগী নাট্যরীতি এবং প্রতীক ধর্ম। এই প্রতীক ধর্ম যাত্রার পৌরাণিক পালার মধ্যে সবেতেই আছে।

রামায়ণের কাহিনীতে যতই বীররস, রৌদ্ররস, করুণ রস, ভক্তিরস থাকুক না কেন তার মূলকথা কৃষি ও ব্যাধ ধর্ম। রবীন্দ্র নাটকের সর্বত্রই এই প্রতীক বা রূপক ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর প্রতীক নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী'র প্রস্তাবনায় বলেছেন—"আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তা'র একটার বেশি মুণ্ড ও দু'টোর বেশি হাত দিতে সাহস হ'ল না। আদি কবির মত ভরসা থাকলে দিতেম।"

মহাকবি বাল্মীকির রূপক ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি আবার ঐ ভূমিকায় অন্যত্র বলেছেন—"কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে,............। কৃষি কাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তা-ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দ্বেষ-হিংসা, বিলাস-বিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মত। আমার মুখের এই বচনটি কবি (বাল্মীকি) তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই

বোঝা যায়··· ·······আরো একটা কথা মনে রাখতে হ'বে কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোণার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তা'র হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চ বটচ্ছায়ায় শীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন! বাল্মীকির পক্ষে এ সমস্তই পরবর্তীকালের, অর্থাৎ পরস্ব।"

রবীন্দ্রনাথের নাটকে যাত্রার মৌলিক উপাদানগুলির প্রায় সবই আছে, কেবলমাত্র ভক্তিরসের উদ্বেলিত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের অভাব, আর এখানে নেই সহজে বোঝবার মত একটা পুরোপুরি কাহিনী। মহাপ্রভুর পূর্বেকার যাত্রার পৌরাণিক পালাতে অত ভক্তির আবেগ ছিল না, মহাপ্রভুর সময় থেকেই এতে ভক্তিরস বেগবান হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই সকল অভাব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি যে কোন্ পথে চল্‌ছিল তা, উপলব্ধি করা কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি আরও কিছুদিন নাট্যরচনার অবকাশ পেতেন, তাহলে তাঁর নাটকগুলি হয়ত সম্পূর্ণরূপে বিবর্তিত হ'য়ে যুগের নাট্যাদর্শ সৃষ্টি করতে পারত। তবে এটা ঠিক, তাঁর শেষ বয়সের নাট্যসৃষ্টির মধ্যে অস্ফুট, অপরিণত হলেও পথের সঙ্কেত আঁকা রয়েছে। যাত্রাভিনয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল আন্তরিক। তাই উন্নাসিকতার দ্বারা বাংলার নাট্যজগতে তাকে আপাঙ্‌ক্তেয় বলে মনে করেন নি তিনি। বরং তার শাশ্বত প্রভাবকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যরীতির মধ্যে। তাই তিনি তাঁর 'তপতীর' ভূমিকায় অত জোর দিয়ে বলেছেন —'যাত্রার আসরে স্থান সঙ্কীর্ণ হয় বটে, কিন্তু মন সঙ্কীর্ণ হয় না এবং তাঁর 'রক্তকরবী'কে নাটক না বলে 'পালা' বলে উল্লেখ করেছেন। উচ্চ শ্রেণীর গান লেখবার প্রতিভা নিয়ে কোন নাট্যকার যদি এদেশে জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি তত্ত্বের সঙ্গে একটি ভাবোদ্দীপক কাহিনী গড়ে তুলতে পারবেন,—কারণ গল্প শুনতে আমরা ভালবাসি,—এবং যিনি রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের বিশেষ ভঙ্গিটি অনুসরণ করতে পারবেন তাঁর নাটকের মধ্যে, তিনিই সৃষ্টি করতে সমর্থ হবেন বাংলার সহজাত

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিরন্তন নাট্য-সাহিত্য—যা বাঙ্গালী নাট্যরসিকের নাট্য-পিপাসাকে তৃপ্ত করতে পারবে।

তবে আজকে যে সমস্ত বিদেশী নাটকের অনুবাদ বা ছায়া আমাদের দেশে এসেছে বা আসছে, সে সমস্ত থাকবেই এবং এই সকল নাটকের অভিনয় ও উপস্থাপনা বিধি যা প্রচলিত রয়েছে, তাও বজায় থাকবে সহরের রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে। এই বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদ-প্রচেষ্টায় আমাদের নাট্যধারার কোন ক্ষতি না হ'য়ে বরং তা আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু আমরা যে নাট্যরীতির কথা ইতিপূর্বে বলেছি, তা'তে বাংলা দেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপ প্রতিফলিত হবে এবং তা ভাবরসে পুষ্ট হয়ে উঠবে বলে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নগরবাসী, গ্রামবাসী সর্বশ্রেণী মানুষের কাছেই হয়ে উঠবে সমান আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। সেই জন্যই এই নাট্যরীতিতে রচিত নাটকই হবে আমাদের বাংলার জাতীয় নাটক। বিশ্বের নাট্যরসিকদের সামনে আমরা তুলে ধরতে পারবো আমাদের বিশিষ্ট নাট্যধারাকে। একথা সকলেরই জানা আছে, আজ পৃথিবীর নানাস্থানেই সাঙ্কেতিক নাটক রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের ভঙ্গী, যা হবে আমাদের জাতীয় নাটকের অঙ্গ-বিশেষ, বিভিন্ন দেশের সাঙ্কেতিক নাটকের ধারা থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন,—অভিনব।

আজ তাই আমরা অপেক্ষা করবো বাংলা দেশের সেই শক্তিশালী ভবিষ্যৎ নাট্যকারের জন্য। অনাগতকালের কবির উদ্দেশ্যে কবিগুরু যেমন একদিন বলেছিলেন—'সে কবির বাণী লাগি কাণ পেতে আছি'—আমরাও তেমনি অধীর প্রতীক্ষায় বসে আছি—সেই নবাগত নাট্যকারের শুভাগমন প্রত্যাশায়, যিনি ভগীরথের মত বর্তমানের সম্মুখ-গতিবিহীন দহের জটাজাল ভেদ করে বাংলা নাট্যসাহিত্য-সুরধুনীকে প্রবাহিত করবেন নবজীবনের পথে,—নিস্তেজ, নিস্তরঙ্গ ধারার বুকে নিয়ে আসবেন প্রাণবন্যা,—যার স্পর্শে স্নিগ্ধ, সরস হয়ে উঠবে বাংলার নাট্যরসিক-হৃদয়ের বেলাভূমি।

সেই আগন্তুক, যুগস্রষ্টা, নবীন নাট্যকারের উদ্দেশ্যে রেখে গেলাম আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন—ঐকান্তিক শুভ কামনা!

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট